কিশোর ক্লাসিক

রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

রবিশঙ্কর মৈত্রী
সম্পাদিত

আজকাল প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৯৮
প্রথম আজকাল সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রকাশক : চিন্ময় পাল আজকাল প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
কম্পোজ : বাংলাবাজার কমপিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০
মুদ্রক : ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬/১ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

ISBN 984 569 030 X

একটি দ্বীপ, একজন মানুষ আর একরাশ গাছপালা-পশুপাখি, চারধারে শুধু জল আর জল। ভাগ্যাহত সেই মানুষটির নাম রবিনসন ক্রুসো। কথা বলার কোনো মানুষ নেই, নেই কোনো সখী কি সাথী। শুধু কাকাতুয়া একটি, তার নাম পোল্, সে ঘোরে ফেরে আর ডেকে বেড়ায়—রবিন ক্রুসো, রবিন ক্রুসো, তুমি কোথায়, কোথায় ...।

আটাশ বছর এই বিজন দ্বীপে বলতে গেলে একাকী কাটে মানুষটির। শেষের ক'বছর ফ্রাইডেকে পায় সাথী হিসেবে। সে চমকদার ঘটনা। নরখাদক বর্বরদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আশ্চর্য লোমহর্ষক সেই কাহিনী। আরো আশ্চর্য, দ্বীপ থেকে সভ্যজগতে ফিরে আসার ঘটনা। তারপর নতুন আরেক যাত্রা। অরণ্য। নেকড়ে। হাজার হাজার। ভয়াল ভয়ার্ত তাদের ডাক। তাদের থেকে আত্মরক্ষা—পাতায় পাতায় বিস্ময়ের চমক।

আর সেই দ্বীপ? সেখানে গড়ে উঠেছে এখন নতুন জনপদ। তারো বিচিত্র কাহিনী নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফোর এই বিস্ময়কর চিরন্তন ক্ল্যাসিক।

১৬৩২ সালে ইয়র্কের এক বনেদি পরিবারে আমার জন্ম। এর মানে কিন্তু এই নয় আমরা বরাবরকার ইয়র্কেরই বাসিন্দা। আমার বাবা আগে থাকতেন ব্রিটেনে। সেখান থেকে হুল্-এ এসে সাময়িক আস্তানা গাড়েন। ব্যবসা করতেন তখন। তার থেকেই বিস্তর জমিজমা, অঢেল পয়সা। হঠাৎ কী খেয়াল হলো—সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন ইয়র্কে। থিতু হলেন। বিয়ে করলেন।

রবিনসন আমার মায়ের বংশের পদবি। আমার মামাদেরও খুব নামডাক। তারা অবিশ্যি গাঁয়েই থাকেন। তো মায়ের পদবির সঙ্গে আমাদেরটা মিলিয়ে আমার নাম রাখা হলো রবিনসন ক্রুৎজেনার। সে বড় খটোমটো উচ্চারণ। ভাঙতে ভাঙতে লোকের মুখফেরতা হলো গিয়ে ক্রুসো। মোটামুটি পছন্দসই। উচ্চারণেও সুবিধে। আমরা এখন ক্রুসোই লিখি সবাই, বলিও ক্রুসো। আমার বন্ধুরা আমাকে ঐ নামেই ডাকে।

আমার ওপরে দুই দাদা। তাদের মধ্যে একজন ফ্লান্ডার্সে ইংরেজ পদাতিক বাহিনীর কর্নেল। সেনাপতি তখন সেই বিখ্যাত লকহার্ট। স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ডানকার্কের কাছে কোনো এক স্থানে সে মারা যায়। এ হলো সবার বড়। মেজ ভাইয়ের খবর আমি কিছু রাখি না। জানি না বলাই ভালো। ঠিক যেমন আমার বাবা মা জানেন না আমার খবর।

অতএব আমি যে পরিবারের তিন নম্বর বংশধর, এটা বোধহয় সকলেই অনুমান করতে পারেন। আর বলব কি ছোটবেলা থেকেই আমার মাথায় যাবতীয় উদ্ভট চিন্তা। আমার বাবা প্রাচীনপন্থি মানুষ। আমাকে পড়াশোনা যতটা শেখানো সম্ভব শিখিয়েছেন। প্রথমাবস্থায় বাড়িতে, পরে স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। শেষ অব্দি আইন নিয়ে আমি পড়াশুনা করি। কিন্তু পড়ায় মোটে মন লাগে না আমার। সমুদ্র আমাকে টানে, ডাকে। যেতে ইচ্ছে করে সমুদ্রে। সারাক্ষণ মনের আনাচে-কানাচে তোলপাড় করে বেড়ায় ভাবনা। শেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল, বাবার বিরুদ্ধতা পর্যন্ত করতে বাধ্য হলাম। মা কত অনুরোধ উপরোধ করলেন। বন্ধুরা কত বোঝাল, আমি নাছোড়। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে আমি যেন মরিয়া। যেন যেকোনো দুঃখ বরণ করতেও আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

বাবাও বিস্তর উপদেশ দিলেন। ভারি বিচক্ষণ আর ভারি গম্ভীর মানুষ। একদিন সকালে আমাকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। নড়াচড়া তো করতে পারেন না, বাত যে ভীষণ। তা সে নানান যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর পালা। বললেন, কী এমন কারণ থাকতে পারে তোমার ঘর বাড়ি ছেড়ে পৈতৃক নিবাস ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যাবার? নয় বেড়ানো হলেও বুঝতাম, এ তো নিরুদ্দেশ যাত্রার সামিল। বিদেশে কে তোমাকে চিনবে? কে তোমাকে রেয়াত করবে? বরং থাক এখানে, ব্যবসা কর, সুখী হও। এই তো সার্থক

জীবন। বাইরে গিয়ে নাম করবে, ধনবান হবে—এ অলীক কল্পনা। এতে ঝুঁকির ভাগটাই বেশি। সচরাচর এমন কেউ করে না। আর সেটা তোমার সাধ্যেরও বাইরে। বরং তোমাকে বলি কেন, আমাদের সবার। মধ্যবিত্ত ছাপোষা মানুষের ওসব হুজুগ পোষায়?

আসলে বিচার করে দেখেছি, বাবা তার মধ্যবিত্ত অবস্থান নিয়ে যৎপরোনাস্তি সুখী। এতে দুঃখ-দুর্দশার আধিক্য কম, আবার সুখ সম্ভোগ আড়ম্বরের ভাগটাও এমন কিছু যথেষ্ট নয়। কারুর চোখ টাটাবার ঈর্ষান্বিত হবার কোনো ব্যাপার নেই। এই জীবনই বাবার পরম প্রিয়। বললেনও সে কথা আমাকে।—দেখ, এই ভাবে জীবনযাপনের যে কত সুখ, তুমি বুঝবে না এখন, আমি বুঝি। এই অবস্থানটা সবার কাছেই লোভনীয়। রাজা বাদশারাও মাঝে মাঝে কাঁদুনি গায়। বলে, কী যে ঝকমারি করেছিলাম রাজবংশে জন্মে! এরচেয়ে সাধারণ বংশে জন্মালেই ভালো হতো। জ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গেছেন মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে। তাছাড়া প্রার্থনার মধ্যে তো আছেই-হে প্রভু আমাকে দারিদ্র্য দিও না, তা বলে ধনীও আমি হতে চাই না।

আমাকে বলেছিলেন কথাগুলো খতিয়ে দেখতে, বিচার বিবেচনা করে বুঝতে। তা সত্যি কি, আমার চোখে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। জীবনের যা কিছু ঝড় ঝাপটা ভালো-মন্দ সব ভোগ করে একদম উঁচু আর একদম নিচুতলার মানুষ। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগে না। আমাদের সব কিছুই মাপা। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না—ভোগ করতে হয় সব, কিন্তু হিসেব করে। তবু পাই যে এটা তো ঠিক। তাকে আশীর্বাদই বলতে পারি। এই যে মধ্যবিত্ত জীবন লাভ করেছি আমরা, এটা আশীর্বাদ ছাড়া কী। তোফাই তো আছি। ছিমছাম মসৃণ নীরব নিভৃত জীবন। কোনো হই-চইয়ের ব্যাপার নেই। ঝামেলাও বিশেষ নেই, এমন নয়। খুব একটা যে পরিশ্রমের দরকার হয়। আবার এমনো নয় যে মগজটাকে বেশি খাটাতে হয়। তেমন বিহ্বল চৈতন্য ভাবও কখনো আসে না। বা যেটুকু আসে তাতে আত্মার শান্তি মনের সুখ এসবের কোনো ব্যত্যয় হয় না। এমন নয় যে হিংসায় আমরা জ্বলে পুড়ে উঠি, আবার কোনো কিছু পাব বলে ভেতরে ভেতরে যে একটা তীব্র দাহ, তা-ও কখনো বোধ হয় না। বেশ দুলকি চালে চলা যাকে বলে। এই ভাবেই মোটামুটি স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন অতিবাহিত করা। তিক্ততার ভাগ অনেক কম। স্বাচ্ছন্দ্যই তুলনামূলকভাবে বেশি। মন্দ কী! এই তো বেশ। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার একটু একটু করে পূর্ণ হয়। প্রতিদিনকার সঞ্চয় বাড়ে। এই তো আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন।

সে যাই হোক, বাবা আমাকে ভীষণ পীড়াপীড়ি করলেন। ভী-ষ-ণ। তবে খুবই মোলায়েম ভাবে, তাতে আন্তরিকতার ভাগটাই বেশি। বললেন, আমি যেন আজকালকার উঠতি ছোকরাদের মতো আচরণ না করি, যেন নিজেকে অজানা ভবিষ্যতের হাতে ফেলে দিয়ে দুর্গতির ভাগীদার না হই। এই তো বেশ—এই মধ্যবিত্ত অবস্থান। কী দরকার একে হুট করে পাল্টে দেবার জন্যে দুঃসাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ার? তাছাড়া এমন তো নয়, রুটি রুজির হঠাৎ খুবই দরকার হয়ে পড়েছে, তার জন্যে এই মুহূর্তে আমার কোনো কিছু না করলেই নয়। সে সব চিন্তা-ভাবনা বাবারই, তা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং এখানে থাকলেই বাবা আমাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। যদি সেই প্রতিষ্ঠায় আমি সুখী না হই, আমার মন না ওঠে, তবে ধরে নিতে হবে ভাগ্যটাই আমার মন্দ। অথবা নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ত্রুটি হয়েছে। সেটা তো জীবনেরই একটা নিয়ম বিশেষ। এর জন্যে আর অনুতাপ করে লাভ কী। তবে হ্যাঁ, অনুতাপের যাতে কোনো কারণ না ঘটে সেটা তিনি জানপ্রাণ দিয়ে দেখবেন। তার জন্যে

কাছে থাকাটা একান্ত দরকার। ভালোই হবে তাতে আমার। বাইরে গেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—বাবা হয়ে কেমন করে যেতে অনুমতি দেন তিনি! সর্বশেষে আমার বড় ভাইয়ের কথা বললেন। বড় ভাইকেও এইভাবে বারবার নিষেধ করেছিলেন তিনি, অনিশ্চিতের কোলে ঝাঁপ দিতে মানা করেছিলেন। বড় ভাই শোনে নি তাঁর কথা। জোর করে—একরকম সব কিছু অগ্রাহ্য করেই গিয়ে ভিড়ল সৈন্যদলে। পরিণতি তো মৃত্যু। বাবার কথা অগ্রাহ্য করলে ফল ভালো হয় না। বড় ভাইয়ের উদাহরণ যেন আমার কাছেও আদর্শ হয়। জেনেশুনে ভুল করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মেলে না। সব অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লে শেষে পস্তাতে হয়। তখন আর ফেরবার পথ থাকে না। এটাকে আমি যেন মনে রাখি, তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে না দিই।

সদুপদেশই বলা যায়। সাধুসন্তরা যে উপদেশ দেন অনেকটা সেই রকম। বড় ভাইয়ে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাবার চোখে জমাটবাঁধা অশ্রুও আমার নজরে পড়ল। ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে। আমাকে যখন বললেন পরে অনুশোচনা করতে হবে এবং তখন কেউ আসবে না আমাকে সাহায্য করতে—দেখি বাবা কাঁপছেন থরথর করে, বুকটা যেন ভারী, যেন যেকোনো মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে এবং ফলত বাবা আর কথা শেষ করতে পারলেন না।

তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল মাগো

বড় টাল খেলাম মনে। প্রচণ্ড একটা নাড়া। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম বাইরে যাওয়ার সংকল্প। কী দরকার, এই তো বেশ! থাকি বাড়িতে বাবার চোখের গোড়ায়। বাবার কথা মতো জীবনযাপনের চেষ্টা করি। হায়রে হায়! সে আর কদিন। আবারও তো মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে সেই তোলপাড়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই। ছটফট করে কেবল ভেতরটা। ভাবি কখন যাব বাইরে, কবে এই পরিবেশ ছেড়ে চম্পট দেব। তখন মাকে ফের বললাম বুঝে শুনে। একদিন মা খুব হাসিখুশি, মেজাজ শরীফ, সেই দিন। বললাম দেখ মা, দুনিয়াকে দেখার ইচ্ছেটা এমনই প্রবল হয়ে চেপে বসেছে আমার মনে—আমি কিছুতেই বাড়িতে মন বসাতে পারছি না। আমার মুহূর্তের জন্যেও মনে স্বস্তি নেই। ছটফট করে বেড়াই সারাক্ষণ। বাবাকে বল, যদি অনুমতি দেন

তো ভালো, নইলে আমি পালাব। পালাবই। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। তুমি দেখে নিয়। তাছাড়া বাবা যে বলেছেন আমাকে থিতু হতে, কোনো কাজে ভিড়ে পড়তে চাই, কি কোনো উকিলের কেরানিগিরি করতে—সেটা এখন আর সম্ভব নয়। আঠারো পেরিয়ে গেছি আমি। আগে হলে হতো। এখন আর মন বসাতে পারব না। জোর করে ভিড়িয়ে দিলে সেখান থেকেও আমি পালাব। বরং বাবাকে বল, একবারের জন্যে অনুমতি দিন, মাত্র একবার, তারপর সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আর আমি যেতে চাইব না। কোনোদিন না। তখন বাবা যা বলবেন আমি করব, সব মেনে নেব। তুমি একটু বুঝিয়ে বল মাগো।

মা বললেন, বলে কোনো লাভ নেইরে। কোনো কথা শুনবেন না। তাছাড়া তোরই বা আক্কেল কীরকম বল দেখি। এত উপদেশ দিলেন, এত কিছু বুঝালেন, তারপরও বলিস সমুদ্রে যাবি? এতে উনি আঘাত পাবেন মনে। তুই বুঝিস না? এই ভাবে অজানা অনিশ্চিতের উদ্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি নিজের সর্বনাশ করতে চাস, কর তুই। আমার কিছু বলবার নেই। তবে একটা কথা জেনে রাখ। এতে তোর বাবার কি আমার—কারুরই মত নেই। থাকতে পারে না। ভাবিস নে, তোর বাবা যাতে আপত্তি করেছেন আমি তাতে হ্যাঁ বলব। আমাকে আর জোরাজুরি করিস না।

তবু শুনেছি, পরে মা বাবাকে সব নাকি বলেছিলেন। শুনে স্থির হয়ে বসেছিলেন বাবা খানিকক্ষণ। শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, বাড়িতে থাকলেই ও সুখে থাকত। কোথায় যেতে কোথায় যাবে, দুঃখে কষ্টে তোলপাড় হবে—ছেলেমানুষ, বোঝে না কিছু। তুমি বলে দিও, আমার মত নেই।

এর ঠিক এক বছর পরে আমি বাড়ি থেকে পালালাম। এই এক বছরে বহু প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে। ব্যবসায় যোগদানের প্রস্তাব, কোনো কাজে ভিড়ে পড়ার প্রস্তাব। আমি কানে তুলি নি। মা বাবা আরো অনেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি শুনেও শুনি নি। শেষে হুল-এ গিয়েছি একদিন, মাঝে মাঝেই আমি যেতাম বেড়াতে,—সত্যি বলতে কি পালাবার ইচ্ছেও সেদিন ছিল না, হঠাৎ এক বন্ধুর সাথে দেখা। বলে, যাবি আমার সঙ্গে জাহাজে? আমাদের জাহাজ লন্ডন যাবে। কী যে মনে হলো আমার। বন্ধুর পেছন পেছন গিয়ে উঠে পড়লাম। ভাড়াটাড়া তো লাগবে না। বন্ধুর আমি যে বন্ধু। ষোলোশ একান্ন সালের পয়লা সেপ্টেম্বর সেদিন। না হলো বাপ-মার আশীর্বাদ নেওয়া, না হলো ঈশ্বরের প্রার্থনা, এমনকি যে বাবা মাকে খবরটা জানাব সে সুযোগটুকুও হলো না। ব্যবস্থা করে গেলাম। পরে জানতে পারবেন। জাহাজে আমি ভেসে পড়ারও অনেক পরে। খচখচ করছিল মন। না জানি এভাবে ভেসে পড়ার কত বিপদ, কত ভয়! পরমুহূর্তেই সামলে নিলাম। বিপদ আবার কীসের? আমি না জোয়ান মরদ! এসব নিয়ে মাথা ঘামায় তো বুড়োর দল! তো ছাড়ল জাহাজ। হাম্বার পেরুলাম। বলব কি, তারপর থেকেই শুরু হলো ঝড়। আর ঢেউ। সে যে কী বিরাট, কী ভয়ঙ্কর! আমি তো এর আগে কখনো জাহাজে চাপি নি, ঢেউয়ের দুলুনিতে একটু পরেই শরীর খারাপ হলো। খুব খারাপ। ভয় ভয়ও করছে। আর খুতখুতুনি। কি জানি, ঐ যে কারুর মত না নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ না নিয়ে চড়ে বসলাম, এ হয়তো তারই প্রতিফল। কত অপরাধই না জানি করেছি। বাবার চোখের জল, মার বারণ, অত উপদেশ পরামর্শ—সব অগ্রাহ্য করলে কি বিপদ না হয়ে যায়! এ সেই বিপদ বা বিপদের সূত্রপাত। জানি না ভবিষ্যতে আরো কত কী হবে। হয়তো অসীম দুঃখ পাব।

ঝড় আরো বাড়ল। আর সমুদ্র—আগে তো আমি দেখি নি কোনোদিন—সে যা ঢেউ, যা উথাল-পাথাল। পরে অবশ্য এর চেয়ে আরো অনেক তোলপাড় দেখেছি, আরো উঁচু উঁচু

ঢেউ। তখন আর আমার শরীর খারাপ হয় নি বা চমকও লাগে নি। কিন্তু সেবার সেই যে প্রথম। কতটুকু জানি আমি সমুদ্র সম্বন্ধে? ভয় তো লাগবেই। দুরন্ত সেই ভয়। এক একটা ঢেউ ওঠে আর ভাবি—এই বুঝি আসছে আমাদের গিলে খেতে। হয়তো এইবারই শেষ। জাহাজ বারবার পড়ে ঢেউয়ের মাথায় আছড়ে। মনে হয় এই হয়তো শেষবার, আর উঠব না কেউ কোনোদিন মাথা তুলে, তলিয়ে যাব সমুদ্রের গর্ভে। তখন কত দিব্যি কাটা, কত ঈশ্বরের নাম। বারবার বলি, হে ঈশ্বর এবারকার মতো আমাকে রক্ষা করো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে দাও। আর কোনোদিন আসব না সমুদ্রে, চাই কি তোমাকে অনুরোধও কবর না। আর ভারি অনুতাপ হয় মনে। ছি ছি, বাবার উপদেশ অগ্রাহ্য করেছি বলেই না আমার আজ এই হাল। আর কোনোদিন করব না একাজ। দিব্যি কাটছি। ঈশ্বরের নামে শপথ। কত বিচক্ষণ মানুষ আমার বাবা, দূরদৃষ্টি দিয়ে ঠিকই তো বুঝেছিলেন। এত ঝঞ্ঝাট কি আমাদের সহ্য হয়। এত হ্যাপা! সুখে স্বস্তিতে বাড়িতে কাটাব দিন, নাকি এসে পড়লাম এই ঝড়ের মধ্যে। দুর্ভোগের চরম। এ আমার পাপের ফল। এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে। বাবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে। নয়তো পাপ থেকে ত্রাণ নেই, শান্তি নেই আমার।

অর্থাৎ যতক্ষণ ঝড় চলে, আমার মনের মধ্যেও এইসব ভাবনা পাক খেয়ে বেড়ায়। দূরের যেন ঘনিষ্ঠ নিবিড় সংযোগ। পরদিন অবশ্য ঝড় আর নেই। সমুদ্র দর্পণের মতো শান্ত। আমার ভাবনাও বলতে গেলে শান্ত। তবু থম মারা একটা ভাব। যেন কিছুই ভালো লাগে না এরকম একটা মানসিকতা। একটু কাহিলও লাগছে। সে শুধু দিনমানে। সন্ধ্যে লাগতে বাতাস আর নেই। আমার কাহিল ভাবও নেই। বেশ লাগছে এখন। ক্রমে রাত গভীর হলো। তারপর ফুটল ভোরের রোদ। সে যা মিষ্টি! আর তেমনি ঝকঝকে সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল আর রোদ। আর ভুবনজোড়া আলো। অপূর্ব! যেন এমনভাবে চোখ নিয়ে কোনেদিন আমি সমুদ্র দেখি নি।

রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। মনে বেশ ফুর্তির ভাব। তার উপর শান্ত সমুদ্র। সময় কাটছে সুখেই। এমন সময় বন্ধু এসে হাজির। আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, কীরে কাল তোর ভয় করছিল, তাই না? যখন হাওয়া উঠল? আর চারদিক তোলপাড়? বললাম, হাওয়া কী বলছিস, ঝড় বল। মারাত্মক ঝড়। বলল, তোর মুণ্ডু। একে বলে ঝড়? ঝড় তুই দেখিস নি। আমরা বিস্তর দেখেছি। তোর মাথা ঘুরে যাবে। অবিশ্যি দোষ তোর নয়। এই প্রথম এলি সমুদ্রে। এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি। কী ঝকমক করছে আজ চারধার দেখ। চল, ঘরে বসে না থেকে একটু হই-হল্লা করি। আবহাওয়া ভালো থাকলে নাবিকেরা ঘরে বসে থাকে না।

তখন গেলাম ওর সাথে। দেখি একটা ঘরে বিস্তর নাবিক। খাওয়া দাওয়া হলো। মদ খেলাম। নিজের ইচ্ছেয় নয়, দলে পড়ে। নেশা হলো খুব। আমার অনুতাপ পরিতাপ বলতে এখন আর কিছু নেই। পুরানো কোনো কথা আর মাথায় নাড়া খায় না। এখন শুধু ভবিষ্যতের চিন্তা। অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তাই নিয়ে শুধু আশার পর আশার জাল বোনা। মোটমাট সমুদ্র শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও সব দিক থেকে শান্ত। এই সমুদ্র যে আমাকে গ্রাস করতে পারে ভুলেও এখন আর এ চিন্তা করতে পারছি না। সমুদ্র নিয়ে যত কিছু অতীতের ভাবনা আমার, মনের গোপন গহন আশা—সব একটু করে ফিরে আসছে। দিব্যি কেটেছি কত—সে সব আর মনে নেই। শপথের কথাও ভুলে গেছি। একদম ভুলে গেছি বললে অবিশ্যি বেশি বলা হয়, আসলে সামান্যই মনে আছে। যৎসামান্য। তাও ক্ষণস্থায়ী। স্বপ্নে দেখা ছবির মতো। এই আসে। নতুন চিন্তার তাড়নায় এই আবার মুছে

যায়। তাছাড়া নতুন সঙ্গী জুটেছে বিস্তর। সব বিস্মরণ। সেদিনের সেই পান ভোজনের আসরে যোগদানের পর থেকে। তাদের পাল্লায় পড়ে নেশা যখন করি, তখন আর হুঁশ থাকে না। যেন খেলা একটা। নতুন পরিবেশে পুরানো সব কিছুকে ভুলে যাবার উন্মাদ উদ্দাম এক প্রচেষ্টা। তখন তো আর বুঝি নি এসব আগামী দিনের দুর্দশারই ইঙ্গিত। ঘনিয়ে আসছে বিপদ। সেটা যেহেতু আরো ভয়ঙ্কর আরো তীব্র, তাই প্রস্তুতি নেবার কাজ চলছে আমার ভেতরে ভেতরে। নিজের অজান্তেই আমি এইভাবে একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছি।

ছয় দিনের দিন ইয়ারমাউথে পৌঁছে আমরা নোঙর ফেলাম। সমুদ্র শান্ত। আবহাওয়া চমৎকার। শুধু বাতাস বইছে বিপরীত দিক থেকে এই যা অসুবিধে। জাহাজ নিয়ে এগোনো সমস্যা। থাকতে হলো একইভাবে সাত আট দিন। শুয়ে বসে কাটানো যাকে বলে। আলস্যে গা এলিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। ততদিন আরো জাহাজ এসে ভিড়েছে। বন্দর তো। নিউক্যাসল থেকে এসেছে অনেকগুলো। সবার একই হাল। বাতাসের গতি না পাল্টালে কেউ আর রওনা দেবে না।

এদিকে আছি তো দিলখুশ। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, ভয়ের তো লেশমাত্র নেই। কিন্তু সে আর কদিন। পাঁচ দিনের দিন থেকেই বাতাসের বেগ একটু একটু করে বাড়তে লাগল। তা বাড়ুক। আমাদের পরোয়া কীসের। প্রথম কথা রয়েছি বন্দরে, তার উপর নোঙরও ভারী। মাটির সঙ্গে গাঁথা বলতে গেলে। কে সরাবে কে নড়াবে আমাদের ভিত থেকে? হায় হায়, সবই দেখি মিথ্যে। আট দিনের দিন থেকে সে যা বাতাস? যা তোড়! সকাল থেকেই এই হাল। মুহূর্তের মধ্যে জল ফুলে ফেঁপে এই এতোখানি উঁচু। ততক্ষণে পাল গোটানো শেষ। ঝাপটা আটকায় এমন আর কিছুই বলতে গেলে জাহাজের পাটাতনে নেই। নোঙর নিয়েই যা ভয়। কাপ্তেন বলল, বড় নোঙর নামাও। তখন দুপুর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নামানো হলো জাহাজের সবচেয়ে ভারী নোঙর। বাঁধুনির শেষ ইঞ্চিটুকু অব্দি ফতুর। সে যে কত নিচু কে জানে, তবুও দেখি সবার মধ্যে কেমন উসখুস ভাব।

আরো বেড়েছে বাতাস। হু-হু হাওয়ার তোড়। তখন আর উসখুস ভাব নয়। তখন ভয় আর সন্দেহ সবার চোখে মুখে। সবচেয়ে অবাক লাগছে কাপ্তেনকে দেখে। আমার কেবিনের পাশেই তার কেবিন। দেখি বারে বারে বাইরে যায় আর ভেতরে ঢোকে। কাজকর্ম তদারক করে আর বিড় বিড় করে ঈশ্বরকে ডাকে—প্রভু, দয়া কর। বাঁচাও আমাদের। নইলে সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা বাঁচব না, রক্ষা কর।

আর আমি? আমি যেন কেমন বোকা হয়ে গেছি। কী করব কী করা উচিত, কিছুই মাথায় ঢোকে না। শুধু চুপচাপ নিজের কেবিনে শুয়ে ভাবি উথাল পাথাল। ভাবনার যেন থই মেলে না। সে যে কী ঝড় আমার মনের গহনে! তবু জোর করে শান্ত রেখেছি নিজেকে। মরবার ভয় আর নেই। সেটা প্রথমদিকে ছিল। এখন কেমন এক জবুথবু ভাব। যেন নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহ নিরাসক্ত কোনো মানুষ। আসলে করবার মতো যে আমার কিছু নেই। এই বাতাসের বিরুদ্ধে কী করতে পারে আমার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজন মানুষ?

তখন বাইরে এলাম।

বলব কি সে এক অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত দৃশ্য। সমুদ্র না, যেন পাহাড়। সে রকমই উঁচু ঢেউ। ভীষণ গর্জন করে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ভয় করে সেই দিকে তাকাতে। আমাদের পাশেই অন্য দুটো জাহাজ বাঁধা ছিল। দেখি তাদের মাস্তুল ভাঙা। গড়াগড়ি খাচ্ছে পাটাতনের উপর। আমাদের জাহাজের এক মাঝি চিৎকার করে বলল, এক মাইল দূরে বাঁধা ছিল আরেকটা জাহাজ, সেটা নাকি নোঙর ছিঁড়ে কোথায় ভেসে গেছে। যে সব

জাহাজে মাল বোঝাই তাদের তবু একটু যা নির্ভয়, হালকাগুলোরই মর্মান্তিক অবস্থা। ঠেলতে টেলতে বাতাস দু-তিনটেকে নিয়ে এসেছে একদম আমাদের কাছের গোড়ায়। ঢেউয়ের দোলায় টালমাটাল তাদের হাল।

সন্ধ্যের দিকে সারেং বলল, সামনের মাস্তুল রাখা এখন বিপজ্জনক। কেটে ফেলতে হবে। কাপ্তেনের তাতে ভীষণ আপত্তি। তখন সারেং বলল, যদি মাস্তুল থাকে তাহলে জাহাজ সামাল দেওয়া যাবে না। এবার বিবেচনা করে দেখুন। তখন রাজি হলো কাপ্তেন। মাস্তুল সমেত পাল তখন নামানো হলো। কিন্তু তাতে করে পিছনের বড় মাস্তুল দেখি নড়বড় করে। তাতে নতুন বিপত্তি। তখন সেটাও খুলে শুইয়ে দেওয়া হলো পাটাতনের একধারে। ব্যস, পাটাতন এখন পুরোপুরি ফাঁকা।

আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। এই আমি—কদিনই বা আছি জাহাজে। নাবিক ঠিকই, কিন্তু নতুন যে। ভয়ে তো বুক আমার সর্বদা ধুকপুক করে। কদিন আগে যে ঝড় দেখেছি, তা ভয়ের ঠিকই তবে এতটা নয়। এ অবস্থায় পড়তে হবে আগে কি জানতাম? হায় হায়, এখন তো জীবন রক্ষা করাই দায়। পুরনো চিন্তাগুলো আবার মনের আনাচে কানাচে পাক খেতে শুরু করেছে। নিজের উপর রাগ। আর কথা শুনি নি কারুর, অগ্রাহ্য করেছি বাবার আদেশ—সব নিয়ে ভারি তোলপাড় মনের ভেতরটায়। আসলে হুবহু যে কীরকম, আমি বলে বোঝাতে পারব না, ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। সমানে ছুটে চলেছে ঝড়। ছোটাই বলব। রাগে দাপাদাপি করতে করতে ছুটে গেলে যেমন লাগে। সবাই দেখি ভয়ে তটস্থ। তবু জাহাজটা আমাদের ভালো সেই যা সান্ত্বনা। কিন্তু মালে তো বোঝাই। যেকোনো মুহূর্তে গোত্তা খেয়ে পড়তে পারে সমুদ্রে। তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তবে তলাবার যে কী অবস্থা সেটা এখনো আমি প্রত্যক্ষ করি নি। সেটা আমার একটা সান্ত্বনা বলা যেতে পারে। তাই সে বিপদটা ওরা যেভাবে দেখছে, আমি ততটা নই। এদিকে বসে গেছে কাপ্তেন আর সারেং প্রার্থনায়। প্রার্থনা ছাড়া এই মুহূর্তে করণীয়ই বা কী। দেখতে দেখতে রাত গভীর। কেমন মন মরা ভাব চারদিকে। এরই মধ্যে কে একজন চিৎকার করে উঠল, জাহাজ নাকি ফুটো হয়ে গেছে। খোলে প্রায় চার ফুটের মতো জল। অমনি ছুট ছুট! জল পাম্প করে বের করে দিতে হবে। সে প্রায় যেখানে যে আছে সবাই। আমি এগোতে সাহস পেলাম না। মৃত্যুভয় একটু একটু করে চেপে বসছে আমার বুকের উপর। কেবিনেই বসা। পারি না এক পা নড়তে কি উঠতে। তখন একজন এল। বেদম ধমক লাগাল।—অপোগণ্ড, এখানে বসে আছে! যা গিয়ে হাত লাগা। তখন তাড়া খেয়ে উঠলাম। নিচে গেলাম। জল বের করার কাজে হাত লাগালাম। খাটলাম জান দিয়ে। কাপ্তেন এসে বলল, এক কাজ কর, কামান গর্জে বিপদের কথা সবাইকে জানিয়ে দাও। আর দেরি করা ঠিক নয়। আমার তো হাত পা তখন কাঁপতে শুরু করেছে। সেই অবস্থায় আমিও প্রার্থনায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। কারোর কি আর খেয়াল আছে আমার দিকে? নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই। নিজের প্রাণটা সবার কাছে অনেক বড়। এদিকে কাজ তো বন্ধ। তখন কার যেন আমার উপর নজর গেল। ছুটে এসে এক লাথিতে ছিটকে ফেলে দিল আমায় একধারে। তারপর আমি যা করছিলাম সে সেটা করতে লাগল। আমি একইভাবে পড়ে রইলাম।

আর রক্ষা নেই। এটা কেবল আমি নই সবাই জানে। জাহাজ আর বাঁচানো যাবে না। ঝড় একটু কম। কিন্তু খোলে জলের আর কামাই নেই। যতই তুলে ফেলা হয় কিছুতেই শেষ হয় না। এদিকে বন্দরও বেশ খানিকটা দূর। এই অবস্থায় কোনোক্রমে গিয়ে যে সেখানে ভিড়ব তারও উপায় নেই। সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ইতোমধ্যে পরপর

কয়েকবার তোপ দাগা হয়েছে। একটু পরে দেখি ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের মাথায় তোলপাড় খেতে খেতে একখানা নৌকো নিয়ে কজন মাঝি হাজির। কাছেরই আর এক জাহাজ থেকে পাঠিয়েছে। তা সে কি আর পারে জাহাজের কাছে গোড়ায় ভিড়তে। ঢেউ যে ভীষণ। চেষ্টা করে প্রাণপণ, ঢেউ সরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। সে এক যুদ্ধই বলা যেতে পারে। আমাদের জীবন রক্ষার জন্যে নৌকোর মাঝিদের মরণপণ যুদ্ধ। শেষে যখন আর কিছুতেই পারা যায় না, তখন জাহাজ থেকে কাছি ছুড়ে দেওয়া হলো নৌকা লক্ষ করে। বহুকষ্টে ওরা তার নাগাল পেল। তারই সাহায্য নিয়ে নৌকো এনে লাগানো হলো জাহাজের গায়ে। উঠলাম আমরা অনেকে। কিন্তু যাব কোথায়? সেটা একটা সমস্যা। এই ঢেউ অগ্রাহ্য করে বাতাসের বিপরীতে তাদের জাহাজে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে একটাই করণীয়। যেন তেন প্রকারে কূলের নিকটবর্তী হওয়া। সেটাই সাব্যস্ত হলো। তখন টালমাটাল অবস্থায় নৌকো চলল উইন্টারটেন নেসের দিকে।

মিনিট পনেরো পর আমাদের চোখের সামনে জাহাজ তলিয়ে গেল। একটু একটু করে ডোবা, এই আমি প্রথম দেখতে পেলাম। প্রথমটা খেয়াল করি নি। পরে নাকিকেরা বলতে নজর গেল। আমি তো থ। বড় কষ্ট লাগছিল দেখতে। আর ভয়। যদি থাকতাম আমি জাহাজে! যদি নৌকোয় উঠতে না পারতাম। তবে কি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হতো।

এদিকে প্রাণপণ চেষ্টা করছে মাঝির দল। যুদ্ধ যাকে বলে। ঢেউয়ের সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ। ঢেউ তো না যেন পাহাড় মুহুর্মুহু দমকে ভেসে উঠছে এক একটা পাহাড়ের মাথায়, কূল দেখতে পাই। বেশি দূর নয়, কাছেই। মনে হয় আর একটু গেলেই পৌঁছে যাব। পারি না পৌঁছাতে। আর এক দমকে ফের পিছিয়ে পড়ি। একবার তো উইন্টারটেনের লাইট হাউস অব্দি দেখতে পেলাম। আর মানুষ। সে যে কত গুণে শেষ করা যায় না। ছোটাছুটি করছে হন্যে হয়ে। আমাদের হাতছানি দিয়ে উৎসাহ জানাচ্ছে। সাহায্য করতে চাইছে নানান ভাবে। সে যে কী অসহায় অবস্থা! সিধে তো পারি না যেতে, গতি এখন কোনাকুনি। তারপর আরো লড়াই, আরো যুদ্ধ, আরো সংগ্রাম। শেষে ডাঙ্গায় গিয়ে ভিড়ল তরী। নিরাপদেই পৌঁছেছি বলা যায়। সুস্থ আমরা সকলে এবং নিশ্চিন্ত। হাঁটতে হাঁটতে চললাম তখন ইয়ারমাউথের দিকে। সে অনেকখানি পথ। তবে পৌঁছতে সবাই খাতির করল। ভালো জায়গা দিল থাকতে, খাবার দিল, টাকা দিল। দয়া আর কী সান্ত্বনা। আমরা ডোবা জাহাজের নাবিক যে। আমাদের যে মন্দভাগ্য। বলল, আর সমুদ্রপথে নয়। স্থলপথে এই টাকা নিয়ে আপনারা হয় লন্ডন নয়তো হুলে ফিরে যান।

সেই কথাই ভাবি। যদি ওদের কথামতো হুলে ফিরে আসতাম, তারপর ঘরের ছেলে ফিরে যেতাম ঘরে, তবে এত কষ্ট কি দুর্দশা কিছুই হতো না। সুখী হতাম নিজ পরিবেশে। বাবারও বড় আনন্দ হতো। শুনেছেন তো জাহাজ ডুবির খবর। তারপর তো কদিন ধরে দুশ্চিন্তায় অস্থির। পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছেন আমি মরি নি, নিরাপদেই আছি।

সে যাই হোক, পারলাম না বাবাকে সুখী করতে বা নিজে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়া পেতে। ভাগ্য যে আমার খারাপ। তাড়া করে বেড়ায় প্রতিমুহূর্তে। তাতে যুক্তি বেশির ভাগ সময়ই থাকে না। অথবা পারি না তাকে অবহেলা করতে কি এড়াতে। একে কী বলব আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝি এরকম যাদের ক্ষেত্রে ঘটে, তারাই দ্রুত ধ্বংসের দিকে পা বাড়ায়। চোখ কান খোলা রেখে হিসেব করে পা ফেললেও তার থেকে নিস্তার নেই পরিত্রাণ নেই। অন্তত প্রথম নিদর্শন তো হাতে হাতেই পেলাম।

তা সেই যে আমার বন্ধু—যে আর কি জাহাজে ডেকে নিয়েছিল আমায়, আমাদের কাপ্তেনের ছেলে—ইদানীং দেখি কেমন যেন মনমরা ভাব, কেমন যেন ভীরু ভীরু।

ইয়ারমাউথে আসার দুদিন পর তার সঙ্গে দেখা। এক জায়গায় তো সবাই থাকি না। একটু ছাড়া ছাড়া। এক একজন এক এক বাড়িতে। তো কথাবার্তা হলো। কেমন যেন উৎসাহহীন। যেন ভারি নিঃসঙ্গ মানুষ। কথা বলার চেয়ে হ্যাঁ হুঁ করেই সংক্ষেপে বেশি জবাব দেয়। বাবার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল কে আমি, কোথা থেকে কীভাবে জাহাজে এসেছি। আরো যে সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছে আমার সেটাও বলল। শুনে বাবার অর্থাৎ কাপ্তেনের চোখ মুখের সে যা হাল। বললেন, শোনো ছোকরা, তোমার আর সমুদ্রযাত্রা না করাই ভালো। উচিতও নয়। নাবিক হওয়া তোমাকে মানায় না। বললাম, কেন বলছেন একথা? আমাকে মানা করছেন, আপনি নিজেও কি আর সমুদ্রযাত্রায় যাবেন না?

... আমাকে যদি কেউ হাজার পাউন্ড দিয়ে বলে উঠতে—আমি উঠব না—মরে গেলেও না

বললেন, আমার ব্যাপারটা আলাদা। সমুদ্রে যাওয়াই আমার পেশা। কিন্তু তুমি তো এই প্রথম। শুরুটা তোমার মন্দ। তুমি অপয়া। ভুলেও আর কখনো জাহাজে উঠবার নাম করো না। কক্‌খনো না। আর শুনে রাখ, তুমি যদি ফের জাহাজে ওঠ, সেই জাহাজে আমাকে যদি কেউ হাজার পাউন্ড দিয়ে বলে উঠতে—আমি উঠব না। মরে গেলেও না।

অর্থাৎ উত্তেজিত হয়েছেন ভীষণ এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেটা স্বাভাবিক। কারণ ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। পারেন নি এ অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে। আমাকে মিথ্যে দোষারোপ করতে অপয়া বলতে বাধ্য হয়েছেন। সে মনোভাব আমি আর পরিবর্তন করতে তৎপর হলাম না। মনের ঝাল মিটিয়ে তিনিও কিছুটা ধাতস্থ হলেন। আমাকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে। বাবার কথা মান্য করতে। বললেন, যেন মনে রাখি তার প্রতিটি নির্দেশ। ভুলেও যেন জাহাজে ওঠার নাম না করি। তবে আবারো দুর্ভোগে ভুগতে হবে। আবারো অসীম লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমার অদৃষ্টে জুটবে।

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তারপর। অত কথা যে বললেন আমি তো জবাব দিই নি তেমন। তাই কথার পিঠে কথা টানবার বা সেই প্রসঙ্গ নিয়ে পরে অন্য কথা বলবার

অবকাশও হয়ে ওঠে নি। সেই শেষ দেখা। কোথায় তারা গেল জানি না। আমি লন্ডনের পথে রওনা হলাম। বলা বাহুল্য স্থলপথে। সঙ্গে টাকা তো রয়েছে। পথে যেতে যেতে চিন্তায় কেবল মন তোলপাড় হয়। কী করব এবার। কোথায় যাব!

বাড়ি যাওয়া অসম্ভব। লজ্জা খুব। পারি নি সমুদ্র প্রবাসে গিয়ে জীবনটাকে নতুনভাবে সাজাতে। জাহাজ ডুবির পর ফিরে আসছি দুর্দশা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, লজ্জা নিয়ে। লোক হাসাহাসিতো এই নিয়ে খুব একচোট হবে। তাতে বাবা মাও লজ্জা পাবেন। আমার জন্যে বাবা মা লজ্জা পাবেন! হাসবেই সবাই, আমি জানি। মানুষের মুখ বন্ধ করব কীভাবে। দেখেছি যে বিস্তর মানুষ। বুঝেছি তাদের স্বভাব, অভ্যেস। আমাকে দুয়ো দেবে বিশেষ করে আমার বয়েসী ছোকরার দল। ভারি যে বেপরোয়া। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় বোঝে না। বুঝিয়ে দিলে অনুতাপ করতে জানে না। এটা বোকামিরই লক্ষণ। বোকামি করে তারা আর তাই দেখে লজ্জা পান আমার বাবা মায়ের মতো ভালোমানুষের দল।

এইসব চিন্তা মনের মধ্যে কেবলই পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। কী করব কিছু ঠিক করে উঠতে পারি না। বাড়ি যেতে একদম ইচ্ছে করে না। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এদিকে প্রথম সমুদ্রযাত্রার সেই যে দুর্দশা, সেটাও এতদিনে একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। এখন আর নেই বললেই হয়। বরং ভাগ্যটাকে আরেকবার যাচাই করতে নতুন করে ফের সমুদ্রে যাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে চেপে বসেছে।

সেই জিদ। আমি আবারো ভেতরে ভেতরে টের পাই। সেই বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করার গোঁ। সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের গোঁ। সব তুচ্ছ এর কাছে। বাবা-মা, তাদের শাসন, তাদের উপদেশ, আমার দুর্দশা—সব। অলীক অজানাই মনকে যেন বড় বেশি টানে। ঝাঁপিয়ে পড়তে মন চায়। অজানার অভিসারে। এখনো সেই টান। তারই তাড়নায় চেপে বসলাম ফের আফ্রিকাগামী এক জাহাজে। নাবিকেরা অবিশ্যি আফ্রিকা বলে না, বলে গিনি। সমুদ্রে ফের জাহাজ ভাসল।

দুর্ভাগ্য এই, নিজেকে তখনো পারি নি পুরোপুরি নাবিক করে তুলতে। কাজকর্ম অবিশ্যি অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশিই করি, তবু নাবিকের মতো অতটা খাটতে পারি না। এরই মধ্যে মাস্তুলের কাজটা ভালো শিখেছি। হয়তো ভবিষ্যতে জাহাজের সর্বাধ্যক্ষ অব্দি হতে পারব। কাপ্তেনও বনে যেতে পারি। কিংবা সারেং। শুধু নাবিকটা বাদ। ওটা আমার ধাতের বাইরে। মাস্তুলের টঙে চড়বার মধ্যে যেন অনেক বেশি রোমাঞ্চ, অনেক বেশি উত্তেজনা। যেহেতু রোমাঞ্চ আমরা ভালো লাগে তাই এই কাজটাই আমার প্রিয়। নাবিকেরা, বলতে বাধা নেই আমাকে যেন একটু সমীহই করে। পোশাক-আশাকে ভদ্র, তার উপর টাকা পয়সাও পকেটে কিছু আছে। দুটোই ওদের এক্তিয়ারের বাইরে। তাই খাতির পাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি। লন্ডনে থাকাকালীন বেশ কিছু ভালো মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এমন সচরাচর হয় না। অন্তত আমার মতো ছেলেদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। বয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায় তা আমি নই। তবে অনেকটা তো সেরকমই। এ অবস্থায় ভালো সাথী সচরাচর তেমন জোটে না। ভালো অর্থে যেমন ধরুন জাহাজের এক কাপ্তেন। তিনি গিনিতে আগে একবার গিয়েছেন এবং তার ধারণানুযায়ী সফল সে যাত্রা। আবারও যাবেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো খুবই খুশি। বিশেষ করে আমি যখন বললাম, দুনিয়াটাকে দেখবার জানবার আমার খুব আগ্রহ, আমাকে বললেন, চল না আমার সাথে। কোনো খরচ তোমার লাগবে না। সঙ্গে বরং দু একটা জিনিসও নিয়ে চল। ব্যবসা করার সুযোগ পেলে দু চার পয়সা আমদানিও হয়ে যাবে। মোটমাট মন্দ কী।

মন্দ তো নয়ই। আমার পক্ষে বরং যথেষ্ট। লুফে নিলাম তার আহ্বান। মানুষটাকে বড় আপন বলে মনে হতে লাগল। সরল সাদাসিধে, সৎ, ভারি মিশুক। কথামতো সঙ্গে কিছু খেলনাও কিনে নিলাম। স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, খেলনা বেচে সেবার বেশ কিছু অর্থের মালিক হতে পেরেছিলাম। পুঁজি মাত্র চল্লিশ পাউন্ড। সেটাও চেয়ে চিন্তে যোগাড় করা। লিখেছিলাম আত্মীয় স্বজনদের কাছে চিঠি। তারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। হয়তো তাদেরই কাছ থেকে বাবা আমার খবরাখবর পেয়ে থাকবেন। মোটমাট সবদিক থেকেই নিশ্চিন্ত এবং শুভও বটে। এ যাবৎ এত সমুদ্রযাত্রা আমি করছি, যত অভিযান, এই একটিমাত্র যাত্রা সবদিক থেকে চমৎকার। তার পুরো কৃতিত্ব অবশ্যই আমার সেই বন্ধু কাপ্তেনের। সে ভালোবাসার কথা আমি জীবনে ভুলব না। আমাকে ধরে ধরে অঙ্ক শেখালেন, সমুদ্রের নানান জ্ঞাতব্য—নাবিকদের ক্ষেত্রে যেগুলো অবশ্যই জানবার প্রয়োজন আছে শেখালেন। ঐ যে বলে না হাত ধরে শেখানো—অনেকটা তাই। জাহাজে কাজ করতে গেলে কী কী দিকে নজর রাখতে হয়, কোন কোন জিনিসটা ভালো করে দেখতে হয়—তাও কদিনের মধ্যেই শিখে ফেললাম। আমি যাকে বলে কৃতার্থ। পাকাপাকি নাবিক বনে গেলাম কদিনের মধ্যে এবং ব্যবসাদারও। ফেরবার সময় খেলনা বেচা লাভের টাকা দিয়ে নিয়ে এলাম পৌনে ছয় পাউন্ড ওজনের স্বর্ণরেণু। সেটা লন্ডনে বিক্রী করে মোট আয় হলো তিনশ। তখন একটা আশা একটা আত্মবিশ্বাস নিজের মনে জন্ম নিল।

তবে হ্যাঁ, একদম যে সুস্থ স্বাভাবিক চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে এই সমুদ্রযাত্রা সেটা বুক বাজিয়ে বলা যায় না। জ্বর হয়েছিল ভীষণ। বিশ্রী জ্বর। ঠাণ্ডা গরম আবহাওয়া থেকে উৎপত্তি। কদিন তো ঠায় পড়ে রইলাম বিছানায়, ঝিম মেরে, আর স্বপ্ন দেখি উদ্ভট উদ্ভট। এটা শুনি প্রথমদিকে সকলেরই হয়। বিশেষ করে এই অঞ্চলে আসা মাত্র।

বলতে দ্বিধা নেই, এখন আমি পুরোদস্তুর ব্যবসাদার। অন্তত গিনিতে গিয়ে কীভাবে কী করব সব আমার কণ্ঠস্থ। ফের যাব গিনিতে। তবে দুর্ভাগ্য এই, আমার সেই বন্ধুকে আর পাওয়া যাবে না। মারা গেছে সে হঠাৎ সমুদ্রযাত্রা থেকে ফেরার কদিনের মধ্যে। বড় কষ্ট সেই জন্যে। কিন্তু উপায় নেই। মন আমার এখানে থিতু হতে চায় না। একদিন জাহাজে উঠে বসলাম। সেই জাহাজ। শুধু কাপ্তেন এবার আলাদা লোক। আগে যে জাহাজের সারেং ছিল তারই হাতে এখন ন্যস্ত হয়েছে গুরুভার। অবিশ্যি তার জন্যে আমার কোনো অসুবিধে নেই। সঙ্গে টাকাও প্রায় একশ পাউন্ড। দুশ গচ্ছিত রেখে এসেছি কাপ্তেনের স্ত্রীর কাছে। আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন, স্বামীর মতো তিনিও আমার মঙ্গল চান। কিন্তু হলে কী হয়, ঐ যে বলে কপাল। দুর্ভাগ্য যত রাজ্যের। এমন বিশ্রী অবস্থায় আমি জীবনে কখনো পড়ি নি। ভাবতেও পারি নি এতটা ঘটবে। গোড়া থেকেই বলি।

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলছে আমাদের জাহাজ। একধারে আফ্রিকা আর একধারে দ্বীপপালা। হাওয়া ভালো। সবই চমৎকার। হঠাৎ একদিন ভোরে দেখি তুর্কিদের একখানা দস্যু জাহাজ সালের দিক থেকে আসছে। অসীম তার বেগ। যেন তাড়া করছে আমাদের। এ অবস্থায় চটপট পালানো ছাড়া তো উপায় নেই। দিলাম অমনি সবকটা পাল তুলে। ওদেরও পাল তোলা। পারি কি আমরা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে! একটু পরেই দেখি কাছাকাছি প্রায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ধরে ফেলবে আমাদের। তখন লড়াই করার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। বিনা যুদ্ধে হার মানা এক্ষেত্রে বোকামি। বারোটা বন্দুক মোট আমাদের। তা নামানো হলো। ওদেরও হাতে বন্দুক। গুনে দেখি আঠারোটা। আর লোক প্রায় দুশ। একদফা গুলি চালাচালি হলো। আমাদর দলে হতাহত কেউ নেই। ফের ছুড়ল ওরা গুলি। আমরা তখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। তখন ষাট জন দস্যু

হই-হই করতে করতে আমাদের জাহাজে আচমকা উঠে এল। সে কী দাপট! এটা ভাঙে ওটা কাটে পাল ফুটো করে দেয়—যেন চোখের নিমেষে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। পাঠক অনুমান করতে পারছেন, কত অসহায় আমরা। কিছুই করার নেই। ইতোমধ্যে আমাদের তিন জন মারা গেছে, আট জন গভীরভাবে জখম। বাকিদের ওরা বন্দি করল। আর তার মধ্যে আমিও আছি। নিয়ে গেল সালেতে। সেটা মুরদের আস্তানা এবং নামকরা বন্দর।

তবে বন্দি হলেও ব্যবহার খারাপ পাই নি। সেটা আমার সৌভাগ্যই বলা যায়। গোড়ায় ভয় ছিল খুব—না জানি কি না কি অত্যাচার করে আমার উপর। সবাইকে বেঁধে নিয়ে গেল সম্রাটের এজলাসে, শুধু আমি বাদ। দস্যুদলের সর্দারের আমাকে ভারি পছন্দ। বয়েসটা তো কম, খাটাখাটনিও করতে পারি। এটা হয়তো বুঝে থাকবে। তার কাছেই রেখে দিল আমায়। অর্থাৎ ক্রীতদাস যেরকম। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। কোথায় হব ব্যবসাদার, তা নয় সব আশা নির্মূল করে হতে হলো আমায় ক্রীতদাস। দুঃখে তো বুক আমার ভেঙে যায়। আর বাবার কথা মনে পড়ে। ঘুরে ফিরে সেই সব পুরানো চিন্তা। হায় হায় মানি নি তার নির্দেশ, কত অপরাধই না করেছি। আরো কত দুঃখ আছে কপালে কে জানে!

সর্দার আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল। আশার আলো দেখতে পেলাম। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ফের জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যাবে পর্তুগাল কি স্পেনে। দস্যুতার প্রয়োজনেই। গৃহবন্দি তো থাকতে হবে না। তখন সুযোগ বুঝে একদিন পালাব। কিন্তু কোথায় কী! গেল ফের সমুদ্রযাত্রায়। আমাকে রেখে গেল বাড়িতে। বাগান দেখাশোনার কাজে। সঙ্গে ক্রীতদাসেদের আরো সব খুচরা কাজ। রইলাম তাই। ফিরে এসে বলল, এখানে আর তোর থাকতে হবে না। আমার জাহাজে গিয়ে শুবি। বন্দরে ভেড়ানো আছে। দেখাশোনা করবি। এটাই এখন থেকে তোর কাজ।

তবু ভালো। গৃহবন্দিত্ব তো ঘুচল। এখন শুধু ঘুরে ফিরে একটাই চিন্তা—কীভাবে পালানো যায়, কত সুচতুর উপায়ে আমি এখান থেকে সটকে পড়তে পারি। ভেবে ভেবে কূল আর পাই না। কথা যে বলব কারো সাথে, আলোচনা করব—এমন একজনও নেই। ক্রীতদাসদের মধ্যে না একজন ইংরেজ কি আইরিশ কি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা। শুধু একলা আমি এই ভাবেই কেটে গেল টানা দুটি বছর।

আমি হতাশ প্রায়। কী লাভ আর অহেতুক ভাবনায়! ঠিক তখনি অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

সর্দার তখন বাড়িতেই। ফিরে আসা পর্যন্ত একবারও বের হয় নি। জাহাজ মেরামতির কাজ তখনো কিছু কিছু বাকি। ইত্যবসরে মাঝে মাঝেই পোকা নড়ে ওঠে মাথায়। তখন সাম্পান নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সে প্রায় হপ্তায় দু-তিনবার। সঙ্গে থাকে মারেস্কো। তারও বয়েস কম। সেও ক্রীতদাস। তা দু'জন মিলে হই হুল্লোড় করে সারাক্ষণ খুশি রাখি আমরা সর্দারকে। ফলে প্রতিবারে আমাদে দু'জনকেই তলব। আর আমার তো আরো একটা বাড়তি গুণ। ভালো মাছ উঠে আমার হাতে। সেটা আমার ভাগ্য মারেস্কো হয়তোবা বাদ গেল কোনোদিন, বদলি হিসেবে এল এক ছোকরা নিগ্রো। আমি স্ব-পদেই বহাল। মাঝে মাঝে এমনো হয়েছে। নিগ্রো আর আমাকে দিয়েছে পাঠিয়ে। মোটে দু'জন আমরা। আর কেউ নেই। আমরা মাছ ধরে এনে দিতাম।

একদিন সকালে তো ভীষণ কুয়াশা। আমি, মারেস্কো আর নিগ্রো বেরিয়েছি মাছ ধরতে। প্রায় এক ক্রোশটাক পথ পাড়ি দেবার পর দেখি সব বেভুল। কিছুই আর ঠাওর হয় না। চারধারে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলি। তারপর যে কত বাইলাম দাঁড়, কত পরিশ্রম তার

আর সীমা সংখ্যা নেই। কূল আর আসে না। দেখতে দেখতে দিন গেল, রাত ঘনাল। তখনো সমানে পালা করে দাঁড় বাইছি এক একজন। শেষে ভোর হতে কুয়াশা কাটল। দেখি তখন চার ক্রোশের মতো আমরা কূল থেকে দূরে। বাতাস উঠেছে। সে আর এক পরিশ্রম। বহু কষ্টে ছন্নছাড়া অবস্থায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর আমরা শেষ অব্দি কূলে গিয়ে পৌঁছালাম।

সর্দারকে বলতে সর্দার বলল, তাইতো এতো বড় দুশ্চিন্তার কথা। যদি সত্যি সত্যি পথ ভুল করে আরো দূরে চলে যেতি তোরা—সেই মাঝ দরিয়ায়! তখন তো নাকালের একশেষ। শুধু তোদের কেন, আমি থাকলে আমারো হয়তো এই দশা হতো। দাঁড়া, আমি ব্যবস্থা করছি বলে বড় জাহাজের কাঠমিস্ত্রীকে বলল শাম্পানে একটা ঘর বানাতে। কম্পাস রাখার ব্যবস্থা হলো। দরিয়ায় দিক নির্দেশের নির্ভুল দিশারী। তাক হলো ঘরে অনেকগুলো। একটা মদের বোতল রাখার, একটা খাবার-দাবার রাখার। মোটমাট বজরা যাকে বলে। ঘর অর্থে কেবিন। ওপরে সারেং বসার একটা ছোট ঘর। সেখানে বহুকষ্টে দু-তিন জনের মতো মানুষ শুতে পারে। অর্থাৎ আমাদের যদি কখনো শোবার দরকার হয়, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। খাবার টেবিলও পাতা হলো কেবিনের একধারে। আর ভাঁড়ারে মজুত হলো বিস্তর চাল, রুটি আর কফি।

এরপর থেকে মাছ ধরতে গেলে এই বজরাই আমাদের বাহন। সর্দারও সঙ্গে থাকে। আর আমি তো আছিই। মাছের ভাগ্য যে আমার খুব। একদিন দেখি আরো খাবার আরো বোতল তোলা হচ্ছে বজরায়। কী ব্যাপার? না, জিজ্ঞেস করে জানলাম, নাকি কজন মান্যগণ্য নিগ্রো বন্ধু যাবে প্রমোদ ভ্রমণে। সঙ্গে মাছ ধরার মজাও থাকবে, তারই জন্যে এই তোরজোড়। বড় জাহাজ থেকে তিনটে বন্দুক আর কিছু গোলাবারুদও আনা হলো। এগুলো অন্য কোনো কারণে নয়, আমি জানি। বালিহাঁস উড়ে বেড়ায় জলের ধারে ধারে, কখনো বা জলের বুকে। তাদেরই মারবার জন্যে এই ব্যবস্থা।

তো সব আয়োজন সম্পূর্ণ, এমনকি পরদিন সকালে ঝকঝকে তকতকে করে বজরা ধোয়াধুয়িও শেষ, পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি মাস্তুলের মাথায়, উড়ছে পতপত করে, এমন সময় সর্দার একলা এসে হাজির। থমথমে মুখ। নাকি যাবে না বলে জানিয়েছে অতিথিরা। অন্য কী কাজে হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছে। রাত্রে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন। ভালো মাছ খাওয়াবে মনে বড় সাধ ছিল। আমাকে বলল, তুই বজরা নিয়ে যা। সঙ্গে মারেস্কো আর নিগ্রো যাক। ভালো মাছ ধরে আনিস। পাওয়া মাত্র আর দেরি না করে ফিরে আসবি। বাড়িতে পাঠিয়ে দিবি। আমি অন্য সব যোগাড় করিগে।

বলে চলে গেল।

আমার বুকে তখন রীতিমতো ঝড় বইতে শুরু করেছে।

তোলপাড় ...

এই সুযোগ। এর সদ্ব্যবহার করা চাই। সবই আমার হাতে মজুদ। একটা বজরা, প্রচুর রসদ, তিনটে বন্দুক আর কম্পাস। আর কী চাই! এত ছোটখাটো একটা জাহাজেরই সমান। ভেসে পড়ব দরিয়ায়। তারপর আর পালাতে অসুবিধে কী।

তবে আরো কিছু রসদ দরকার। তার জন্যে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ব্যবস্থাও করা গেল। নিগ্রোকে বললাম, দেখ ভাই, আমরা তিন জন মালিকের খাবারের ভাগ বসাব এটাতো ভালো দেখায় না। বরং আমাদের জন্যে তুমি অন্য কিছু নিয়ে এসো। সে তখন এক ঝুড়ি বিস্কুট আর এটা ওটা নিয়ে এল। সঙ্গে তিন বোতল জল। বললাম, এতে হবে না, বড় জাহাজ থেকে আমাদের জন্যে কয়েক বোতল মদও আনো। সবতো জানা আমার।

কোথায় মদ থাকে কোথায় কী সব আমার কণ্ঠস্থ। তখন কটা দামী মদের বোতল আনল। খানিকটা মোম আমি এক ফাঁকে নিয়ে নিলাম। এটা দরকার কেননা রাত্রে মোমবাতি জ্বালবার প্রয়োজন হবে। খানিকটা সুতো নিলাম। একটা হাতুড়ি, একটা করাত আর একটা ছোট্ট কুড়ুল। তারপর নতুন এক ফন্দি করে বললাম, ইসমাইল, মালিকের বন্দুক তো রয়েছে দেখছি, কিন্তু গুলিগোলা তো নেই। সব জাহাজে। গুলি থাকলে বরং কটা বেলে হাঁস মেরে আনতাম। তাতে কর্তা সন্তুষ্ট হতো। তুমি বরং জাহাজ থেকে এক বাক্স গুলি নিয়ে এস। তার বুদ্ধি-শুদ্ধি তো মাথায় কম। ভাবতে পারে নি আমার মতলব। সুবোধ বালকটির মতো নিয়ে এল এক বাক্স গুলি আর সেই সঙ্গে অনেকখানি বারুদ। ইত্যবসরে আমি কেবিনের তাক থেকে মালিকের বারুদের বাক্সটা নিয়ে সবটুকু বারুদ দুটো খালি শিশিতে ভরে মদের তাকে তুলে রাখলাম। বাক্সটা পড়ে রইল খালি। ব্যস সব আয়োজন শেষ। তখন নোঙর তুলে বজরা দিলাম ভাসিয়ে।

যদি উঠবার চেষ্টা করিস তবে এক গুলিতে জান নিয়ে নেবো

ঈশান কোণ থেকে বইছে বাতাস। পাল তখন গোটানো, পাল তুলে দিলে সোজা চলে যাব স্পেন বা কাদিজের কাছাকাছি। সেটা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু আপাতত সেই সদিচ্ছা আমার নেই। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে সটকে পড়াই আমার মতলব। আগে এখান থেকে পালাব, তারপর ভাগ্যের হাতে আমার জীবন। যেখানে ভেসে যাবে যাক। আমার আর কোনো পরোয়া নেই।

যথারীতি ওদের ধোঁকা দেবার মতলবে ছিপ ফেললাম জলে। মাছ ঠোকরাল, টোপ খেল। আমি ছিপ তুললাম না বা একটা টানও দিলাম না। বললাম, জানি না আজ আমাদের ভাগ্যে কি আছে, এখানে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং চল আরো খানিকটা এগোই।

তখন দাঁড় বাইতে বাইতে ক্রমশ কূল থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। আমার হাতে ছিপ। আমি তো এখন বজরার কর্তা, ওরা আমার আদেশ মানতে বাধ্য। তাছাড়া আদেশের মধ্যে ওদের বুঝবার মতো কোনো দুরভিসন্ধিও নেই। বজরা যখন বেশ

অনেকখানি দূরে, ধীরে ধীরে ছিপ রেখে আমি গিয়ে ইসমাইলের পেছনে দাঁড়ালাম। একদম জলের ধার ঘেঁষে সে দাঁড়ানো। দাঁড় বাইছে অপর ছেলেটি, তার নাম জুরি। হঠাৎ এক ধাক্কায় ফেলে দিলাম তাকে জলে। তখন তো হাবুডুবু খেতে খেতে অস্থির। তবু ওস্তাদ সাঁতারু তো, বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে অমনি বড় বড় হাতে জল কেটে চলে এত বজরার ধারে, আমাকে বলল তুলে নিতে। সে কী কাতর মিনতি! তখন এক ঝটকায় কেবিনে ঢুকে নিয়ে এলাম বন্দুক। বললাম, খবরদার। যদি উঠবার চেষ্টা করিস তবে এক গুলিতে জান নিয়ে নেব। বরং সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় ফিরে যা। ঢেউ বিশেষ নেই। তুই ভালো সাঁতার জানিস। মরবি না। আমরা চললাম। আর ফিরে আসব না কোনোদিন।

তখন ইসমাইল ধাতস্থ হলো। বজরা ছেড়ে কূলের দিকে ফেরাল মুখ। জুরিকে দেখি একমনে দাঁড় বাইছে। বন্দুক নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। বললাম কীরে, কথা শুনবি তো আমার? আল্লার নামে শপথ কর। নইলে তোরও কিন্তু একই দশা হবে। জবাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি যেন অবিশ্বাস না করি। আমি যেখানে নিয়ে যেতে চাই, অনুগত ভৃত্যের মতো সেখানে আমার সাথে যাবে।

আমি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিগ্রো সাঁতার কেটে ফিরে চলেছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাল খুলে দিয়েছি একটু আগে। কূল ক্রমশ দূর থেকে বহুদূর। এইবার শুরু হবে আমার আসল খেলা। হাওয়ার পাশ কাটিয়ে আমি চলে যাব ভিন্ন দিকে। সবাই ভাবকে গেছি বারবারার উপকূলের দিকে। পরে হয়তো সেখানেই গিয়ে খোঁজখবর করবে। ধরতে যদি পারে আমাকে আর রক্ষে নেই। এরা কত নির্দয় কত নিষ্ঠুর আমি হাড়ে হাড়ে জানি। প্রথম কাজ হবে এদের নাগাল থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া।

সন্ধ্যের ঘোর লাগতে বজরার মুখ ঘোরালাম দক্ষিণ পূর্ব দিকে। এটাই আমার পালাবার পথ। ওরা হাজার চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না। আর পুবে থাকার সুবিধে প্রচুর। কূলের ধার দিয়েই বলতে গেলে এগোব, তাতে হাওয়া পাব পালে। তরতর করে এগিয়ে যাবে নাও। অন্তত এক রাতের চেষ্টায় এখান থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। মরক্কোর সম্রাটের এক্তিয়ারের বাইরে। আর কে আমার নাগাল পায়!

তবুও ঐ যে বলে ভয়, মনের মধ্যে অহরহ এক আতঙ্ক। ইসমাইলের সঙ্গে শেষ অব্দি ভালো ব্যবহার তো করি নি। প্রতিশোধ নেবার জন্যে নির্ঘাৎ নিশপিশ করছে ওর হাত। করুক। আমিও বেপরোয়া। থামব না একদম। কূল পেলেও না। নোঙর ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। পাঁচদিন এইভাবে চলব একনাগাড়ে। বাতাস এখন দক্ষিণমুখী। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। যদি ওদের কেউ জাহাজ নিয়ে আমাকে ধরবার জন্যে এগোয়—নির্ঘাৎ বেরিয়ে পড়েছে, আমি হলফ করে বলতে পারি; সেক্ষেত্রে ততক্ষণে তারাও ভগ্নোদ্যম অবস্থায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তখন আর ভাবনা কী, আমি মুক্ত।

সেই হিসেবেই পাঁচদিন চললাম একটানা। ছয় দিনের দিন, ছোট্ট এক নদী, তার মুখে ফেললাম নোঙর। কোথায় কোন নদী, কী এই দেশের নাম, কত দ্রাঘিমা কত অক্ষাংশ কিছুই জানি না। নদীর নামও অজানা। দুটো প্রধান দরকার আপাতত। কিছুটা বিশ্রাম, আর কিছু পানীয় জল। এক ফোঁটা জল নেই বজরায়। সন্ধ্যে নাগাদ থেমেছি এখানে, ইচ্ছে সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় যাব, জল আনব টিন ভরে। কিন্তু তার কি উপায় আছে! সে যা তর্জন গর্জন জঙ্গলে, যে হাঁক ডাক। সে যে কত জন্তু। কত হিংস্র প্রাণী। জুরি তো ভয়ে তটস্থ। আমাকে বলল, দোহাই আপনার, খবরদার ওদিকে যাবেন না। বললাম, দেখ, নয় রাতটুকু কাটালাম। কিন্তু দিনের বেলা তো যেতেই হবে। তখন হয়তো জন্তুর সাক্ষাৎ মিলবে না,

কিন্তু মানুষ দেখতে পাব। বন্য হিংস্র মানুষ। তারা জন্তুর চেয়ে কোনো অংশে হয়তো কম নয়। জুরি বলল, তখন বন্দুক ছুড়ব, ঘায়েল করব তাদের। সেটা অসুবিধা কী। তারা ভয়ে পালাবে। মোটমাট ভারি খুশি জুরি। আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। তখন গেলাম না ডাঙ্গায়। জুরির উপদেশই মানলাম। কেবিন থেকে নিয়ে এলাম বোতল আর রুটি। খেলাম পেট ভরে। দেখি আবছা অন্ধকারে ডাঙ্গার ধারে জলে নেমে খেলছে নানান আকারের জীবজন্তু। কী তাদের উল্লাস! কী গর্জন! আমি জীবনে এইসব জন্তুর ডাক শুনি নি। ঘুম আর হলো না। দুটি প্রাণী নিথর হয়ে বসে রইলাম সারারাত।

জুরি যেন ভয়ে কুকড়ে আছে। আমিও। তবে সেটা প্রকাশ করতে সাহস পাই না। তাহলে জুরি আরো ঘাবড়ে যাবে। হঠাৎ দেখি এক ভয়ানক আকৃতির জন্তু সাঁতরাতে সাঁতরাতে আসছে বজরার দিকে। জুরি চিৎকার করে উঠল। বলল, পালান এক্ষুনি। নোঙর তুলে চলুন এখান থেকে সরে পড়ি। বললাম, দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না। তখন কেবিন থেকে বন্দুক নিয়ে এলাম। দেখি বজরার একদম কাছে এসেছে। ছুড়লাম গুলি। আর অমনি জন্তুটা ভয় পেয়ে কূলের দিকে ফিরে গেল।

গুলির শব্দে দশগুণ বাড়ল তর্জন গর্জন। সে যে কী হুটোপাটি! কী বীভৎসতা! আমাদের তো ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সোঁধাবার উপক্রম। তবু অন্য কোনো ঘটনা আর ঘটল না সে রাতে। ঘুমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। চৌপর রাত জেগে রইলাম। আর মাঝে মাঝে আলোচনা করি নিজেদের মধ্যে—কেমন ভাবে যাব কাল ডাঙ্গায়। যদি পড়ি বাঘ কি সিংহের খপ্পরে! যদি বাঘ সিংহ না এসে আচমকা চারদিক থেকে ছুটে আসে নরখাদক মানুষের দল!

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটল। জীবজন্তুর হাঁক ডাক এখন আর নেই। যে যার ডেরা নিয়েছে জঙ্গলের গহনে। আমাদের মাথায় এখন একটাই চিন্তা-জল আনতে যেতে হবে ডাঙ্গায়। আর তাই নিয়ে নানান সংশয়। জুরি বলল সে যাবে, আমার যাবার দরকার নেই। বললাম, কেন? বলল, যদি নরখাদক দল আসে তবে তাকে নিয়ে যাবে ধরে। সে অবস্থায় আমার তো আর কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্তে আমি ফিরে যেতে পারি দেশে। কী বলব, কথা শুনে এত ভালো লাগল ছেলেটাকে! কতখানি ভাবে আমার কথা! বললাম, তোমার একলা যাবার দরকার নেই। আমিও যাব। সঙ্গে থাকবে বন্দুক। তেমন বিপদ দেখলে গুলি চালাতে ইতস্তত করব না।

আরো একটু বেলা বাড়তে বজরা এগিয়ে নিয়ে গেলাম কূলের কাছে। তারপর জল ঠেলে হাতে টিন নিয়ে বন্দুক কাঁধে উঠলাম গিয়ে ডাঙ্গায়। সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠের মতো। তখন ঠিক হলো, মাঠের একধারে ডাঙ্গার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকব আমি, বজরার দিকে নজর রাখব। জুরি যাবে জলের টিন নিয়ে মাঠের শেষ প্রান্তে। জন্তুর ভয়ের চেয়েও নরখাদক মানুষের ভয় তখন সবচাইতে বেশি। যদি মারমার করে দল বেঁধে ডিঙি নিয়ে অতর্কিতে ছুটে আসে আমাদের বজরার দিকে। সব লুটপাট করে নেয়! কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিক থেকে আচমকা, আমাদের ঘিরে ধরে! সেক্ষেত্রে জলে ঝাঁপ দিয়ে অন্তত একজনের তো রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় থাকল।

দেখি একটু পরে জুরি ফিরে আসছে। হাসি হাসি মুখ। হাতে জলের টিন। কাঁধে কী যেন একটা জীবের মৃতদেহ। কাছে আসতে দেখি খরগোশ ঠিক নয়, তবে অনেকটা ঐরকম দেখতে একটা প্রাণী। বেশ লম্বাটে গড়ন। বলল, শিকার করেছে। মাংসের স্বাদ চমৎকার। বেশ জমবে আজ দুপুরের খাওয়া।

ভালোই খেলাম বা বলা যেতে পারে অপূর্ব। সঙ্গে সর্দারের কেবিন থেকে আনা এক বোতল উত্তম সুরা। জল যেটুকু এনেছে তাও সুস্বাদু। কোনো ঘোলা ভাব বা নুন কটা স্বাদ নেই। জুরি বলল, জল আনতে গিয়ে অন্য কোনো বন্য জন্তু বা কোনো বন্য মানুষের সাক্ষাৎ মিলে নি। পায়ের ছাপও দেখতে পায় নি। তবে ভয় ভয় করছিল সারাক্ষণ।

তারপর সে কী ডাক। আমি জীবনে এমন সিংহ-গর্জন শুনি নি

তা ভয় থেকে ওকে মুক্তি দেওয়া গেছে। খুব কাছেই রয়েছে আর একটা পানীয় জলের জায়গা। নদীর জল একটু বাড়লে সেখানে ফুর ফুর করে জল ওঠে। এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। জুরিকে এরপর ওখানেই পাঠাতাম জল আনবার জন্যে।

আগের বার সমুদ্রযাত্রায় আমি এ অঞ্চলে এসেছি। বলতে গেলে জায়গাটা আমার অচেনা নয়। কিন্তু যন্ত্রপাতি তো কিছু নেই এবার সঙ্গে। না কোনো ম্যাপ, না অন্য কিছু। সঠিক ভাবে জায়গাটার অবস্থান কী আমি জানি না। তবে এটুকু জানি এর আশে পাশেই কোথাও না কোথাও ক্যানারি দ্বীপমালা এবং ভার্দ অন্তরীপের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। কোথায় গেলে তার কোনো একটা দ্বীপ পাব সেটাই প্রশ্ন এবং আমার একমাত্র চেষ্টা তার যেকোনো একটিতে পৌঁছে যাবার। ব্যস তবে আর চিন্তা নেই। দ্বীপগুলি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ আসে নানান পসরা নিয়ে। তার যেকোনো একটাতে উঠে পড়ব। ফিরে যাব স্বদেশে।

যতদূর অনুমান, সেই মুহূর্তে যে অঞ্চলে আমরা রয়েছি, সেটা মরক্কো সম্রাটের রাজ্য এবং নিগ্রোদের রাজ্য—দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো এলাকা। এটি নির্জন এবং শ্বাপদসংকুল। অনুর্বর এলাকা, চাষবাসের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী, তাই নিগ্রোরা এখানে বসতি করে নি। চলে গেছে আরো দক্ষিণে। মরু অঞ্চলের প্রায় কাছাকাছি। আর জন্তুও এখানে অঢেল। চিতা থেকে শুরু করে নেকড়ে, বাঘ, সিংহ সবই আছে। এখানে নিগ্রোরা ক্বচিৎ কখনো আসে শিকার করতে। এটা তাদের মৃগয়াভূমি। আসে দল বেঁধে। এক এক দলে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। মাইলের পর মাইল জুড়ে এই বন। অন্তত শ' খানেক মাইল

তো আমাদেরই যেতে যেতে নজরে পড়ল। ঘন জঙ্গল। কূলের একেবারে গা ঘেঁষে। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু জন্তুর ডাক আর গর্জনের শব্দ আর পাখির কিচির মিচির। আর কোনো শব্দ কানে আসে না।

টেনেরি ফে-র চূড়োও নজরে পড়ল। ক্যানারি দ্বীপমালার সব থেকে উঁচু চূড়ো। দু দুবার চেষ্টা করলাম শিখরে ওঠার। তাতে চারদিকে নজর বোলাবার প্রচণ্ড সুবিধে। তাহলে দেখতে পেতাম কোথায় রয়েছে জাহাজ, কোথায় গ্রাম, কোথায় মানুষ—সব। কিন্তু এমনই খাড়াই, ওঠা সম্ভব হলো না। দু দুবারই নেমে আসতে বাধ্য হলাম।

জল আনবার জন্যে মাঝে মাঝেই নামি ডাঙ্গায়। টিনে করে পানি নিয়ে আসি। একদিন সকাল তখন। বললাম, আজ আর এগিয়ে কাজ নেই, নোঙর ফেলি এইখানেই। তখন নোঙর ফেললাম। ডাঙা এখানে উঁচু। খানিকটা ফাঁক মতো জায়গা। অদূরে পাহাড়। জল অনেকখানি নিচে। হঠাৎ জুরি বলল, ঐ দেখুন দৈত্য। ঐ পাহাড়ের গায়ে। তাকিয়ে দেখি সে এক মস্ত সিংহ। দৈত্যের মতোই আকৃতি। পাহাড়টা এগিয়ে এসেছে এখানে কূল অব্দি। ঝুলন্ত এক খণ্ড মস্ত পাথর। তারই উপর শুয়ে সেই সিংহ। নাগালের মধ্যেই আমাদের বললাম, তুই যা। ওটাকে মেরে আয়। জুরির চোখ তো ছানাবড়া। বলে, বলেন কী আপনি! আমি মারব অত বড় জন্তুটাকে! কাছে গেলেই আমাকে হালুম করে গিলে খাবে। বললাম, বেশ। তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখি। বলে বড় বন্দুকটা নিয়ে এলাম। তাতে বারুদ পুরলাম অনেকখানি, সঙ্গে দুটো টোটা। আরো দুটো বন্দুক এনে তাতেও বারুদ আর টোটা ভরে হাতের কাছে তৈরি রাখলাম। তারপর তাক করলাম। মাথা দেখা যায় না। এক পা তুলে নাকের সামনে দিয়ে আড়াল করে রেখেছে এমনভাবে যাতে মাথার মাখখানে দৃষ্টি স্থির করতে অসুবিধা হয়। তবু সেই অবস্থাতেই ঘোড়া টিপলাম। তাতে লাগল হাঁটুর কাছে। গর্জে উঠল। উঠে দাঁড়াতে গেল তৎক্ষণাৎ। পারল না। দেখলাম সামনের ডান পাটা ভেঙেছে। তারপর সে কী ডাক! আমি জীবনে এমন সিংহ-গর্জন শুনি নি। তখন আরেকটা বন্দুক নিয়ে কপাল তাক করলাম। সে তখন বনের দিকে চলে যাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছে। অমনি টিপলাম ঘোড়া। ব্যস জব্দ। মাথার মাঝখানে গিয়ে বিঁধল। মুহূর্তে ছিটকে পড়ল মাটিতে। দেখি হাত পা দাপাচ্ছে খুব। শেষ মুহূর্তের ছটফটানি যাকে বলে। বাঁচার জন্যে সংগ্রাম। এতে লাভ নেই কোনো, আমি জানি। তখন দেখি জুরি উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, যাব এবার আমি? বললাম, যাও। তখন বাকি বন্দুকটা নিয়ে এক হাতে জল সাঁতরে গেল ডাঙ্গায়, বন্দুকের নল কানে লাগিয়ে ঘোড়া টিপল। ব্যস শেষ। নিস্পন্দ নিথর হয়ে পড়ে রইল বিশালকায় জীবটা।

শিকারের মতো শিকারই বটে। আচ্ছা আচ্ছা শিকারিও অবাক হয়ে যাবে তার আকৃতি দেখে। কিন্তু ঐটুকুই। ঐ বাহবাই সার। মাংস তো খাবার উপায় নেই। শুনেছি সিংহের মাংস কেউ খায় না। অকারণ ছ ছটা টোটা নষ্ট করলাম এই জন্যে। কত মূল্যবান আমাদের কাছে এখন টোটা বারুদ! জুরি বলল, আমাকে কুড়ুলটা দিন। বললাম, কেন? বলল, মাথাটা কেটে আনব। আমার ভারি ইচ্ছে করছে। তখন কুড়ুল দিলাম। তবে কাটল না মাথা। একখানা পা শুধু আসার সময় কেটে নিয়ে এল। আমি বললাম, শুধু পা কেন, চল না ছালটাও ছাড়িয়ে নিই। তখন দু'জন মিলে বসলাম চামড়া ছাড়াতে। সে কি আর দু দশ মিনিটের কাজ! বলতে গেলে সারা বেলাটাই লেগে গেল। আমি তো আর ওস্তাদ নই, তবে জুরি কিছুটা পারে। ছালটা এনে বজরার চালে বিছিয়ে দিলাম। দুদিনেই রোদ পেয়ে শুকিয়ে একেবারে খটখটে। তখন সেটা বিছানায় পেতে দিলাম। শুতে যা আরাম!

এরপর দশ বারো দিন আর বিশ্রাম নেই, এক নাগাড়ে চলা। চলেছি সোজা দক্ষিণমুখো। খাবার দাবারের সঞ্চয় কমে আসছে। মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় নেমে জল নিয়ে আসি টিনে ভরে। ফের শুরু হয় চলা। নজর আমার যেন তেন প্রকারে গাম্বিয়া বা সেনেগাল নদীর নাগাল পাওয়া। দুটোর যেকোনোটা ধরেই যাওয়া যায় ভার্দ অন্তরীপে। সেখানে আমার স্থির বিশ্বাস ইউরোপের কোনো না কোনো জাহাজ পেয়ে যাব। আসে ওরা দল বেঁধে এখানে ব্যবসা করতে। গিনিতে যায়, ব্রাজিলে যায়, ইস্ট ইন্ডিজে যায়। যেকোনো একটা পেলেই হলো। বুঝিয়ে বললে কেউতো আর নিতে আপত্তি করবে না এবং বোঝাতে যে পারব আমার দুরবস্থার কথা, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

বারো দিন পর যে অঞ্চলে এসে পৌঁছলাম, সেখানে মানুষ থাকে। তার নানান প্রমাণ আমরা পাই। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় আমাদের দেখবার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম অনেক মানুষ। গায়ের রং কুচকুচে কালো আর উলঙ্গ একদম। পরনে এতটুকু ন্যাকড়া অব্দি নেই। একবার ভাবলাম যাই ওপরে, ওদের সঙ্গে একটু খাতির জমাবার চেষ্টা করি। জুরি বলল, খবরদার যাবেন না। যেকোনো বিপদ হতে পারে। কথাটা মন্দ বলে নি। চিনি না জানি না—কত কিই তো শুনি এইসব মানুষ সম্পর্কে। অবশ্যি দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে, নির্দোষ ভালোমানুষ চেহারা, কোনো অস্ত্র নেই কারো সাথে, শুধু একজনের হাতে একটা লাঠি। জুরি বলল, ওটা বল্লম। ভীষণ ধার। আর অব্যর্থ ওদের নিশানা। চোখের নিমেষে ধাঁ করে ছুড়ে দেবে। আপনি ডাইনে বাঁয়ে সরে আত্মরক্ষা করার সুযোগটুকুও পাবেন না। তা সেদিকে আমার গোড়া থেকেই নজর আছে। ডাঙ্গার একটু দূরে ফেলেছি নোঙর। নাগালের মোটামুটি বাইরে। স্থির হয়ে আছে বজরা। ওরাও স্থির। দেখছে আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে। তখন ইশারা করে বললাম, একটু কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে? অমনি একজনকে কী যেন বলে দিল। ছুটে গিয়ে সে নিয়ে এল খানিকটা মাংস। সঙ্গে কিছুটা যব। কিন্তু নেব কীভাবে? উপরে উঠতে যে সাহস হয় না। তখন বজরা খানিকটা এগিয়ে পাল্টা কাত করে এগিয়ে দিলাম। অনেকটা হাতার মতো। তারই উপর ইশারায় দিতে বললাম সব। বুঝল না ইশারার মানে। রাখল ডাঙ্গার ধার ঘেঁষে। কিন্তু যাই কী করে আনতে! মনে যে ভয়। হয়তো বুঝে থাকবে আমাদের মনের কথা। তখন সার বেঁধে একটু একটু করে পিছু হটে সবাই দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি গিয়ে নিয়ে এলাম খাবার। বজরায় ফিরে আসার সাথে সাথে ওরাও ফের আগের জায়গায় ফিরে এল।

ধন্যবাদ জানালাম মাথা ঝুঁকিয়ে। এছাড়া দেবার কিছুই নেই। খেলাম মাংস। বজরা তখনো নোঙর করা। শুয়ে আছি দুপুরে পাটাতনের উপর। হঠাৎ শুনি তুমুল কোলাহল। দেখি ভয়ে যে যার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পালাচ্ছে। আর পাহাড়ের দিক থেকে ছুটে আসছে একজোড়া অতিকায় জীব। ঝপাং করে নামল এসে জলে। একটা সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল ঐ দিকে, আর একটা দেখি গুটি গুটি আমাদের বজরার দিকেই এগোয়। জুরিকে ইশারা করতে জুরি এগিয়ে দিল বন্দুক। শোয়া অবস্থাতেই বারুদ পুরলাম, তারপর বাকি দুটোতেও পোরা হলো টোটা আর বারুদ। তাক করলাম মাথার দিকে। আর যখন সামান্য খানিক দূরে, তখন ঘোড়া টিপলাম। অব্যর্থ নিশানা। লাগল মাথার ঠিক মাঝখানে। এক লাফে উঠল একবার জলের উপর, তারপর ডুব। অর্থাৎ অবস্থা কাহিল। তখন দেখি জলের মধ্যে তোলপাড় খাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই এগোবার চেষ্টা করছে ডাঙ্গার দিকে। সে কি আর পারে। প্রাণটা যে বড় ক্ষণস্থায়ী। একটু পরে জলের মধ্যে যে শেষ ডুব দিল, আর উঠল না।

এদিকে ডাঙ্গার উপর তখন আর এক অবাক করা কাণ্ড। শব্দ শুনে সবাই তো ভিমরি খাবার যোগাড়। কয়েকজন দেখি আতঙ্কে মাটির উপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়েছে, হয়তো অজ্ঞান। বাকিরা অবাক চোখ নিয়ে বারবার দেখছে আমাদের দিকে আর গুটিগুটি এগিয়ে এসে ভিড় করছে। জন্তুটা বলতে গেলে ওদের চোখের সামনেই মরল। তখন হই-হই করে নেমে পড়ল একদল জলে। খোঁজ খোঁজ, জলের মধ্যে হাতড়ানি। পায় না খুঁজে। পাবে কী করে, জানে না তো সঠিক জায়গাটা কোথায়। সেটা আমি জানি। রক্ত নিচ থেকে উঠছে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে, ওখানেই মরে পড়ে আছে সে। তখন জায়গাটা ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। খুঁজে পেয়ে সে যা খুশি! কিন্তু পারে না টেনে তুলতে। তখন দড়ি দিলাম ছুড়ে। তাই দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ওপরে তুলল। দেখে আমিও অবাক। এ যে চিতা। এত বড় হয় নাকি চিতা বাঘ! ওরাও দেখা ইস্তক আহ্লাদে আটখানা নেচে কুঁদে ভঙ্গি করে সে যা উল্লাস, আমাদের উদ্দেশে যা অভিনন্দনের বহর।

আর একটা চিতা ততক্ষণ পালিয়েছে। গুলির শব্দ, আলোর ঝলকানি আর জনগণের উল্লাসে বোধহয় মাথা ঠাণ্ডা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পায় নি। জল থেকে তড়িঘড়ি উঠে সিধে পালিয়ে গেছে পাহাড়ের দিকে। এদিকে মরা চিতাটা নিয়ে গোল হয়ে বসে গেছে তখন যাবৎ মানুষ। কাটছে টাটকা টাটকা মাংস, তাই কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে তাকায় আবার আমার দিকে। যেন নীরব চোখের ভাষায় বলতে চায়—এই যে খাচ্ছি আমরা, আপনার সম্মতি আছে তো? আছে।—আমি হাত তুলে জানান দিলাম। তখন আর একদফা উল্লাসের ঘটা। নতুন করে আরো একবার হুল্লোড়। বলব কী, সে যা চটপট কাজ ওদের! ছুরি নেই, কাটারি নেই, শুধু কাঠের এক টুকরা ধারাল খন্তার মতো, তাই দিয়ে চোখের নিমেষে ছাড়িয়ে ফেলল পুরো ছাল। খানিকটা মাংস কেটে আমাদের দেবে বলে ইশারা করল। আমরা না করলাম। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বললাম, বরং ছালটা কি পাওয়া যেতে পারে? ওরা তো তাতে আরো খুশি। যেন কৃতার্থ। অমনি চটপট ছাল দিয়ে গেল আমাদের বজরায়। সঙ্গে আরো নানান ধরনের খাবার। তখন ইশারায় খালি জলের টিনটা উপুড় করে বললাম, একটু জল কি পাওয়া যেতে পারে? অমনি দুই মহিলাকে ডেকে কী যেন বলল। দেখি এক মুহূর্ত পরে তিনটে মাটির কলসিতে করে জল নিয়ে হাজির। রেখে চলে গেল। ব্যস, আমরাও নিশ্চিন্ত।

তবে আর না। এবার রওনা হতে হবে। বিদায় নিলাম নিগ্রো বন্ধুদের কাছ থেকে। আমাদের প্রচুর খাবার তখন মজুত। সঙ্গে দুই টিন জল। এতদিন পরে যাই হোক তবু মানুষের দেখা তো পেলাম। এটাও আমাদের কাছে বড় সান্ত্বনা। বলতে পারা যায় শক্তি। ভেসে পড়লাম ফের। ডাঙ্গার ধার ঘেঁষে টানা প্রায় এগারো দিন। সমুদ্র এখানে ভারি শান্ত। ডাইনে একটা দ্বীপ। আমি জানি এটাই ভার্দ অন্তরীপ অঞ্চল। অজস্র দ্বীপ এখানে মালার মতো চারধারে ছড়ানো ছিটানো। দ্বীপগুলোকে বলে ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ। তবে দূর অনেকখানি। একদম কাছে মনে হয় যেটা, সেটাও প্রায় ডাঙা থেকে চার পাঁচ ক্রোশের মতো। যাওয়ার ভারি ইচ্ছে হলো। কিন্তু নিরুপায়। হাওয়ার বিপরীত মুখে চলতে গেলে জানি না কখন পারব পৌঁছুতে। তদুপরি ডাঙা থেকে মাইলখানেক দূরে কখন ঝড় ওঠে, তুফান ছোটে—তাই বা কে বলতে পারে!

কী করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। নিঃশব্দে কেবিনে গিয়ে বসলাম। তোলপাড় খাচ্ছে একের পর এক ভাবনা। জুরির হাতে হাল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল,—কর্তা,

দেখুন একটা জাহাজ! উল্লাসের চিৎকার নয়, ভয়ের। বলা যায় আর্তনাদ। ভেবেছে বুঝি সর্দার লোক পাঠিয়ে দিয়েছে জাহাজে করে, আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি অমনি এক লাফে বাইরে এলাম। দেখি জাহাজই বটে, পর্তুগিজদের। গিনির দিকে যাচ্ছে বলে প্রথমটা মনে হলো। পরে বুঝলাম অনুমান ভুল। অন্য কোথাও চলেছে। গিনির দিকে হলে অমন মাঝ দরিয়া দিয়ে যেত না, বরং কূলের খানিকটা কাছ ঘেঁষেই চলত।

মনে আশার উন্মাদনা অথচ নিরুপায়। ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। কথা বলব ভারি ইচ্ছে, কিন্তু সম্ভব নয়। শুনতে পাবে না এতদূর থেকে আমার ডাক। যদি সব পাল তুলে দিই, তাহলেও পারব না জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছতে। তার আগেই ওরা আরো অনেক দূর চলে যাবে। কী করি এখন, কী উপায়! তখন মরিয়ার মতো বজরার উপরে উঠে নানারকম ইশারা করতে লাগলাম। তাতে কাজ হলো। দুরবিন দিয়ে দেখতে পেলো আমাকে। তখন বেগ কমাল। স্থির প্রায় তখন সমুদ্রের উপর। যেন ভাসমান ছবি। আমি উপর মুখ করে বন্দুক ছুড়ে জানান দিলাম আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি। পরে শুনেছি ওদের মুখে, বন্দুকের আওয়াজ নাকি শুনতে পায় নি। ধোঁয়া দেখেছে। আর নৌকা দেখে ভেবেছিল ইউরোপের কোনো মাঝি। হয়তো জাহাজের সঙ্গেই ছিলাম। যেকোনো কারণে জাহাজ থেকে নেমে পথ হারিয়ে ফেলি।

সে যাই হোক, দু'জনে সমানে দাঁড় বেয়ে পৌঁছলাম যখন জাহাজের কাছে, তখন আমাদের কাহিল অবস্থা। তিনটি ঘণ্টা লেগেছে প্রায় আসতে। কাহিল হলেও মনে আশার আলো। যাক, এতদিন পরে ফেরার তো একটা উপায় হলো।

আমাকে জিজ্ঞেস করল কে আমি, কী আমার পরিচয়। আমি তো ছাই কিছুই বুঝি না। বেশির ভাগ নাবিক জানে পর্তুগিজ ভাষা, নয়ত ফরাসি, নয় স্পেন দেশের। ইংরেজি যে বোঝে না কেউ। শেষে নিয়ে এল স্কটল্যান্ডের এক নাবিককে। ভাগ্যিস ছিল সে তাই বাঁচোয়া। বললাম সব। কেমন করে দু বছর পর পালিয়েছি, প্রভুর গৃহে কী কী আমাকে করতে হতো, কী সেই প্রভুর প্রকৃত পরিচয়—কিছুই বাদ দিলাম না। শুনে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আমাকে জাহাজে তুলে নিল।

সে যা খুশি আমার! যা আনন্দ! বলতে গেলে অসীম দুর্দশার হাত থেকে অব্যাহতি। মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসা। আনন্দের চোটে কী করব ভেবে পাই না। তখন কাপ্তেনকে বললাম, আমাদর বজরায় যা যা আছে সব আপনি নিয়ে নিন। আমার আর কিছুই চাই না। শুধু মুক্তি চাই। শুনে ভারি মিষ্টি করে বললেন, তার কোনো কিছুরই দরকার নেই। সব রইল বজরায়। বজরা জাহাজের সাথে বেঁধে নেওয়া হলো ব্রাজিলে পৌঁছে সব আবার আমাকে দিয়ে দেবেন। বললেন, দেখ, তোমাকে যে রক্ষা করেছি তার পেছনে কোনো মতলব বা দুরভিসন্ধি নেই। এটা মানুষেরই কাজ। আগামী দিনে বলা যায় না হয়তো আমারো এই দুর্দশা হতে পারে। তখন তুমি আমাকে রক্ষা করবে। ব্যস সব শোধ। আমি তবু নাছোড়বান্দা,—না, না, তা হয় না, অন্তত যা আছে আমাদের তার কিছুটা নিন। বললেন, সেটাও হবে অবিবেচনার কাজ। আমি তোমাদের নামিয়ে দেব ব্রাজিলে। কিন্তু তারপর? আরো তো অনেকখানি যেতে হবে তোমাদের। সে সময় রসদ কোথায় পাবে? বরং যা আছে সব বিক্রী করলে বিস্তর টাকা রোজগার হবে। তাই নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেও। এই আমি মনেপ্রাণে চাই।

বলব কী, সে যেন দয়ার পরাকাষ্ঠা। যেন মূর্তিমান প্রেম ভালোবাসা আর ত্যাগের আশ্চর্য এক সমন্বয়। দূরদর্শিতাও খুব। যদি পাছে অন্য কোনো নাবিক আমাদের জিনিস

চুরি করে নেয়! পড়ে থাকবে বজরায়—সবার তো সব সময় খেয়াল থাকবে না। তখন সব কিছু জাহাজে তুলে কী কী আছে তার একটা তালিকা বানালেন। দু দফা। একটা আমাকে দিলেন আরেকটা নিজের কাছে রাখলেন। মালপত্র সব রাখা হলো জাহাজের গুদাম ঘরে। সে ভীষণ সুব্যবস্থা। বললেন, এই তালিকা মিলিয়ে সব জিনিস তুমি ব্রাজিলে গিয়ে ফেরত পাবে। এটা যত্ন করে রেখ। তালিকায় আমাদের সেই যে তিনটি মাটির কলসি পেয়েছিলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে, দেখি তারও উল্লেখ আছে।

বজরার ব্যাপারে আমাকে বললেন, এক কাজ কর ওটা আমাকে বিক্রী করে দাও। আমার জাহাজের কাজে লাগবে। কত দাম নেবে? কী বলব দাম! এমন সদাশয় মানুষ, এত দয়া, এত উপকার করছেন আমাদের আমি কি পারি তার কাছে থেকে লাভ করতে বা কোনো মস্ত একটা দাম হাঁকতে। বললাম, আমি কিছু জানি না। আপনার যা ইচ্ছে হয় আমাকে দেবেন। চাই কি এমনিও নিয়ে নিতে পারেন। বললেন, না না, তা হয় না। দাম তোমাকে নিতেই হবে। বলে একখানা হুন্ডি লিখে দিলেন। ব্রাজিলের অফিসে সেটা দেখালে আমাকে ছয় শ' চল্লিশ তঙ্কা দেবে। বললেন, এর চেয়ে যদি বেশি দাম কেউ দিতে চায়, তবে চিন্তা নেই, সেটাও তিনি আমাকে ব্রাজিলে পৌঁছে উশুল করে দেবেন। জুরির জন্যেও দাম ধরে দিলেন চারশ আশি তঙ্কা। এটা নিতে হাত আমার মোটে উঠতে চায় না। আমার সঙ্গী, আমার দুঃসময়ের সাথী। তাকে কিনা টাকার বিনিময়ে বেচে দেব! ক্রীতদাসত্বের ভাগীদার করব! বললেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই। সে অর্থে ক্রীতদাস আমি ওকে করব না। খাটবে জাহাজে কাজ করবে তার বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। সে-ও মোটে দশ বছরের জন্যে। তার মধ্যে যদি ও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে, তবে ওর মুক্তির কোনো বাধাই থাকবে না। জুরিকে জিজ্ঞেস করতে বলল সে রাজি। এই শর্তে তার কোনো আপত্তি নেই। তখন জুরিকে তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

নির্বিঘ্নেই পৌঁছলাম ব্রাজিলে। জায়গাটার নাম সালভাদোর। বাইশ দিন মোট লাগল সময়। হিসেব নিকেশ চোকানো হলো। সবই ভালো। শুধু আমার তরফে একটাই চিন্তা। ফের ভাগ্যের হাতে পড়লাম আমি। জানি না আগামী দিনে ভাগ্য টেনে নিয়ে যাবে আমাকে কোথায়।

ভুলব না কাপ্তেনের কথা। আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এমন দয়া এমন পরোপকার আমি জীবনে দেখি নি। বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এক আধলা নিলেন না আমরা কাছ থেকে ভাড়া বাবদ। উল্টে দিলেন আরো অঢেল। চিতাবাঘের ছালটার জন্যে দিলেন বিশ তঙ্কা, আর সিংহের ছালের জন্যে চল্লিশ। বজরার প্রতিটি জিনিস আমি তালিকা মিলিয়ে ফেরত পেলাম। বললেন, বল এবার, যা আছে তোমার তার মধ্যে কী কী জিনিস তুমি বেচতে চাও। সব আমি কিনে নেব। তখন দুটো বন্দুক, সেই মোম, শিশি বোতল সব মিলিয়ে দাম দিলেন মোট সতেরোশ ষাট তঙ্কা। আমিও ঝামেলা থেকে মুক্ত। হৃদয়ের আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তা আমি তো বাসিন্দা নই এখানকার, সবাই তাই আমাকে চেনেও না। একখানা পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন সেই সদাশয় কাপ্তেন। তারই জোরে সজ্জন এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হলাম। অমায়িক এবং এক কথায় ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়। ছোট ব্যবসা। একই সাথে আখের চাষ আর আখ থেকে চিনি তৈরির কারবার। আমাকে প্রথম দিকে তার বাড়িতেই ঠাঁই দিলেন। শিখলাম সব। কেমন করে চাষ করতে হয়, কেমন করে চিনি তৈরি করে, কী তার কৌশল—সমস্ত কিছু। ব্যবসা হিসেবে চমৎকার। খুব ছোট থেকে আরম্ভ

করে অনেকেই এখন বিরাট ধনী হয়ে গেছে। ঠিক করলাম, আমিও এই ব্যবসা শুরু করব। তখন সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। এমনকি জমি কেনা থেকে কল কিনে দেওয়া অব্দি। টাকা আমিই দিলাম। আরো টাকার দরকার। কেননা কল চালু হলে অনেক টাকা হাতে মজুত রাখতে হবে। আমার তো সেই বন্ধুর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত আছে তিনশ পাউন্ড। ভাবলাম, এক কাজ করি। এই সুযোগে তার কাছে আমার প্রাপ্য টাকা চেয়ে পাঠাই।

আমার পাশেই যার জমি, সে পর্তুগিজ। লিসবনের লোক। আমারই মতো ভাগ্যতাড়িত অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছেছে। বাবা মা কিন্তু ইংরেজ। নাম ওয়েল্‌স। ভারি খাতির জমে গেল তার সাথে। দু'জনে দু'জনকে ডাকতাম মিতা বলে। তা দু'জনেরই আমাদের পুঁজি কম। কী আর করি, জমি তো শুধু শুধু ফেলে রাখা যায় না। খাদ্য শস্যের চাষ করতাম। একবার তামাকও বুনলাম। ক্ষতি তো কিছু নেই। বরং যা দুচার পয়সা আসে সেটাই লাভ। মন্দ হলো না ফলন। অর্থাৎ চাষের উপযোগী জমি এতদিনে প্রস্তুত। এবার দেদার আখ ফলবে, সবাই বলল, কিন্তু পারি কি একলা অতখানি জমিতে একা হাতে চাষ করতে! একজন কেউ সাহায্যের লোক থাকা দরকার। তখন জুরির কথা ভেবে আফশোস হলো খুব। ইস যদি জুরি থাকত এখন আমার কাছে!

ফলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা যাকে বলে সেই টানা হ্যাঁচড়া, সেই গতির নামে দুর্গতি। আমার ভাগ্যটাই যে এই রকম। খুব একটা বেশি হবে কী করে! সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছি অজানার ডাকে। বাবার আদেশে কান দিই নি। বারবার বলেছিলেন বাবা, দেখরে ঘরে থাক। এখানেই যা হবার হবে। শুনি নি সে নির্দেশ। কিন্তু এখানে এসেই বা অন্য কী পেলাম। সেই তো মধ্যবিত্তের জীবন। সেই না উঁচু নিচু মাঝখানের অবস্থা। তবে কেন মরতে এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে রয়ে গেলাম।

অর্থাৎ দুঃখ যাকে বলে। নিজের অবস্থা নিয়ে নিজেরই মনে হাহাকার। আর যাতনা। ভালো লাগে না একদম। কাউকে বোঝাতে পারি না নিজের মনের কথা। শুধু মিতার সঙ্গে যা একটু গল্পসল্প হয়। তা তারও তো একই হাল। এ যেন নির্জন কোনো দ্বীপে বাস করার সামিল। বুদ্ধি যে দেবে এমন মানুষেরও যেন অনটন। মোটমাট সুখী নই আমি আমার অবস্থানে। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো জীবনটা আমার এই ভাবেই চলবে। সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য হয়তো কোনোদিনই আসবে না।

এরই মধ্যে সান্ত্বনা এই, আমার সেই সদাশয় কাপ্তেন বন্ধুটি আবার সমুদ্র যাত্রায় যাবেন। এবারের গন্তব্যস্থল লন্ডন। তিনমাস ধরে চলছে তারই প্রস্তুতি। জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। একদিন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, তুমি আমাকে বরং একখানা চিঠি লিখে দাও। বলেছিলে, কার কাছে যেন টাকা রাখা আছে তোমার। আমি চিঠি দেখিয়ে টাকা নিয়ে আসব। ব্যবসায় লাগালে আরো লাভ পাবে। তবে নগদে এনে তো লাভ নেই। এখানে চলে না সে টাকা। বরং কিছু মালপত্র কিনে আনব। সেগুলো এখানে বিক্রী করে তুমি নগদ পাবে, পুরোটা আনব না। লিখে দাও একশ' পাউন্ড। কেননা বলা যায় না, সমুদ্রের খেয়াল, আসার পথে হয়তো আমার জাহাজডুবি হলো। সে অবস্থায় তিনশ'র মধ্যে একশ' তোমার নষ্ট হবে। বাকি দুশ' তো থাকবে। সেটা পরে অন্য কাউকে দিয়ে তুমি আনিয়ে নিতে পারবে।

সদাশয় মানুষ বলেই এত চমৎকার পরামর্শ দিলেন। আপত্তি করার কী থাকতে পারে! লিখে দিলাম চিঠি। একশ পাউন্ড দেবার কথা বলে দিলাম কাপ্তেনের হাতে। সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধেও অনেক কিছু লিখে পাঠালাম।

সব। আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ, দস্যুদলের আক্রমণ, আমার বন্দিদশা, দাসত্ব, সেখান থেকে পলায়ন, পর্তুগিজ জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয়, তার দয়া, আমার বর্তমান অবস্থা—কোনো কিছুই বাদ দিলাম না। লিখলাম কেন আমার টাকার দরকার। তা লিসবন থেকে যখন ফিরে এলেন কাপ্তেন, দেখি সঙ্গে নানান উপহার, আর একশ পাউন্ড দিয়ে কেনা নানান সামগ্রী। চাষের কাজের জন্যে বিস্তর যন্ত্রপাতিও এনেছেন। সেগুলো আমার খুব কাজে লাগবে। বাড়তি কিছু টাকাও দিলেন হাতে। বললেন, কাজের লোকের তো খুব দরকার তোমার। এই টাকা দিয়ে কাজের লোক রেখ। ছ বছরের চুক্তিতে মজুর পাওয়া যাবে এই টাকায়। বাড়তি দাবির মধ্যে শুধু তামাকের নেশা। সেটা ক্ষেতের তামাক দিয়েই পূরণ হবে। এদিকে জিনিসপত্র বিক্রী করেও ভালো টাকা পেলাম। সবই ইংল্যান্ডের তৈরি। এদেশে তার ভালো বাজার। তার মধ্যে আছে কাপড়, নিত্য ব্যবহার্য টুকটাকি জিনিস, বাসনপত্র আরো অনেক কিছু। ভালোই আমদানি হলো বিক্রী করে। প্রায় চারগুণের মতো লাভ। মিতার চেয়ে অবস্থা আমার এখন দস্তুর মতো ভালো। নিগ্রো দাস নিলাম একজন। আমার কাজে সহায়তা করার জন্যে। আর একজন ইয়োরোপীয় ভৃত্য। মোটের উপর সব দিক থেকে আমি এখন নিশ্চিন্তই বলা চলে।

তবে ঐ যে বলে না—অনেক ভালোও ভালো নয়, তাই হলো আমার শেষ অব্দি। পরের বছর খুব ভালো চাষ হলো। যেমন আখ, তেমন তামাক। তামাকের ইট তুলে দিলাম জাহাজে। বিনিময়ে দিল টাকা। আমার তখন খুশি আর ধরে না। নানান পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়। নতুন করে উৎসাহ পাই। আর কেবল মন ফের কোনো সমুদ্রে ভেসে পড়ার জন্যে ছটফট করে ওঠে।

সব নষ্টের মূলে আমার এই অস্থিরমতিত্ব। থিতু হয়ে যে থাকতে পারি না কোনো জায়গায়। কোনো কিছুই দীর্ঘদিন ভালো লাগে না। এ যেন জ্বালা বিশেষ। এই তো দেখুন না, ব্যবসায় লাভ হয়েছে প্রচুর, মোটামুটি দু'জন কাজের লোক, জমিজমা নিয়ে সুখেই আছি, আরো সুখ আসবে আগামী দিনে। আমি যদি লেগে থাকি তবে। কিন্তু ঐ যে চঞ্চলতা। ঐ যে ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি নিজেই আমার যাবতীয় দুর্ভাগ্যের নিয়ন্তা। ভুলের পর ভুল কেবল করেই চলি। শেষ আর হয় না। দুঃখ তাতে দ্বিগুণ হয়। কষ্ট তাতে বাড়ে। আমি নির্বিকার। হয়তো শুনে আপনারা বলবেন বোকামি। এভাবে অনির্দেশ সমুদ্রযাত্রায় ভেসে পড়াটা কোনো বুদ্ধিমান মানুষেরই কাজ নয়। জানি না কাজ কি অকাজ। তবু ঘরে বসে থাকতে মন চায় না মোটে। ঘরে বসে নিজের ভালো করতে ইচ্ছে হয় না। দুনিয়াটাকে দেখব এটাই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। আমি মনে করি আমার জীবদ্দশায় এই আমার অন্যতম কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

মোটমাট তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করেছে আমাকে সেই পুরানো ইচ্ছা। বাবা মাকে ত্যাগ করে চলে এসেছি যে ইচ্ছার বলে। সুখী থাকতে আর মন চায় না। একটু একটু করে বড় হব ধনী হব, একটু একটু করে আমার ব্যবসা বাড়বে, এতে আমি তৃপ্ত নই। আমি চাই চটপট নিজের ভাগ্য ফেরাতে। তার জন্যে অভিযানে যেতে চাই। তাতে ঝুঁকি অনেক, দুঃখ বিস্তর আমি জানি। তবু বেপরোয়া আমার মন। কোনো দুঃখ বরণ করতেই আমি পিছপা নই।

প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলে নেই।

...তখন তো এই সব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত বা বিক্রির প্রয়োজন হবে

ব্রাজিলে কাটল আমার টানা চার বছর। মোটের উপর ভালোই চলছে আমার চাষের কাজ। ভাষাটা এতদিনে বেশ রপ্ত হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে বিস্তর মানুষের সঙ্গে। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী বন্ধুও আছে। তারা মূলত সালভাদোরের বাসিন্দা। বন্দর তো। মাল চালান দেবার প্রয়োজনে আমাকে প্রায় তাই যাতায়ত করতে হয়। খোশ গল্পের আসর বসে। বলি আমার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। সুলভে স্বর্ণরেণু আনার গল্পও বলি। তাছাড়া আরো যে সব ব্যবসা চলে গিনিতে ছুরি, কাঁচি, খেলনা, পুঁতি কুড়ুল—তারও বিবরণ দিই। বিনিময়ে মেলে গজদন্ত প্রভৃতি নানান মূল্যবান সামগ্রী। তাছাড়া নিগ্রোও ধরে আনা যায়। ব্যবসা হিসেবে সেটাও কিছু মন্দ নয়।

সকলে খুবই মন দিয়ে শোনে আমার কথা। আগ্রহ দেখি প্রচণ্ড। তবে নিগ্রো আনার ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু আপত্তি করে। এখনো রাজার স্বীকৃতি মেলে নি এ ব্যাপারে। স্পেন বা পর্তুগালে এখনো এ ব্যবসা রমরমা নয়। তবু নিয়ে আসে কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনে। অথবা বিক্রী করলেও তাকে প্রয়োজন বলে দেখায়। মোটমাট এভাবেই চোরাগোপ্তা পথে মানুষ বিক্রীর ব্যবসা চলে।

একদিন সকালে দেখি তিন ব্যবসাদার আমার বাড়িতে এসে হাজির। মাত্র তার আগের দিনই এক ভোজের আসরে তিন জনকে শুনিয়েছি আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ। নিগ্রো প্রসঙ্গও সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে এসেছে। তো বলে, আপনার সঙ্গে গোপন কথা আছে। বললাম, কী কথা? বলল, ঐ ব্যবসা প্রসঙ্গেই আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। সারারাত ধরে ভেবেছি আমরা তিন জন। এই যে এত বড় বড় ক্ষেত আমাদের, তাতে পারি না একা হাতে চাষবাস করতে। পরে থাকে অঢেল জমি। অনেকটা আপনারই মতো। এ অবস্থায় যদি কাজের প্রয়োজনে কিছু নিগ্রো আমরা নিয়ে আসি গিনি থেকে? আপনার কী মত? ভালো জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কেনাকাটার যাবতীয় দায়িত্ব আপনার। না না, টাকা আপনার লাগবে না, সব আমাদের। শুধু বুদ্ধি আপনার। আর কাজ হাসিল। বিনিময়ে আপনিও কিছু নিগ্রো পাবেন। এটা আপনার দস্তুরি।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থাটাও একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই তো ক্ষেত খামার সাজিয়ে বসেছি এখন—লাভ তো খুব একটা কম নয়, বরং ভালোই। বলা যায় জীবনে আমি এখন প্রতিষ্ঠিত। একশ পাউন্ড আনিয়েছিলাম ইংল্যান্ড থেকে, বাড়তে বাড়তে তাই এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার হাজার পাউন্ডে। আমার তাবৎ সম্পত্তির এটাই এখন দাম। আরো বাড়বে ভবিষ্যতে। ব্যবসা আরো বড় হবে। সে অবস্থায় এর একটা সঙ্গতি না করে আমি নড়ি কীভাবে এখান থেকে। সেটা কি আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব?

অন্য কেউ হলে হয়তো এই অজুহাত তুলে যেত না। এখানেই থাকত। কালে দিনে আরো ধনী হতো। একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলতো নিজের সম্পদ। কিন্তু আমি মানুষটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিজেই আমি নিজের সংহার কর্তা। তদুপরি অজানার নেশা তো আছেই। বললাম, যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আমার অনুপস্থিতিতে এই ক্ষেত-খামার জমি-জমা দেখাশোনার সু-বন্দোবস্ত করতে হবে। বলল, সেটা তারা করবে। তখন বললাম, কিন্তু আমি যদি আর না ফিরি। তখন এইসব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত বা বিক্রীর প্রয়োজন হবে। বলা যায় না, মারাও যেতে পারি। সে অবস্থায় দলিল করে দিয়ে যেতে চাই। বলল, ঠিক আছে, আপনার খুশিমতো তাহলে দলিল করুন। তখন লিখলাম, আমার অনুপস্থিতিতে যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবে আমার সেই রক্ষাকর্তা কাপ্তেন এবং জমি বিলি, বন্দোবস্ত, বিক্রী চাষাবাদ ইত্যাদি যেকোনো ব্যাপারে ঠিক আমার যা অধিকার, তারও তাই থাকবে। তার উপর নির্দেশ থাকবে সব বিক্রী করে দেবার এবং তা থেকে যা অর্থাগম হবে তার অর্ধেক নিজে রেখে বাকি অর্ধেক ইংল্যান্ডে বাবা মার কাছে নিচের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।

বলে বাবা মার নাম ঠিকানা দিয়ে সই করে দলিল শেষ করলাম।

মোটমাট, সম্পত্তির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমি নিয়েছি। আমি জানি না, অন্য কেউ হলে এই লাভের ব্যবসা ছেড়ে অজানা অনিশ্চিতের ডাকে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত কিনা। আমার ক্ষেত্রে সব ব্যাপারটাই অন্যরকম। আমি তো আর সুখে থাকব বলে জন্মাই নি। দুর্ভাগ্য আমার নিত্য সহচর। দেখা যাক, কোথায় কতদূরে কোন অনিশ্চিতের পানে ভাগ্য টেনে নিয়ে যায় আমাকে।

এখানে যুক্তি তুচ্ছ, ভাবনাটাই আসল। অর্থাৎ আমার কল্পনা। এদিকে জাহাজও তৈরি। ষোলোশ উনষাট সালের পহেলা সেপ্টেম্বর উঠে বসলাম জাহাজে। দিনটা ভালো নয়। অন্তত আমার কাছে। এই দিনই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে ছিলাম আমি হুলু থেকে। বাবা মায়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। ঠিক আট বছর আগে সেটা। ফের চলেছি নতুন এক জাহাজে। তারিখ ছাড়া আর সব কিছুই আলাদা। দেখা যাক, এর শেষ কোথায় হয়।

একশ কুড়ি টনের মালবাহী জাহাজ। সঙ্গে ছয়টা বন্দুক, চোদ্দ জন নাবিক, সারেং, আমি আর সারেঙের ছোট ছেলে। মালপত্র বিশেষ নেই। শুধু কিছু খেলনা সামগ্রী—পুঁতি, মালা, কাচের চুমকি, শামুকের খোলা, দুরবিন, ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল—যা আর কি চলে ওখানে, নিগ্রোরা কেনে, বিনিময়ে অনেক দামী দামী জিনিস হাতে তুলে দেয়।

পাল তুলে প্রথম দিনই রওনা হলাম। এটা বিধি নয়। দু একদিন অপেক্ষা করে তারপর ভেসে পড়ার প্রথা। সে প্রথা এখানে অগ্রাহ্য হলো। চলল জাহাজ উত্তরমুখে। সামনে আফ্রিকা উপকূলের ম্যাপ খোলা। আমরা চলেছি দশ থেকে বারো ডিগ্রী দ্রাঘিমা বরাবর। এভাবেই যায় সবাই। আবাহাওয়া অত্যন্ত চমৎকার। গরমটা একটু বেশি।

অগস্তিনো অন্তরীপ অব্দি বলতে গেলে কূলের কাছ ঘেঁষেই গেলাম, তারপর থেকে দূরত্ব বাড়তে লাগল। এবার যাব উত্তর পূর্ব দিকে। অর্থাৎ পথে পড়বে নোরোন্‌হার দ্বীপের সার। পড়লও তাই। দ্বীপ রইল পূর্বদিকে, বারো দিন লাগল মোট সেই এলাকা পার হতে। সোয়া সাত ডিগ্রী কোনাকুনি উত্তর মুখে এগোতে লাগলাম। তখন উঠল তুফান। টর্নেডো যাকে বলে। সে যা বাতাস, হাওয়ার যা চোট। বারোটা দিন আমাদের আর নিজস্ব কিছু করণীয় নেই, শুধু হাওয়ার বুকে তুফানের ঝাপটে অনির্দেশ ভেসে যাওয়া। কোথায় চলেছি কে জানে। পাগলা হাতির দাপট যে রকম। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি মৃত্যু হয় আমাদের, জাহাজ বুঝি ডুবে যায়। সমুদ্র গ্রাস করে নেবে সব কিছু। অসহায় বলতে ঠিক যা বোঝায় আমরা তাই। আমাদের জীবন মরণ এখন ঝোড়ো বাতাসের হাতে।

কিছু অঘটনও ঘটে গেল এই বারো দিনে। একজন নাবিক মারা গেল সমুদ্রপীড়ায়। সারেঙের ছেলে আর অন্য এক নাবিককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঢেউ। বারো দিনের দিন ঝড় শান্ত হতে দেখি, আমরা এগারো ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমা বরাবর কোনো স্থানে অবস্থান করছি। অগস্তিনো অন্তরীপ থেকে সেটা প্রায় বাইশ ডিগ্রী অক্ষাংশের তফাৎ। বরং একদিক থেকে মঙ্গলই বলতে হবে। কেননা এরই কাছাকাছি আমাদের গন্তব্যস্থল। ব্রাজিলের উত্তরাংশ সেটা। কিছু দূরে আমাজন নদী। গিনির উপকূল ভাগ। ওরোনক নদী আমাদের সামনে। এরা বলে মহানদী। সারেং বললেন, বলুন এখন কী করব। কোনদিকে যাব এবার? বেশি পথ যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব না সেটা আমি জানি। কেননা জাহাজ ফুটো। ভাঙচুর হয়েছে বিস্তর। এ অবস্থায় কূলের ধার ঘেঁষে এগোনো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এটা সারেঙেরই প্রস্তাব। আমি বিরোধিতা করলাম। সামনে তখন আমেরিকার উপকূল ভাগের মানচিত্র পাতা। বললাম, এগিয়ে কোন দিকে যাব আমরা? এ অঞ্চলে কি জনবসতি আছে? ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অব্দি যেতে হবে তাহলে আমাদের। মানুষের মুখ প্রথম সেখানেই নজরে পড়বে। বরং বার্বাডোজ এখান থেকে কাছে, সে দিকে যাওয়াই মঙ্গল। মেক্সিকো উপসাগর এলাকায় পড়লে মস্ত অসুবিধে। জলের ভারি তোড়। জবরদস্তি ঢুকিয়ে নেবে ভিতরে। সে অবস্থায় আমরা অসুবিধেয় পড়ব।

মোটমাট যেখানেই যেতে চাই, অন্তত পনেরো দিনের পথ। এই পনেরোটা দিন কারো সহায়তা ছাড়া আমরা চলতে পারব না। দু'জন নাবিক মারা গেছে। সেই দু'জনের ঘাটতি পূরণ অবিলম্বে প্রয়োজন। তদুপরি জাহাজ সারাই করারও দরকার আছে।

সেই প্রস্তাবই গ্রাহ্য হলো। উত্তর পশ্চিম দিকে চলল আমাদের জাহাজ। পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে। ইংল্যান্ড দ্বীপমালার দিকে এখন আমাদের মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর যেকোনো একটা দ্বীপে পৌঁছলে আমরা সংকট থেকে ত্রাণ পাব। কিন্তু সমুদ্রে কি আর মানুষের বিশ্বাস কাজ করে। সবই তো অজানা অনির্দেশের খেলা। কখন ওঠে তুফান কখন ওঠে ঝড় কেউ বলতে পারে না আগে। হলো তাই। আমরা তখন সোয়া বারো ডিগ্রী দ্রাঘিমা বরাবর। হঠাৎ শুরু হলো তুফান। ফের সেই দুর্দশা। নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সবই ঝড়ের উপর নির্ভর। জনবসতি এলাকা পার হয়ে চলেছি তীব্র গতিতে। ঘুরপাক খাচ্ছে জাহাজ। কে জানে হয়তো ভিড়ব গিয়ে কোনো এক অজানা দ্বীপে, সেখানে বর্বর নরখাদক মানুষ। জ্যান্ত কেটে কেটে খাবে আমাদের মাংস। আর কি নিস্তার আছে।

তখন কে যেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—ডাঙ্গা, ডাঙ্গা! ঐ দেখ! বালিয়াড়ি। তাতে আটকে আছে আমাদের জাহাজ। কাত হয়ে আছে। তুফান তো তখনো চলছে সমানে।

আর ঢেউ। সেই অবস্থাতেই মস্ত এক ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের উপর। যেন গ্রাস করে নেবে সব কিছু। আর্তনাদ করে ভয়ে চোখ বুজলাম।

আমি ভাষায় সে অবস্থার কথা বোঝাতে পারব না। সেই অবস্থায় যে পড়ে নি, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। জানি না জীবন রক্ষা পাবে কী মারা যাব। জানি না এ কোন দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে কি থাকে না সেটাও অজ্ঞাত। জাহাজ যে চুরমার হয়ে যাবে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু করবারও কিছু নেই। স্থির ভাবে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই।

বাতাসের তোড় একটু কম। কিন্তু সংকট তাতে এতটুকু কমে নি। বালিতে মুখ গুজে পড়ে আছে জাহাজ। কী যে ভয়ানক সেই অবস্থা তা বর্ণনার অতীত। পারব কি এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে? জানি না। সহায় সম্বল বলতে আমাদের আর কোনো কিছুই নেই। ছিল জাহাজের সাথে বাঁধা একটা নৌকা, সে যে কখন কোথায় জলের তোড়ে ভেসে গেছে কি খান খান হয়ে ভেঙে গেছে বা তলিয়ে গেছে জলের নিচে, আমরা কিছুই জানি না। আরেকটা আছে জাহাজের ডেকে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু সেটা পাড়ব কি ভাবে, নামাবই বা কী করে? সবই যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এই ঢেউয়ের সঙ্গে আমরা কেমন করে যুঝব? জাহাজ তো যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কিনা তাই বা কে সঠিক করে বলতে পারে?

শেষ চেষ্টা করল সারেং। মাস্তুলে উঠে দড়ি খুলে দিল নৌকোর। বাকিরা হাতে হাতে নামিয়ে নিল। একজন টেনে ধরে রইল একদিক, বাকিরা উঠল নৌকায়। তারপর সেও উঠে গেল এক লাফে। মোট এগারো জন আমরা। অমনি জলের তোড়ে সাঁই সাঁই করে ছুটতে লেগেছে নৌকো। সে কী ঢেউ! উঁচু একেকটা এই এতোখানি। আছড়ে পড়ছে মুহুর্মুহু পাড়ে। আমরা সেই অশান্ত উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে মোচার খোলার মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু কতক্ষণ পারব এইভাবে চলতে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যেকোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে নৌকো। যেকোনো মুহূর্তে আমরা সলিল সমাধি প্রাপ্ত হতে পারি। নিস্তার যে নেই এটা অনিবার্য। কেননা এই প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাথায় সামান্য নৌকোর কোনো মূল্যই নেই। পাল গোটাবার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা নৌকোয় পাল নেই। আছে দাঁড়। প্রাণপণে বাইতে শুরু করেছি তাই। লক্ষ্য আমাদের কূল। কিন্তু কূলের কাছে পৌঁছলেই যে নিশ্চিন্ত সেটাই বা বলি কেমন করে। পৌঁছবা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে ঢেউ, আছড়ে পড়বে আমাদের নৌকোর উপর, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে চোখের নিমিষে। তখন উপায়! মৃত্যুকে তখন কি আর এড়ান যাবে? না এবং এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে আকুলভাবে ডাকা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দিলাম তাঁরই পদতলে। তারপর মরীয়ার মতো তিল তিল করে কূলের দিকে অথবা মৃত্যুর দিকে এগোতে লাগলাম।

কূল যে কেমন তাও কি ছাই জানি? অর্থাৎ পাহাড়, না পাথর, না মাটি, না বালি—সে তো এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। একটাই আশা এখন—যদি এইভাবে ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে কোনো উপসাগর কি নদীর মুখে গিয়ে হাজির হতে পারি। সে ক্ষেত্রে ঢেউ আমাদের যতটা খুশি সরিয়ে নিক। বাতাস যদি দিক ভুল করে—সেটা ক্ষতি নয়, বরং আমাদের পক্ষে মঙ্গল। একমাত্র পরিত্রাণের উপায় সেটাই। নদীর মুখে পড়লে

যেন তেন প্রকারে ঢুকে পড়ব নদীতে, এগিয়ে যাব তরতর করে। তরঙ্গ আর তুফানের ভয় থাকবে না ডাঙ্গাও পাব দুধারে। কিন্তু কোথায় সেই নদীর মুখ; এই যে চারপাশে তাকাই, দেখবার চেষ্টা করি—নজরে পড়ে না। শুধু ডাঙ্গাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ঢেউয়ের মাথায় যখন নৌকো আচমকা লাফ দিয়ে ওঠে উপরে। সেটাও ভয় জাগায়। প্রমাদ গুণি। এই ডাঙ্গার উপর ঢেউয়ের ঝাপটে আছড়ে পড়লে আমাদের আর নিস্তার নেই।

প্রায় দেড় ক্রোশ পথ এইভাবে টালমাটাল খেতে খেতে এগোলাম। সে বড় ভয়ঙ্কর। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ঢেউয়ের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে আমাদের লড়াই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এত মারমুখী ঢেউ। যা ধাক্কা তার, যা তোড়। গেল নৌকো চোখের নিমিষে উল্টে। পড়লাম জলে। কে যে কোথায় ছিটকে গেলাম জানি না। সে এমনই আকস্মিক শেষ মুহূর্তে একটু যে ঈশ্বরের নাম করব সে সুযোগটুকুও পেলাম না। মুহূর্তে আরেকটা ঢেউ এসে নিল আমাদের গ্রাস করে।

পাঠক ক্ষমা করবেন। ভাষায় সে অবস্থা আমি ব্যাখ্যা করতে অপারগ। জলের নিচে ডুবে আছি। চিন্তা গেছে তোলপাড় হয়ে। সাঁতারু হিসেবে আমি খুব একটা মন্দ নই। কিন্তু কী লাভ সেই মুহূর্তে সাঁতার জেনে। মৃত্যুর প্রহর গুণছি জলের নিচে। হঠাৎ আরেকটা ঢেউয়ের দোলায় ভেসে উঠলাম উপরে। দেখি পড়ে আছি ডাঙ্গায়। শুকনো খটখটে সে জায়গা। কিন্তু শরীরে তাগদ নেই মোটে। বেঁচে যে আছি এটাই বড় কথা। জল খেয়েছি অনেকখানি। বড় দুর্বল আর ক্লান্তি। তবু বাঁচবার ঐ যে এক অদম্য তাগিদ। উঠলাম ভূমিশয্যা ছেড়ে। এগিয়ে গেলাম। মনে ভয়। যদি আরেকটা ঢেউ এসে আমাকে সমুদ্রে ফেরৎ নিয়ে যায়।

গেল তাই। সে যা তোড়! পাহাড়ের মতো উঁচু সেই ঢেউ। ঝপাং করে এসে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি দম বন্ধ করে রইলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। বুক যে ফেটে যায়! তখন জল ঠেলে হাঁকুপাঁকু করে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলাম। বহুকষ্টে মাথাটা তুলতে পারলাম একটুখানি। মাত্র দু সেকেন্ড তার মেয়াদ। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেটাই অনেক। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ফের বন্ধ করলাম দম। ততক্ষণে ফেরত এসে গেছি ডাঙ্গায়। যাক, কিছুক্ষণের জন্যে তো শান্তি!

কিছুক্ষণ এই জন্যে বললাম কেননা এই স্বল্প সময়ে আমি যে পালাব ঢেউয়ের কবল থেকে ত্রাণ পেতে নিরাপদ কোনো দূরত্বে, সে শক্তি আমার নেই। বড় দুর্বল শরীর। তার উপর মুহুর্মুহু ঢেউ। পারি কি আমি তার নাগাল থেকে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে? এই তো আরেকটা। আবার সেই তোড়। জলে ডুবে ফের আমার দমবন্ধ। ফের বহুকষ্টে মাথা তোলা। প্রাণপণ চলছে লড়াই। তখন দেখি পায়ের নিচে মাটি। ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ফের কূলে। যাক, এ-যাত্রাও বাঁচোয়া।

এইভাবে আরো একবার। কিন্তু না, আর নয়। এবার যেকোনো উপায়ে নিজেকে রক্ষা করতেই হবে। আছড়ে ফেলেছে এবার বালির উপর। একটু বেসামালে পড়লে জানি না আমি আর এ কাহিনী লিখতে পারতাম কিনা। জল সরে গেলে দেখি একটা পাথর। বুকে ভীষণ চোট। ডান দিকটা যেন পুরোপুরি অসাড়। ঝিমঝিম করছে মাথা। এ অবস্থায় ফের যদি আসে ঢেউ, আমার আর রক্ষা নেই। তখন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম পাথর। শরীরে যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে। একটু পরই ঢেউ এল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখি এবার আর

আগের মতো তোড় নেই। একটু যেন শান্ত। তবু মরীয়ার মতো ঢেউ সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি কি মরি করে অনেকখানি ছুটলাম। ঢেউ আসছে আবার। ফের শুয়ে চেপে ধরলাম আরেকটা পাথর। আমার পা ভিজিয়ে চলে গেল গজরাতে গজরাতে। তখন উঠে ফের ছুটলাম একটুখানি। দেখি ডাঙ্গা। আহ শান্তি! ঘাসের উপর বসে পড়লাম। ঘুম পাচ্ছে খুব। এখন আর ঢেউ আমার কিছু করতে পারবে না। আমি নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে পেরেছি।

এ এক অদ্ভুত রহস্য বলা যায়। একটু আগে জীবন আমার বিপন্ন। বাঁচব কি বাঁচব না এটাই তখন একমাত্র প্রশ্ন। আর একটু পরে, এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেউ পারবে না আমার এতটুকু ক্ষতি কি অমঙ্গল করতে। সমুদ্র এখন যতই গর্জাক, যত তোলপাড় করুক, আমার আর ভয় নেই। আমি কোনো কিছুতেই আর ডরাই না।

হাঁটলাম খানিকক্ষণ। কখনো দুহাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কখনো বা বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে। সে নানান ভঙ্গি আমার। শরীরের নানান বিভঙ্গ। হু-হু করছে মন। আর কেউ বেঁচে নেই আমার সহযাত্রীদের মধ্যে। ডুবে গেছে সকলে। শুধু একা আমি জীবিত। জাহাজটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ঐ তো জাহাজ। মুখ গুজে পড়ে আছে বালির উপর, পিছনে বিশাল সমুদ্রের দৃশ্যসজ্জা। তারই পটভূমিকায় লাগছে যেন নিশ্চল নির্বাক কোনো ছবির মতো। আর অবাক কাণ্ড। কীভাবে যে পারলাম আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে! কিছুতেই হিসেবটা মেলাতে পারছি না।

ভেবে আর কিছু লাভ নেই। আমি যে সম্পূর্ণ একা এটা ঘটনা। বন্ধু নেই, সাথী নেই, পরিচিত কেউ নেই ... কিন্তু এই যে এখানে এসে ভিড়লাম, এটাই বা কেমন জায়গা! ঘুরে ঘুরে একবার তো দেখা দরকার। তখন ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে নজর ফেললাম। সবশেষে নজর পড়ল নিজের উপর। একি, আমি তো সম্পূর্ণ ভেজা। পোশাক ছেড়ে ফেলার কথা প্রথমেই মনে হলো। কিন্তু ছাড়ব যে, পরার মতো আছেটা কী? তবে থাক, ছাড়ার দরকার নেই। কিছু খাই বরং। ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু কী খাব? খাবার এখানে কোথায়? তেষ্টা মেটাব তেমন একটু জলেরই বা নাগাল কোথায় পাই? সে ভারি দুঃসহ অবস্থা। একটু একটু করে নিঃসঙ্গতা আমাকে গ্রাস করছে। আমি যে সম্পূর্ণ একা এটা টের পাচ্ছি। কিন্তু উপায়? মানুষ যখন নেই সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে হিংস্র জানোয়ার। একটু পরে অতর্কিতে লাফ দিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে। আমাকে খাবে। আত্মরক্ষা করার মতো একটা কোনো অস্ত্র কি সঙ্গে আছে আমার? হঠাৎ হুঁশ হতে পকেটে হাত দিয়ে দেখি—আছে তো ছুরিটা। আর তামাকের কৌটা। এগুলো পকেট থেকে হাজার ঢেউয়ের দাপটেও পড়ে নি। তবু শান্তি। যাক, অন্তত ছুরি দিয়ে আক্রমণের প্রথম চোটটা তো ঠেকাতে পারব! কিন্তু ক্ষিধে যে এখন ভীষণ। ক্ষিধে এড়াবার জন্যে খানিকটা ছুটে এলাম। সভ্য সমাজে এমন করলে লোকে বলত পাগল। এখানে তো আর কেউ দেখার বা বলার নেই। এদিকে একটু একটু করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিভে যাবে দিনের আলো। সূর্য যাবে পাটে। আর দেরি করা ঠিক না। অন্তত আলো থাকতে থাকতে যেকোনো একটা গাছে উঠে রাতের জন্যে আস্তানা গাড়া ভালো। অন্তত খাই না খাই, ঘুমোই কি না ঘুমোই—হিংস্র জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে প্রাণটা তো বাঁচবে।

খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেলাম একটা গাছ। সিধে উঠে গেছে কাণ্ড। গায়ে অল্প স্বল্প কাঁটার আবরণ। সেটা মন্দ নয়। আমার পক্ষে বরং মঙ্গল। উঠে পড়লাম উপরে। পাওয়া গেল মনের মতো একখানা ডাল। বসলাম আরাম করে পা ঝুলিয়ে। তারপর জামা খুলে জামা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিলাম নিজেকে গাছের সাথে। বলতে ভুলে গেছি, এরই মধ্যে পানীয়ের সন্ধান পেয়েছি এক জায়গায়, খেয়ে এসেছি পেট ভরে অনেকখানি। কৌটা থেকে তামাক ছিঁড়ে দিয়েছি খানিকটা মুখে। তামাকের স্বাদে ক্ষিধে দূর হয়। এটা আমি জানি। এবার সব দিক থেকে শান্তি। আর পরিশ্রান্ত তো ভীষণ। তাই আরাম করে বসতে না বসতে ভীষণ ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

এক ঘুমে রাত কাবার। চোখ মেলে দেখি ফুটফুটে দিন। আকাশ ফর্সা। ঝড় নেই। সমুদ্র যেন শান্ত শিষ্ট ভালো মানুষটি। কোথায় সেই ঢেউ! কোথায় বা সেই গর্জন। যেন দর্পণের মতো স্থির, নিথর। আরেকটা অদ্ভুত অবাক ব্যাপার—কাল যে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়েছিল আমাদের জাহাজটা, দেখি ঝড়ের তাড়নায় সেটা এখন উঠে খানিকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সরেও এসেছে কূলের দিকে অনেকটা। এটা ঢেউয়ের কারসাজি—আমি চোখ বুঝে বলতে পারি। মোটামুটি সেই পাহাড়টা এখন জাহাজের খুবই কাছে। তবে ডাঙা থেকে মাইলখানেক মতো দূর। ভারি ইচ্ছে করছে একবার জাহাজে উঠে নিজস্ব প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতে।

গাছ থেকে নামলাম। হঠাৎ ডানদিকে চোখ পড়তেই দেখি—ওমা, ঐ তো আমাদের সেই নৌকো। তা প্রায় এখান থেকে মাইল দুয়েকের মতো দূর। কূলের উপর তুলে দিয়ে গেছে ঢেউ। জল গেছে নেমে। তাই দাঁড়িয়ে আছে বালির উপর আড়াআড়ি ভাবে। হাঁটতে হাঁটতে সে দিকেই এগোলাম। কাছাকাছি এগুতেই দেখি, উপায় নেই নৌকো অব্দি যাবার। প্রায় আধ মাইল চওড়া একটা খাড়ির মতো; সেখানে টইটম্বুর জল, তার ওধার চড়া। সেখানেই আটকে আছে নৌকো। দূর থেকে জল আমার চোখে মালুম হয় নি। সে হোক গে যাক, নয় নাই পেলাম নৌকো, কিন্তু জাহাজ তো বলতে গেলে হাতের গোড়ায়। দেখি না গিয়ে একবার। যদি পারি একবার কোনোক্রমে জাহাজে উঠতে, তবে আমার বেঁচে থাকার মতো বিস্তর রসদ মিলবে।

বেলা ততক্ষণে বেড়েছে। সমুদ্র শান্ত। চলেছি গুটি গুটি জাহাজের দিকে। মনটা ভারি খারাপ লাগছে। কী যে মতি হলো তখন দুদ্দাড় করে নেমে পড়লাম সবাই জাহাজ থেকে, উঠলাম নৌকোয়।... যদি না নেমে জাহাজেই থাকতাম, তবে হয়তো এই দশা আজ হতো না। নির্ঘাৎ না। বেঁচে বর্তেই থাকতাম সকলে। আমারো জীবন রক্ষা নিয়ে অত দুর্বিপাকে পড়তে হতো না। সঙ্গী সাথীদের কথা ভেবে চোখে জল এল। কিন্তু কেঁদে এখন আর কোনো লাভ নেই। যা শেষ হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা তো বৃথা। এখন নিজের জীবন রক্ষার সংগ্রাম। বাঁচতে হবে আমাকে। তার জন্যে চাই প্রয়োজনীয় রসদ এবং সেটা যেহেতু জাহাজে আছে, আমাকে তাই জাহাজে উঠতে হবে। প্যান্ট হাঁটু অব্দি গুটিয়ে ফেললাম। কেননা সামনে বেশ খানিকটা জল। পায়ের নিচে সদ্য জমা পলি। পিছলে যাই প্রতিমুহূর্তে। বহু কষ্টে এক সময় জাহাজের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু উঠব কী করে? পাটাতন যে অনেক উঁচুতে। মসৃণ গা। অবলম্বন বলতে কিছুই নেই। কী করা যায়! চারপাশে সাঁতরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি ছোট্ট একটা কাছি। উপর থেকে ঝুলে আছে তাও বেশ খানিকটা উঁচুতে। বিস্তর চেষ্টা করে ধরলাম চেপে তার প্রান্তদেশ। তখন বেয়ে ওঠা আর কঠিন নয়, উঠলাম। দেখি জল জমে আছে অনেকখানি। সেটা এক দিক

থেকে এই মুহূর্তে মঙ্গল কেননা এত ভারি জাহাজ কাত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এখন কম। পাটাতনের উপরিভাগ খটখটে শুকনো। অর্থাৎ কেবিনও শুকনো। সেখানে জল ঢুকতে পারে নি। এখন দেখা দরকার মালপত্র এসব শুকনো এবং আস্ত আছে কিনা।

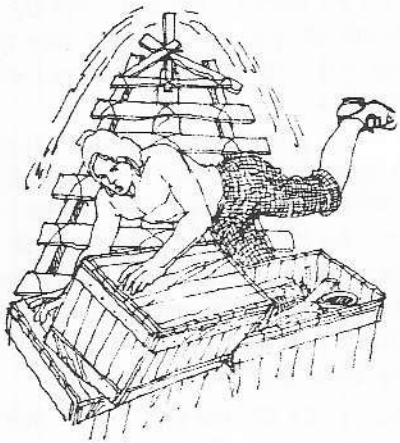

টাল সামলাতে সামলাতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম গিয়ে পেটির সামনে

আছে। যাক শান্তি! প্রথমেই হানা দিলাম রুটি-ঘরে। যতগুলো পারলাম পকেটে পুরলাম, দু হাতে দুটো নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে শুরু করলাম খাওয়া। কিছু বিস্কুট নিলাম পকেটে। পানীয়ের কয়েকটা বোতল বের করে এক জায়গায় জড় করে রাখলাম। একটা বোতল খুলে খেলামও বেশ অনেকখানি। যাক আপাতত পিপাসার কবল থেকে নিশ্চিন্ত। এবার দরকারি অন্যান্য জিনিসের সন্ধান করতে হবে।

সবচেয়ে প্রথমে দরকার একখানা নৌকো। ভেলা হলেও অসুবিধে নেই। মোটামুটি মালপত্র জাহাজ থেকে নিয়ে যেতে তো হবে ডাঙ্গায়। দেখি ভাঁড়ার ঘরে বিস্তর দড়ি আছে আর কাছি, আর পাটাতনে অতিরিক্ত প্রচুর চেরা কাঠ। বাড়তি মাস্তুলও আছে খান দুই। সব জড় করে অমনি কাজে লেগে গেলাম। বাঁধাছাঁদা করে ভেলা অবশেষে তৈরি হলো। জলে নামাতে হবে এবার। তখন দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম জলে। দড়ির প্রান্তদেশ জাহাজের মাস্তুলের সাথে শক্ত করে বাঁধা রইল। আড়াআড়ি ভাবে একখানা কাঠ নামিয়ে দিলাম ভেলার উপর। এটা সিঁড়ি। মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নামবার কাজে দরকার হবে। একটা সরু মাস্তুল দিয়ে করলাম লগি। এটা ভেলা বেয়ে ডাঙ্গায় যাবার সময় আমার কাজে লাগবে।

মোটের উপর মাল বয়ে নিয়ে যাবার উপকরণ আমার মজুত। এবার দেখা দরকার কী কী জিনিস এতে করে আমি নিয়ে যাব এবং তার ওজন কী রকম। প্রথমে বাকি চেরা কাঠগুলো তুললাম। তাতে পাটাতন আরেকটু বড় হলো। এবার তুললাম তিনটে কাটের খালি পেটি। এগুলো থেকে মাল বের করে আগেই আমি খালি করে রেখেছি। একটাতে ভরলাম রুটি, চাল, পানীয়, শুকনো মাংস, বিস্কুট, কটা মুরগি ছিল সঙ্গে সেগুলো জলের ঝাপটায় মারা গেছে—তাও। কিছু যব আর গম নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ইঁদুর বস্তা ফুটো

করায় ফুটো দিয়ে সব পড়ে গেছে। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাই নেওয়া হলো না। কটা বোতল নিলাম পানীয়ের আর জলের কয়েকটা। ব্যস পেটি বোঝাই। তখন পেরেক মেরে কাঠের ঢাকনা আটকে মুখ বন্ধ করে দিলাম। দেখি জলের তোড় তখন একটু বেড়েছে। ঢেউ উঠছে মৃদুমন্দ। কূলে খুলে ফেলে এসেছিলাম জামা, কোট আর গেঞ্জি। সব চোখের সামনে জলের টানে গেল ভেসে। প্যান্ট আর মোজা পরনে আছে। সেটাই যা সান্ত্বনা। সে যাক গে, মন খারাপ করে তো কোনো লাভ নেই। পাব না আর ঐ জামা বা কোট। ফের মন দিলাম কাজে। দ্বিতীয় পেটিতে ভরলাম কাজ করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। জাহাজে ছুতোরের একটা বাক্স ছিল। বলতে গেলে বাক্স খালি করে সব মালই নিলাম। এগুলো যে বড্ড দরকারী। নির্জন নিরালায় আমার আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এখন যদি কেউ বলে আমাকে—এই নাও এক বস্তা সোনা, বিনিময়ে এই যন্ত্রপাতির বাক্স আমাকে দাও, দেব না। হাজার লোভ দেখালেও না।

বন্দুক আর গোলাবারুদ কিছু দরকার। কেবিনের তাকে দেখি দুটো পিস্তল আর দুটো বন্দুক। বারুদ রয়েছে অনেকখানি একটা পাত্রে। আর এক বস্তা মতোন টোটা। দুটো মরচে ধরা তলোয়ারও দেখতে পেলাম। সব নিলাম। বারুদের পাত্র আরো দুটো নজরে পড়ল। তার মধ্যে একটা ভালো, আরেকটায় জল ঢুকে ভিজে গেছে। ভালোটা নিলাম। মোটমাট নিশ্চিন্ত এখন। এবার ভালোয় ভালোয় ভেলা ভাসিয়ে ডাঙ্গায় উঠতে হবে।

তবে তেমন কিছু ঝকমারি হবে বলে মনেও হয় না। সমুদ্র এখন শান্ত। আমার পক্ষে স্বপ্ন সেটা। জল কিছুটা বেড়েছে ঠিক, তবে এমন নয় যে ভয় পাওয়ার মতো বা ঘাবড়ে যাবার মতো। বাতাস আছে। তার গতি এখন কূলের দিকে। মোটমাট অনুকূল অবস্থাই বলা যায়। ভাঙা দাঁড় পেলাম একটা জাহাজের ডেকে। নিলাম। ভেলা ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দড়ি বেয়ে নামলাম এবার ভেলায়। দড়ি খুলে দিলাম। মাইলখানেক অব্দি বলতে গেলে নিশ্চিন্ত। কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। যেমনটি চাই, তেমনই চলে ভেলা। সে একেবারে তরতর স্বচ্ছন্দ গতি। তবে মুশকিল হলো আরো খানিকটা এগিয়ে। দেখি ডাঙ্গার দিকে কিছুতেই আর নিয়ে যেতে পারি না ভেলা। সামনে একটা নদীর মুখ। সমুদ্রের জল প্রবল বেগে ঢুকছে সেই নদীতে। তারই টানে আমার সব রকম চেষ্টা অগ্রাহ্য করে ভেলা সেই দিকেই এগিয়ে চলল। আমার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। ঘূর্ণি উঠছে নদীর মুখে। ঘূর্ণির টানে পড়ে আমার তো বলতে গেলে নাজেহাল অবস্থা। ভেলা এই ওল্টায় কি সেই ওল্টায়। একদিকে কাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পেটিগুলো সড়াৎ করে সরে সেই দিকে গিয়ে জমা হলো। টাল সামলাতে সামলাতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম গিয়ে পেটির সামনে, দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে রাখলাম। তাইতে রক্ষে। নইলে ফের কপালে ভরাডুবি।

আরো খানিকক্ষণ পর। দেখি পাক খেতে খেতে নৌকো ঢুকে পড়েছে নদীর ভিতর। চলেছে স্রোতের টানে তরতর করে এগিয়ে। ঘাম দিয়ে এতক্ষণে যেন জ্বর ছাড়ল। চারপাশে তাকালাম। সেই ডাঙা। দুধারে ঘন জঙ্গল। কিন্তু থামা তো দরকার এবার। কতদূর আর যাব? সমুদ্রের নাগাল ছেড়ে বেশি ভিতরে ঢোকার আমার ইচ্ছে নেই। তাতে মুশকিল। কেননা কাছাকাছি থাকলে নজর রাখতে পারব দূরে, কোনো জাহাজ-টাহাজ যায় কিনা দেখতে পাব।

আরো খানিকটা এগিয়ে একটু ফাঁকা মতো জায়গা। মাঠই বলা যায়। জঙ্গল দূরে দূরে। লগি কাদায় গেঁথে ভেলা থামালাম। ডাঙ্গার একেবারে গায়ে। কিন্তু ওঠার উপায় নেই। পাড় এখানে বড্ড উঁচু। অতএব প্রতীক্ষা করতে হবে। জল সমুদ্র থেকে যত ভিতরে ঢুকবে তত উঁচু হবে ভেলা, পাড়ের সমান সমান হবে। তখনি নামার চেষ্টা করব।

হলো তাই। আরো প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর জল উঁচু হলো প্রায় এক ফুটের মতো। দেখি পাড়ের প্রায় সমান্তরাল। তখন লগি গাঁথলাম শক্ত করে মাটিতে। দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। পেটিগুলো ঠেলে নামিয়ে দিলাম ডাঙ্গায়। নিশ্চিন্ত এবার। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আমার একটি জিনিসও নষ্ট হয় নি।

কিন্তু নামলাম যে এখানে, থাকি কোথায়? মালপত্রই বা কোথায় রাখি। এটা এবার ঠিক করা দরকার। ঘুরে ফিরে দেখতে হবে চতুর্দিক। আসলে জায়গাটা কোনো মহাদেশের অংশ না দ্বীপ এটাই এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি নি। এখানে মানুষ বাস করে কিনা সেটাও প্রশ্ন। জীবজন্তু যে আছে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু কী জাতীয় জন্তু তারা? হিংস্র না কি সাধারণ? মাইলখানেক দূরে একটা পাহাড় নজরে পড়ছে। খাড়া উঁচু চূড়া পাশে আরো কয়েকটা টিলা পাহাড়। আমার ধারণা পাহাড়ে উঠলে মোটামুটি চারদিক আমি দেখতে পাব। কিন্তু যাবার আগে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। পথে কী বিপদ আপদ হয় কিছু বলা যায় না। তাই পিস্তল সাথে নিলাম। আর একটা ছররা বন্দুক। সঙ্গে বেশ খানিকটা বারুদ আর টোটা। তারপর রওনা দিলাম পাহাড়ের দিকে।

ভারি কষ্ট হলো উঠতে। খাড়া উঁচু পাহাড়। কষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। চারদিকে তাকালাম। শুধু জল আর জল। অর্থাৎ দ্বীপ এটা। দূরে একসার পাহাড়। আরো দূরে গোটা দুই ছোট দ্বীপ। ব্যস, আর কিছু দেখার মতো নেই।

আরো একটা জিনিস পরিষ্কার হলো। এখানে যে মানুষ বাস করে না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শুধু ঘন সবুজ বনানী। আর অসংখ্য বন মোরগ। হিংস্র জন্তু যে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে সেটা নিতান্তই অনুমান। যাতায়তের পথে কোনো জন্তু নজরে পড়ল না বা গর্জনও শুনতে পেলাম না। ফেরার পথে একটা মস্ত পাখি মারলাম। বসে ছিল গাছে নিশ্চিন্তে। বন্দুক তাক করে ঘোড়া টিপলাম। সেই প্রথম বন্দুক গর্জন দ্বীপে। তার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী একলা আমি। আর বন্দুক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা জঙ্গল জুড়ে সে যা বন মোরগের দাপাদাপি আর ডাক। তবে ঐটুকুই। ঘন জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে বাইরে খুব একটা কেউ বের হলো না। শুধু দু চারটি। তাও সুট করে ভয়ে ঢুকে পড়ল গাছগাছালির আড়ালে। তুলে নিলাম মরা পাখিটাকে। যতদূর ধারণা, বাজপাখি জাতীয় একটা কিছু। ঠোঁটের গড়ন আর পালকের রঙ দেখে আমার অন্তত সে রকমই মনে হলো। কিন্তু নখ নেই। এটা ভারি অবাক ব্যাপার। আর মাংসের স্বাদও ভারি বিশ্রী। তীব্র ঝাঁঝাল একটা গন্ধ। বলতে গেলে অখাদ্য। শেষ অব্দি রান্না করে খাবার ইচ্ছে আর হলো না।

ফিরে এলাম জায়গায়। প্রধান সমস্যা এখন মালপত্র ঠিক ঠিক গুছিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখা। কিন্তু কোথায় সেই নিরাপদ অঞ্চল? তাছাড়া রাত্রে আমিই বা থাকি কোথায়? এখানে শুয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা জীবজন্তুর ভয়। ঘুমের মধ্যে যদি এসে আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে।

অবশ্য পরে দেখেছি, আমার এই ভয় এবং অনুমান অমূলক। দ্বীপে হিংস্র জন্তু বলতে কিছুই নেই।

মালের পেটিগুলো চারপাশে সাজিয়ে মোটামুটি একটা ঘেরা মতো করলাম। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কুটির। ছাউনিটা অবশ্য বাদ। এটা রাতটুকু কাটাবার উপায় মাত্র। খাবার হিসেবে হাতের গোড়ায় পেলাম একটা বন মোরগ। তাকে গুলি করে মারলাম। একটা খরগোশ গুলির শব্দ শুনে বন থেকে বেরিয়ে এল। তাকে আর মারলাম না।

মোটামুটি মালপত্র যেটুকু এনেছি জাহাজ থেকে তা যথেষ্ট নয়, আরো অনেক কিছু আমাকে আনতে হবে। বিশেষ করে, পালটা দরকার, ছাউনি করার কাজে লাগবে। আরো হাজারো এটা ওটা জিনিস। জাহাজে পড়ে আছে অকেজো অবস্থায়—লাভ কী? বরং নিয়ে আসি এখানে আমার কাজে লাগবে। তার জন্যে অনেকবার জাহাজে যাওয়া দরকার এবং সেটা যত শীঘ্র সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। কেননা এর পরে যে তুফান উঠবে, আমি চোখ বুঝে বলে দিতে পারি, তাতে জাহাজের আর অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকবে না, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং পড়ে রইল আর সব কাজ। এটাই প্রধান এবং জরুরি বিবেচনার পরদিনই ফের যাব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু যাব কী ভাবে? ভেলা নিয়ে? বরং থাক। যেভাবে গিয়েছিলাম প্রথমবার, সেই ভাবে পায়ে হেঁটেই যাব। ফিরে আসার সময় বরং কাঠ দিয়ে ফের একটা ভেলা বানিয়ে নেওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, এবার আর বেশি পোশাক রাখব না গায়ে। শুধু একটা সার্ট, আর প্যান্ট আর পায়ে রবারের জুতো এবং কোনোক্রমেই এর কোনোটা জলের ধারে বালির উপর খুলে রাখব না।

আগের বারের মতোই জল ভেঙে, কখনো সাঁতরিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলাম। তৈরি হলো আরেকটা ভেলা। তাতে একের পর এক মাল তুললাম। তবে এবার আর আগের মতো অতগুলো নয়। নিলাম পেরেক আর আংটার তিনটে থলি, স্ক্রু ড্রাইভার, ডজন দুই হাত কুড়ুল, একটা যাঁতা, সাত বাক্স টোটা, পাখি মারা আরেকটা বন্দুক, আরো খানিকটা বারুদ, আর সীসার মস্ত একটা পাত। এত ভারী যে পাতটা তুলতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হলো। টানতে টানতে জাহাজের কিনারে নিয়ে এসে ভেলায় তোলা—সে এক রীতিমতো গলদঘর্ম কাজ।

একটা বাক্সে শুধু পোশাক-আশাক। সব পুরুষদের। নিলাম ভেলায়। পাল ছিল বেশ কয়েকটা বাড়তি, সেগুলো তুলে নিলাম। ভাঁজ করা খাট নিলাম একটা, আর এক প্রস্ত তোষক বালিশ। আর নয়। আপাতত আজকের মতো এখানেই ইতি। তখন ধীরে ধীরে ভেলা বেয়ে নদী দিয়ে ডাঙ্গায় এসে উঠলাম।

এসে দেখি মালপত্র যেমন যা ফেলে গেছি ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। কেউ হাত দেয় নি বা একটা টুকরো জিনিস অব্দি নষ্ট হয় নি। আমি ভেবেছিলাম হয়তো কেউ না কেউ তছনছ করবে কি চুরি-চামারি করে নিয়ে যাবে। মোটমাট সেদিক থেকে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু দেখি বিড়ালের মতোই দেখতে অনেকটা—বুনো একটা জীব বসে আছে আমার পেটিগুলোর কাছে ঘাপটি মেরে। আমার দিকে জুলজুল করে দেখতে লাগল। আমি বন্দুকটা ঠেলে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না। তখন একটা বিস্কুট দিলাম। দেখি শুঁকল খানিকক্ষণ, তারপর কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে নিল। খেয়েই ফের দেখি প্রত্যাশীর মতো চেয়ে আছে। কিন্তু আর দেব কী করে? আমার যে বিস্কুট বা অন্যান্য খাবার জিনিসের সংগ্রহ নামমাত্র। তা থেকে কি আর এত দানখয়রাত চলতে পারে। তখন দেখি একটুকাল বসে থাকার পর নিতান্ত ব্যাজার মুখে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিল।

এবার মোটামুটি বিস্তর মালপত্র জমেছে। সেগুলোর নিরাপত্তা দরকার। আপাতত প্রয়োজন একটা তাঁবু খাটানো। তারই কাজে লেগে পড়লাম। খুঁটি এনেছি বেশ কয়েকটা জাহাজ থেকে। সেই সাথে ছোট বড় নানান মাপের অনেকগুলো পাল। খানিকক্ষণ কাজ করার পর দেখি চমৎকার একটা তাঁবু তৈরি হয়েছে। তখন মালপত্র পেটি থেকে খালি করে তাঁবুর ভেতরে এনে তুললাম। তারপর খালি পেটি কটা আরো নানান এটা ওটা জিনিস

দিয়ে ঘিরে দিলাম তাঁবুর চারপাশ। যাক এতক্ষণে বিজন বিভুঁই দ্বীপে নিজস্ব ঘর বলে তবু কিছু একটা তৈরি করা গেল। নিশ্চিন্ত লাগছে বেশ।

দরজাও বানিয়েছি তাঁবুর। চেরা কয়েকটা কাঠ দিয়ে আড়াল করে দিয়েছি ঢোকার মুখটা। তাতে ঠেকনা দেওয়া বোঝাই একটা পেটি। মোটমাট বাইরে থেকে ঠেলাঠেলি করে কেউ যদি ঢুকতে চায় তাকে ঝক্কি পোয়াতে হবে। সেই ফাঁকে আমিও সজাগ হবার সুযোগ পাব।

ভারি চমৎকার ঘুমোলাম সেদিন আমার নতুন ঘরে। দরজা আটকে বিছানা পেতে মাথার কাছে দু দুটো পিস্তল রেখে দে ঘুম। ক্লান্তিও তো কম নয়। সারাদিনের পরিশ্রমের একটা ধকল আছে বৈকি। এক ঘুমে রাত একেবারে কাবার।

পরদিন ভোর থেকেই নতুন আরেক প্রস্থ চিন্তা। মালপত্র যা এনেছি এ পর্যন্ত একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এখনো যে অনেক কিছু আছে জাহাজে। ঢেউ এলে ঝড় উঠলে ভেসে যাবে জাহাজ, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে—সব সঞ্চয় জমা হবে গিয়ে সমুদ্রের গর্ভে। লাভ কী তাতে! বরং নিয়ে আসি না আমিই সব। একদিনে না পারি, ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। আপাতত যথেষ্ট মনে হলেও কদিন লাগবে ফুরোতে। জানি না তো কতদিন থাকতে হবে এখানে। সে অবস্থায় যত যা আনব সেটুকুই লাভ। তাই লাগবে আমার জীবনযাপনের কাজে। তো কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। রোজই যাই একেকবার, নিয়ে আসি এটা ওটা টুকিটাকি মাল, বেশি হলে ভেলা বানাই, কম হলে নিয়ে আসি কূলের উপর ভাসিয়ে ভাসিয়ে। এইভাবে দড়ি এল, মোটা সুতো এল, বেশ কয়েকখানা ত্রিপল আনলাম, সেই ভেজা বারুদের প্যাকেটটাও আনলাম,—মোটমাট প্রায় সবই। এর জন্যে দরকার হলো মোট এগারো বার যাতায়াত। শেষাবধি পড়ে ছিল মস্ত রুটির টিন, মদের বোতলের একটা পেটি, এক বাক্স চিনি আর এক পিপে ময়দা। এগুলো গোড়াতে আমি দেখতে পাই নি। পরে দেখি লুকানো রয়েছে একটা আলাদা জায়গায়। সব জড় করে তুললাম ভেলায়। তারপর নিরাপদে ডাঙ্গায় নিয়ে এলাম।

পরের দিন ফের আরেক দফা যাত্রা। নেশা ধরে গেছে যে আমার। দস্যুর মতো কেবল লুটপাট করে সব নিয়ে আসতে মন চায়। দেখি পড়ে আছে একধারে কটা খুঁটি, সেই সাথে কাছি অনেকখানি, সব মিলে তা-ও নেহাৎ কম নয়। ভালোই ওজন। ভেলায় তুললাম। আসছি বেশ জল কেটে কেটে, হঠাৎ তোড় এল। ওলট পালট ঢেউ। ভেলা গেল চোখের নিমেষে উলটে। আমি ঝপাং করে পড়লাম জলে। মালপত্র সব মুহূর্তে জলের নিচে। শুধু ভেলাটা একটু পরে ভেসে উঠল। তখন সাঁতার কেটে সেটাতে চড়ে ফিরে এলাম ডাঙ্গায়। মনে আক্ষেপ। বসে রইলাম সমুদ্রের পাড়ে। ঢেউ একটু একটু করে কমল। ভাটার টানে জলও নেমে গেল নিচে। তখন যেখানটাতে ডুবেছিল ভেলা, সেখানে খোঁজখাঁজ করে কাছি গোছাটা আর তারের গোল্লাটা তুলে আনতে পারলাম। লোহাও ছোট বড় নানান মাপের কিছু ছিল সঙ্গে। বলতে ভুলে গেছি। সেগুলো উদ্ধার করা আর সম্ভব হলো না। ভারী বলে গড়াতে গড়াতে চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে।

এবার হিসেবে বসলাম। মোট তের দিন আছি আমি এখানে। এর মধ্যে এগারো বার গেছি জাহাজে। যতদূর সম্ভব মানুষের দুখানা হাত যা আনতে পারে সব এনেছি আমি জাহাজ থেকে ডাঙ্গায়। সমুদ্র মোটামুটি শান্ত। এতটুকু উত্তাপ বা ঝড় ঝঞ্ঝার কোনো লক্ষণ নেই। যাব নাকি ফের? আর একটি বার যদি আরো কিছু নজরে পড়ে। কোনো টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস।

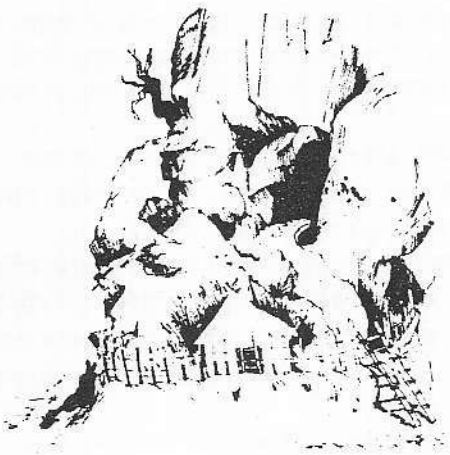

গেলাম ফের পরের দিন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম প্রতিটি অংশ। কোথাও কিছু নেই। গেলাম সারেং এর কেবিনে। দেখি টেবিলের একটা দেরাজ তালা মারা। তালাটা ভেঙে ফেললাম। দেখি তিনটে ক্রুপ। বড় একটা কাঁচি। ডজন খানেক ছুরি আর কটা কাঁটা চামচ। সব পকেটস্থ হলো। আরেকটু ভেতরে হাতড়ে দেখি নানান দেশের কিছু খুচরো পয়সা আর টাকা। যেমন ইংল্যান্ডের ছয় পাউন্ডের নোট। ব্রাজিলের কিছু মুদ্রা, একটু সোনা, খানিকটা রুপো—হাসি পেল খুব। কী হবে এসব নিয়ে—অখ্যাত অজ্ঞাত জনহীন দেশে! মাটিতে পুঁতে রাখলেই বা কী আসে যায়। সে অর্থে এই একখানা ছুরির দাম আমার কাছে অনেক বেশি। তবু নিলাম সব। ছোট্ট একফালি ত্রিপলে মুড়ে পকেটে রাখলাম। ফিরব এবার। ভেলা কি আরেকটা বানাব? নাকি সাঁতার কেঁটে ফিরে যাব? ভাবছি এইসব। হঠাৎ দেখি আকাশ কালো করে কী মেঘের ঘনঘটা। চোখের নিমেষে যেন দৃশ্যপট পাল্টে গেল। উঠল ঝড়। স্পষ্ট ঝড় ওঠা দেখতে পেলাম। ডাঙ্গার দিক থেকে আসছে হু হু হাওয়া। গাছপালা দুলছে। সে কী দুলুনি! আর দেরি নয়। ভেলা বানাবার চিন্তা বা চেষ্টা এখন বৃথা। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম অমনি জলে। সাঁতার কেটে যখন কূলে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বাতাস আরো তীব্র, জল ফুলে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। ঢেউ ধেয়ে আসছে দৈত্যের মতো কূলের দিকে সমুদ্রের বুক ভেঙে।

তাঁবুতে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বেশ নিরাপদ লাগছে। বাইরে হাওয়ার সোঁ সোঁ দাপাদাপি। রাতভর সেইভাবেই চলল। দেখি ঝড় আর নেই। জাহাজটাও নেই। কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া কে জানে! হয়তো সমুদ্রের গর্ভে এখন তার স্থান। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস সব ইতোমধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি। যদি দু একদিন দেরি করতাম কী করছি করব বলে বলে দিন কাটাতাম, তাহলে সব এতক্ষণে জাহাজের সাথে সাথে আমার নাগালের বাইরে চলে যেত। সেক্ষেত্রে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না।

তা জাহাজের চিন্তা আপাতত মন থেকে দূর করলাম। এখন আরেক চিন্তা আমার—সেটাই এই মুহূর্তে প্রধান—জিনিসপত্র সমেত নিজেকে আরো নিরাপদ করা, যাতে

নরখাদক বর্বর বা বন্য হিংস্র জন্তু আমার কোনো ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এর জন্যে দরকার নিজের আস্তানা আরো মজবুত, আরো চমৎকার করা। কিন্তু কোথায় করব সেই আস্তানা? নাকি তাঁবুই খাটিয়ে রেখে দেব, না কোনো গুহা-টুহার খোঁজ করব।

খুঁজতে বের হলাম জায়গা। দুটো দিকে মূলত আমার নজর। প্রথমত খুব একটা ভিতরে ঢুকব না, সমুদ্রের কাছাকাছি থাকব, দ্বিতীয়ত পানীয় জলের সরবরাহ থাকবে পর্যাপ্ত। যেন জলের খোঁজে দূরে কোথাও না যেতে হয়।

এর পাশাপাশি অবিশ্যি স্বাস্থ্যের কারণটাও আছে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটা সবচেয়ে প্রথম কথা। নরখাদক বর্বর বা হিংস্র জন্তুর কবলে যদি পড়ি তবে তো সব চুকেই গেল। সুতরাং নজর রাখতে হবে। আরো একটা ব্যাপার এখানে আসার পর থেকে লক্ষ করেছি। সূর্যের বড় তেজ। ঝলসে যায় যেন পিঠের চামড়া। এর কবল থেকেও নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

খুঁজতে খুঁজতে যে জায়গাটার হদিশ মিলল বলা যেতে পারে, আমার চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্য করে সেটা আদর্শ স্থান। পাহাড়ের ঢালে সমতল মতো খানিকটা এলাকা। বেশ উঁচুতে। পেছনে পাহাড়টাও বেশ খাড়া। অর্থাৎ পেছন থেকে অজান্তে কোনো রকম বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। একটা গুহাও আছে কাছাকাছি। গুহা অবিশ্যি যথার্থ অর্থে নয়, পাহাড়েরই গায়ে একটা গর্ত মতো। তার মুখে একটা দরজা বসাতে পারলে অনেক দিক থেকেই শান্তি।

পাহাড় ঢালু হতে হতে গিয়ে মিশেছে মাটিতে। সেখানে সবুজ মখমলের মতো ঘাস। এখানেই তাঁবুটা খাটালাম। প্রায় শ খানেক গজ চওড়া আর দুশ গজ মতো লম্বা মাঠ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বাড়ির উঠোন, খেটে খুটে বহুদিনের পরিশ্রমে আমিই তৈরি করেছি। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে সমুদ্র। ঢালু হতে হতে জমি গিয়ে মিশেছে কূলে। সব দিক থেকেই পছন্দ আমার, সব দিক থেকে মনের মতো। যা যা চাই সব ব্যবস্থাই এখানে আছে।

আমার আসল লক্ষ্য কিন্তু গুহাটা। তাঁবু খাটাবার সাথে সাথে গুহাটাকেও ঢেলে সাজালাম। ঝাড়-পৌছ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলো। তারপর খুটো গাড়লাম দুদিকে দুটো। মাঝখানে দিলাম চওড়া চেরা কাঠ। উঁচু হলো দরজা প্রায় মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট। তারপর তার দিয়ে সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বেশ খানিকটা জায়গা বেড়ার মতো করে ঘিরে দিলাম। আর কী চিন্তা আমার। মই বানালাম একটা। সেটা একেবারে উচ্চতায় দরজার মাথা অব্দি। উঠব মই বেয়ে, গুহায় নামব, তারপর তুলে নেব মই। ভিতরে রেখে দেব। ব্যস আর কে নাগাল পায়। আসুক নরখাদক, আসুক হিংস্র জন্তু, তারের বেষ্টনী যদি বা ডিঙিয়ে আসে, কিছুতে পারবে না সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু কাঠের দরজা পার হয়ে আমাকে ধরতে বা আমার কোনো ক্ষতি করতে। নিরাপদ নিশ্চিন্তে পড়ে পড়ে আমি ঘুমোতে পারব।

তাঁবুটা রইল নিছকই একটা আস্তানা হিসেবে, মালপত্র যতখানি সম্ভব এনে রাখলাম তারের বেষ্টনীর মধ্যে। সেখানেও চারদিকে খুটো গেড়ে অনেকটা তাঁবুর মতো বানালাম। এটা বৃষ্টি আর রোদের হাত থেকে জিনিসপত্র রক্ষার অভিপ্রায়ে। বড় ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিলাম তাঁবুর মাথা। ব্যস এদিক থেকেও নিশ্চিন্ত।

তারপর গুহার মধ্যে খাট পাতলাম, বিছানা পাতলাম, শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে। আহ শান্তি।

কিন্তু কাজের কি আর শেষ আছে। ঘর বাঁধার কাজ। একটু করলে মনে হয়, আরো যে একটু করা দরকার। তাই মাটি তুলে আনলাম নিচ থেকে। তাল তাল মাটি চওড়া করে তারের বেড়ার গায়ে জমিয়ে দিলাম। উঁচু হলো প্রায় দেড় ফুট। হলো দেয়াল। সেটা নিরাপত্তার আরো এক ধাপ! তারের বেড়ার ফাঁক গলে যদি বা কেউ ঢুকতে পারত, দেয়াল ডিঙিয়ে এখন আর সেটা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আমার মালপত্র নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তারও আর কারণ থাকছে না।

মোটমাট গোছগাছ করে সব কিছু নিপুণভাবে সাজিয়ে নিতে সময় লাগল যথেষ্ট। সেটাই স্বাভাবিক। চট করে তো আর কিছু হয় না। এরই মধ্যে একদিন এক কাণ্ড। দুদ্দাড় করে কালো কুচকুচে এক চিলতি মেঘ ধুয়ে নামল দারুণ বৃষ্টি। আমি তো থ। তখন সবে গুহার দরজাটা বসিয়েছি, মালপত্র তখনো কিছু বাইরে, কিছু তাঁবুর মধ্যে। হঠাৎ বৃষ্টির ধারার মধ্যেই কানের পর্দা ফাটিয়ে ত্রাহি ত্রাহি এক বজ্রপাত। সে যা আওয়াজ। আওয়াজটা দেখি খানিকক্ষণ ধরেও রয়ে গেছে। ব্যাপার কী! তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কারণটা মনে উদয় হলো। তাই তো, রেখেছিলাম যে বারুদের একটা প্যাকেট বাইরে খোলা জায়গায়। তাতেই কি ধরে গেল আগুন! তারই কি বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম!

বেরিয়ে দেখি সত্যি সত্যি তাই। তখন সে যা দুঃখ আমার, যা মনের অবস্থা! বারুদ মানে যে আমার জীবন, আমার ক্ষুধার অন্ন যোগাবার একমাত্র সম্বল। এই বিজন বিভুঁয়ে বারুদ নেই কিছু নেই—আমি বাঁচব কী করে।

অবিশ্যি যায় নি সব। মোটে একটা প্যাকেট গেছে। আছে আরো অনেকখানি। সেই যা সান্ত্বনা। সেগুলোকে এখন আগলে রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা। অমনি হুড়মুড় করে অন্য সব কিছু গুছিয়ে তুলবার আগে বারুদ আর টোটার প্যাকেটগুলো নিয়ে গুহায় ঢোকালাম। মূল প্যাকেট খুলে বানালাম একশটার মতো পুরিয়া। ছোট বড় সে নানান মাপের। প্রায় আড়াইশ পাউন্ড ওজনের যে বারুদ। পুরিয়া করা হলে রাখলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নিশ্চিন্ত এখন। কেননা যদি কোন কারণে বজ্রের আগুনে একটা পুরিয়া জ্বলেও যায়, তবে সেটাই যাবে, বাকিগুলোতে তার ছোঁয়াচ লাগবে না এবং সেক্ষেত্রে আমার বাকি বারুদ রক্ষা পাবে।

আর এই সব টুকিটাকি কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোজ একবার করে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপার তো আছেই। দুটো তার উদ্দেশ্য। এক হলো দ্বীপটাকে ভালো করে চেনা জানা, দুই—ছোটবড় জীবজন্তু মেরে খাদ্যের সংস্থান করা। তা ঘুরতে ঘুরতে দেখি, ছাগল আছে জঙ্গলে বিস্তর। সেটা মোটামুটি আমার পক্ষে শুভ সংবাদই বলা যায়। কিন্তু খুব লাজুক এবং ভীরু প্রকৃতির আর অসম্ভব গতি পায়ে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে উধাও। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধার কারণ নেই। কেননা আমার বন্দুকের গতিও কিছু কম নয়। একবারে না পারলাম, পারব তো মারতে কখনো না কখনো। শুধু ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা আর নজরটাকে নতুন ভাবে শানিয়ে নেওয়া। সঙ্গে ফন্দি। একটা তো আমি এরই মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছি। পাহাড়ের মাথায় উঠে তাক করে বসে থাকি। সামনের ছোট্ট উপত্যকা মতো। খানিকটা ঢালা জমি। সেখানে কচি কচি ঘাস। দেখি ঘুরে ঘুরে

সেখানেই আসে ঘাস খেতে। মাথা কালে ভদ্রে উপর দিকে তোলে। তুললেও সে অল্প একটু। আমি যেখানে বসা তত অব্দি চোখ যায় না। ফলে আমাকে দেখতে পায় না। তো দিলাম একদিন ঘোড়া টিপে। মরল একটা ছাগল। সঙ্গে তার আবার একটা বাচ্চা। দুধ খাচ্ছে। ভারি খারাপ লাগল মনটা। আহারে, বেচারার মা-টাকে মেরে ফেললাম! দেখি মরবার পরেও দুধের বাঁট থেকে মুখ সরায় না। তখন গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে এলাম নিজের আস্তানায়। কিন্তু এক জ্বালা—কিছুতেই অন্য কিছু মুখে তুলবে না। বাচ্চা যে একদম। ঘাসপাতা খাওয়ার অভ্যেস যে হয় নি। তা শুকিয়ে মরবে, বরং আমিই মারি; খেয়ে ফেলি। হাত উঠছিল না মারতে, তবু উপায় নেই। আমারই হাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। মা-বেটা মিলিয়ে একলার পক্ষে যথেষ্ট মাংস। খেলাম তাই কদিন পেট পুরে। যাক, অন্তত কটা দিনের রুটি খরচ তো বাঁচল।

বারোটা খুদে খুদে দাগ টানলাম

আস্তানা বানাবার পর এখন আমার সামনে জরুরি কাজ হলো আগুন জ্বালাবার মতো একটা জায়গা তৈরি করা। সেটা গুহার কাছাকাছি থাকলেই ভালো হয় এবং কোনো একটা ঢাকা জায়গায়। অর্থাৎ সে আগুন আমি নিভতে দেব না কোনোদিন। অনন্তকাল ধরে জ্বলবে। অন্তত আমি যতদিন এই দ্বীপে আছি ততদিন। পাঠক, এবার এই অবসরে আমার নিজের মনের অবস্থার কথা একটু শুনে নিন।

স্বভাবতই মন আমার খারাপ। বিজন বিভূঁয়ে এসে উঠেছি, জানি না কবে শেষ হবে এখানকার মেয়াদ, কবে পারব এখান থেকে ফের লোকালয়ে ফিরে যেতে—এই নিয়ে অহোরাত্র মনের খাঁজে খাঁজে একটা ব্যথা, একটা দুশ্চিন্তা গুমরে গুমরে বেড়ায়। এটাকে আমি নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছি—আমার মন্দভাগ্য। ভাবতে বসলেই অনেক কথা মনে পড়ে যায়, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল, আমার বুক যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চায়। তবু উপায় নেই। কেঁদে গলা চিরে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না আমার কাতর আহ্বান। কেউ আমার বেদনার কথা জানতেও পারবে না।

তবে হ্যাঁ, এসব চিন্তায় বুক যখন ভারি হয়ে ওঠে, তখন পাল্টা চিন্তাও এসে সান্ত্বনার ভাষা নিয়ে মনের আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করে। তখন আসে পাল্টা জিজ্ঞাসা। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি।—আচ্ছা ছিলে তো তোমরা মোট এগারো জন। একসাথে জাহাজে করে সবাই আসছিলে। বাকি দশ জন কোথায় গেল; কেন তারা রক্ষা পায় নি? কেনবা একলা তুমি বেঁচে গেলে? কী এর উদ্দেশ্য? এও কি নিয়তির অমোঘ নির্দেশ নয়? ভালো না মন্দ সেটা তুমি নিজেই ঠিক করে নাও।

তখন মনে একটু বল পাই। যাকে বলে নতুন উদ্যম আর সাহস। আরো যুক্তি তখন আসে। যেমন—জাহাজটা চড়ায় এসে আটকে থাকার কথা। ছিল সেই জন্যেই তো পেরেছি আমি মালপত্র নামিয়ে আনতে। টুকিটাকি জিনিস থেকে শুরু করে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, এমন কি বন্দুক, তার গোলা বারুদ—সব। এগুলো না পেলে আমার আজ কী দশা হতো? আর এমনই ভাগ্যের খেলা—নামিয়ে আনলাম শেষ জিনিসটুকু, দেখতে না দেখতে প্রায় চোখের সামনে কোথায় কোন নিরুদ্দেশে ভেসে গেল জাহাজ। এগুলো কি আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়?

অবিশ্যি বারুদ কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই বজ্রপাতের ফলে। সেটাকে আমি আর নিয়তির খেলা বলে মনে করি না। ধরে নিই ওটা কাকতালীয়। তবে সেটা যাতে আর না ঘটে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছি। তবু মেঘ ডাকলেই আমারো বুক দুরু দুরু করতে থাকে। ঘাবড়ে যাই। ভাবি, বাজ পড়বে না তো আবার? তাতে ফের বারুদ জ্বলে যাবে না তো?

মোটের উপর অনন্ত নির্জন নিরালা আমার জীবন। মজা নদীর নিথর জল যেরকম। তবে তারও মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনা দরকার। যেমন কোথায় আছি আমি তার একটা হদিশ। কবে প্রথম এসেছি এখানে তার হিসেব। কতদিন আছি তার একটা বর্ণনা। এগুলো দরকার। অন্তত পরে কোনো না কোনোদিন আমার নিজেরই দরকার হতে পারে।

মানচিত্র এনেছিলাম জাহাজ থেকে, তার হিসেব মিলিয়ে দেখলাম—আমি যে দ্বীপে আছি, সেটা অনামী, নয় ডিগ্রী বাইশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় তার অবস্থান। আমি এসেছি এখানে ৩০ সেপ্টেম্বর। আজ বারো দিন পার হয়ে গেল। এরও একটা হিসেব রাখা দরকার। তখন একটা মস্ত গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করে লিখলাম—আমি, এই দ্বীপে ১৬৫৯ সালের, ৩০ সেপ্টেম্বর এসেছি। তার পাশে বারোটা ক্ষুদে ক্ষুদে দাগ কাটলাম। অর্থাৎ বারো দিন আছি আমি এখানে। দিন যেমন বাড়বে, দাগও একটা একটা করে বাড়বে। মোটমাট এটাই হবে আমার আগামী দিনের দিন-মাস-বছরের ক্যালেন্ডার। খুচরো অনেক কিছুই এনেছি জাহাজ থেকে। তার উল্লেখ আগে করি নি। কেননা সেগুলো মূল্যবান তেমন কিছু নয়, কিন্তু দরকারী বটে আমার কাছে। যেমন কলম, কালি, কাগজ, কাপ্তেনের নামাঙ্কিত কয়েকটা কাগজের মোড়ক, কম্পাস, জ্যামিতিক মাপ কষার কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু নকশা, সমুদ্রে জাহাজ চালনা সংক্রান্ত কয়েকখানি বই, একখানা বাইবেল, পর্তুগিজ ভাষায় লেখা খানকতক বই, তার মধ্যে একখানা প্রার্থনাগীতি ধরনের—সব যত্ন করে আমি তুলে রেখেছি আমার অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে। ফেলি নি একটাও। কখন কোনটা দরকার লাগে বলতে পারে না কেউ! তবে লাগবে যে দরকারে কোনোদিন এটা আমি স্থির জানি। হ্যাঁ, আরো তিনটে অন্য জাতীয় জিনিস এনেছি জাহাজ থেকে। সেটা আগে বলতে আমার একেবারে মনে নেই। দুটি বেড়াল এবং একটি কুকুর। এরা জাহাজে আমাদের সাথে সাথেই ছিল। প্রথম যেদিন ভাঙা জাহাজ থেকে মাল আনতে যাই সেদিনই পরম যত্নে বন্দি বেড়াল দুটোকে ভেলায় তুলে নিয়েছিলাম। কুকুরটাকে কোলে করে নিয়ে

আসার দরকার হয় নি। ভেলা ছাড়তে দেখে নিজে থেকেই লাফিয়ে পড়েছে জলে, তারপর সাঁতার কাটতে কাটতে উঠেছে এসে ডাঙ্গায়। সেই থেকে সে আমার পরম বিশ্বস্ত অনুচর। সুখ দুঃখের সাথীও বলা যায়। ছিল একসাথে অনেক দিন। আমার তো মস্ত সুবিধে। এমন নয় যে ওকে দিয়ে খাটাব কি কোনো কাজ করাব। বলব, এটা নিয়ে আয় তো ওটা নিয়ে আয় তো। সে সব কিছু না। বরং বসে বসে কথা বলব ওর সাথে। সেইভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটবে। কদিন পরে দেখি ব্যাপারটা বড্ড একতরফা। আমি একলাই বক বক করে মরি। তার চেয়ে বরং এক কাজ করি না। কলম আছে কালি আছে কাগজ আছে বরং লিখেই ফেলি সবকিছু। তাতে অন্তত নথি বলে একটা জিনিস থাকবে। তখন তাই শুরু করলাম। কিন্তু কালি এক সময় গেল ফুরিয়ে। সে যাকগে, নতুন করে, কীভাবে কালির প্রয়োজন মেটানো যায় সেটা পরের চিন্তা। কিন্তু যে কদিন কালি ছিল দোয়াতে আমি প্রতিটি হিসেব বিবরণী নির্ভুলভাবে লিখে ফেলেছি খাতায়। যাতে বুঝতে কারো অসুবিধে না হয়।

অর্থাৎ কালির প্রয়োজনটা এক্ষেত্রে যত তীব্র, তেমনি প্রয়োজনীয় আমার কাছে কোদাল, কুড়ুল, বেলচা, সুচ, আলপিন, সুতো ইত্যাদি। সেলাই ফোঁড়াইয়ে ইতোমধ্যেই বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছি। জামা ছিঁড়লে এখন আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সুচ সুতো হাতে বসে যাই।

তবে হ্যাঁ, অনেক কিছু আবার নেইও। সেটা কাজ করতে গেলে মালুম পাই। সে নানান জিনিস। ফলে কাজে অহেতুক দেরি হয়। যেমন একটা শাবল খুব দরকার। নেই। তাই তাঁবু খাটাতে বা মাটি খুঁড়ে মাটি তুলে দেয়াল দিতে সময় লাগল প্রায় দ্বিগুণ। কী করব, অন্যরকম জিনিস দিয়ে যে কাজ করতে হয়। তাতে সময় লাগে বেশি।

মন্দ	ভালো
ভয়ঙ্কর নির্জন দ্বীপে আমি আটকে গেছি। কোনোদিন যে উদ্ধার পাব এখান থেকে সে আশায় ছাই।	কিন্তু জীবিত আছি এটা অনেক বড় কথা। আমার সহযাত্রীদের মতো আমার সলিল সমাধি হয় নি।
এই যে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা এটা আমার কাছে মর্মান্তিক।	বিচ্ছিন্ন সহযাত্রী দল থেকেও। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি এখনো জীবিত। জানি না নিছকই মিথ্যে আশা কিনা। তবে আমার বিশ্বাস পরম করুণাময় ঈশ্বর যে আশ্চর্য উপায়ে আমাকে রক্ষা করেছেন ঠিক একই ভাবে একদিন না একদিন তিনি আমাকে এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ করবেন।
মানব জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। বা বলা যায় নির্বাসিত। মানুষের সঙ্গে আমার আর কোনোরকম যোগাযোগ নেই।	কিন্তু তথাপি না খেয়ে আমাকে দিন কাটাতে হয় না। এমন নয় যে আমি অনাহারে মারা যাব বা কোনোভাবে আত্মরক্ষা করতে পারব না।
জীবনের প্রয়োজনে পোশাকেরও দরকার হয়। আমার সংগ্রহে পোশাক তেমন কিছু নেই।	উষ্ণ আবহাওয়ামণ্ডলে এখন আমার অবস্থান। পোশাক নেই তাই পোশাকের প্রয়োজনটা বেশি করে মনে হচ্ছে। থাকলে হয়তো পরবার প্রয়োজনও বোধ করতাম না।

মন্দ	ভালো
যদি অতর্কিতে কোনো হিংস্র জন্তু বা নরখাদক বর্বরের দল আক্রমণ করে তাকে প্রতিহত করার মতো তেমন কোনো অস্ত্র আমার কাছে নেই।	দরকারও নেই তেমন কোনো অস্ত্রের। ঘুরে ফিরে তো দেখলাম কদিন। বর্বর মানুষ দূরের কথা, হিংস্র জন্তু অব্দি এই দ্বীপে একটিও নেই। আফ্রিকার উপকূলে যদি আমার জাহাজডুবি হতো—সেই যেমন বজরায় চড়ে পালাবার সময় সেবার দেখেছিলাম—তাহলে যে কী দশা হতো ভাবলে শিউরে উঠি।
এমন কেউ নেই যার সাথে আমি কথা বলতে পারি বা কোনো একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।	জীবন নির্বাহ করার প্রয়োজনে কথা বলাটা কি একান্তই দরকার? কথা তো বলে মানুষ প্রয়োজনে। ঈশ্বরের দয়ায় ভাঙা জাহাজ থেকে প্রয়োজন মেটাবার যাবতীয় জিনিস আমি নামিয়ে এনেছি। তাতে শুয়ে বসে কেটে যাবে আমার দীর্ঘ দিন। তবে আর ভাবনা কী!

যেমন ধরুন বড় করাত নেই। আছে একটা ছোট হাত করাত। তা দিয়ে খুঁটি কাটতে হবে মাপ মতো তাঁবুর জন্যে। দুদিন লাগল আমার খুঁটি কটা কাটতে। শাবলের অভাবে একটা গোটা দিন গেল সেগুলোকে মাটিতে শক্ত করে পুঁততে। সে এক রীতিমতো ক্লেশকর অবস্থা। মাথার ঘাম পায়ে ঝরার উপক্রম। তাতে অবিশ্যি দুঃখ নেই আমার। হবেই বা কি দুঃখ দিয়ে। আমি কি এখানে কোনো সরকারি অফিসে কাজ করি যে চৌপহর আমাকে তাগাদা মেরে দু ঘণ্টার কাজ আধ ঘণ্টায় কেউ উঠিয়ে নেবে? নাকি আমার অন্য আরো নানান কিছু করার আছে যার জন্যে সময় আমার বেশি দেওয়া দরকার! দুটোর কোনোটাই না। কাজ বলতে আমার কেবল দুবেলা ভক্ষণ আর খাদ্যের রসদ সংগ্রহ করে আনা। আর বলা যায় সেই সাথে ঘুরে ঘুরে দ্বীপটা ভালো ভাবে দেখা ও চেনা। সুতরাং সময় নিয়ে আমার অত মাথাব্যথা কীসের?

মোটমাট নিজের অবস্থা নিয়ে আমি কিন্তু বেশ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি। লিখেও ফেলেছি আমার বর্তমান অবস্থার বিবরণী। এমন নয় যে এটা কেউ দেখবে সেইজন্যে লেখা। কিংবা আগামী দিনে আমার লেখাটা উদ্ধার পাবে, তখন আমি হয়তো আর বেঁচে থাকব না—সেইজন্যে লেখা। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে যাচাই করার প্রশ্নে। নিজেকে নিয়ে ভাববার প্রশ্নে। ভালো কী কী আমার জীবনে সেটা যেমন বুঝবার প্রয়োজন আছে, মন্দ কী কী এবং কেন সেটাও তেমনি বোঝা দরকার। তা না হলে নিজের প্রকৃত অবস্থা আমি বুঝতে পারব কীভাবে।

আমার পক্ষে ভালো কী আর মন্দ কী তার যে তালিকা করেছি সেটা এইরকম :

মোটামাট ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে এই আমার বর্তমান অবস্থা। এটা যে গভীর দুঃখের জীবন—সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু ভালো যে সব দিক, তার জন্যে নিজের ভাগ্যকে আমি হাজার সেলাম জানাই। হয়তো এই অবস্থা আমার জীবনের ক্ষেত্রে দরকার ছিল। কত দুর্দশায় মানুষ পড়তে পারে। কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত—এ বোধ এরকম অবস্থায় না পড়লে আমি কল্পনাও

করতে পারতাম না। তবে এরই মধ্যে ভালো যেটুকু সেটুকু আমার উপরি পাওনা। কথা তো নয় এই অবস্থায় কোনোরকম ভালোর দেখা পাওয়ার। তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকি।

আর একটা কথা। ভাবি না এই সব নিয়ে আর বেশি কিছু। মাঝে মাঝে ঐ যে দেখার অভ্যেস—কোনো জাহাজের দেখা পাই কিনা—সেটাও ইদানীং বন্ধ করেছি। এখন কেবল নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রশ্ন। এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপার এবং একমাত্র চেষ্টা আমার কীভাবে কত নিপুণভাবে এখানে আমি বেঁচে বর্তে সুস্থ সবল স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারি।

তা আস্তানা তো একটা যা হোক খাড়া করেছি। পাহাড়ের ঢালে তাঁবু একটা। তার চারদিকে খুঁটি গেড়ে তারের বেড়া। কিছুটা অংশ আবার মাটি দিয়ে গাঁথা। অর্থাৎ দেয়াল। এটাকেই বছর দেড়েক ধরে খেটে খুটে কুটিরের আকৃতিতে নিয়ে এলাম। তুললাম চারধার দিয়ে চালা ঘর। কাঠকুটো এটা সেটা দিয়ে ছাওয়া হলো চাল। তাতে একটা সান্ত্বনা—বৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। জল এসে তাঁবুর ভেতর অব্দি ভিজিয়ে দেয় না। সে যা ভয়ঙ্কর বৃষ্টি সেখানে! যখন হুড়মুড়িয়ে নামে আকাশ ভেঙে তখন রীতিমতো ত্রাস ধরিয়ে দেয়।

ঘর হবার পরই আসে ঘর গোছাবার ইচ্ছে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু নেই। গোছাতে গিয়ে দেখি—সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু গুহা সব একেবারে দখল করে রেখেছে। আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে জুড়ে থাকা। তাতে জায়গা হয় না। তার উপর দরকার হলে হাতের গোড়ায় কোনো জিনিস চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কাজ করলে কেমন হয়?—যদি গুহাটা ভিতর দিকে খানিকটা বাড়িয়ে নিই! তবে দরকারী মালপত্র আরো বেশি বেশি করে গুহার মধ্যে রাখতে পারব।

তখন শুরু হলো বাড়াবার কাজ। এমন একটা কিছু পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। ঝুরো বালি মাটি। প্রথমে কাটলাম ডানধার দিয়ে খানিকটা। তারপর ফের আবার তার ডাইনে। দেখি খুঁড়তে খুঁড়তে কাটতে কাটতে সিধে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তা মন্দ কী। এটাকে নয় একটা দরজা করি। বড় মুখটা তো কাঠ দিয়ে আড়াল। থাক ঐ ভাবেই। এই দরজা দিয়েই নয় ঢুকব বের হব।

খিড়কি দোর নাম দিলাম সেই দরজাটার। কিছুটা পেছন দিকে ঘেঁষা তো তাই। ঢুকলে মালপত্র যেখানে রেখেছি সিধে সেখানে। জায়গাও বিস্তর। তখন সেখানে আরো অনেক মাল এনে জড় করলাম।

কিন্তু দরকার আপাতত একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। নইলে বড্ড অসুবিধে। বসতে পারি না দুদণ্ড। মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে খেতে কষ্ট হয়। লিখতে বসতেও বিশ্রী লাগে। মোটমাট খেতে পেলে শুতে চাওয়া যে রকম আমারো এখন একটু আরামের দরকার।

শুরু হলো কাজ। কিন্তু সে কি আর চাট্টিখানি কথা! প্রথমত যন্ত্রপাতির অভাব। দ্বিতীয়ত এসব কাজ করার অভ্যেস আমার কোনোদিনই নেই। এরও তো একটা হিসেব আছে রে বাপু। জানি আমি সেই হিসেব? কাঠ কাটি, মেলাতে যাই, দেখি ত্যারা-ব্যাঁকা হয়ে সে যাচ্ছেতাই চেহারা। তখন সেটা বাতিল করে ফের নতুন আরেক খণ্ড কাঠ নিয়ে কাজে লাগি। তা কাঠ কি আর আমার জন্যে কেউ নিয়ে ঘঁষে মেজে নিপুণ করে রেখেছে। তখন কাঠের দরকারে গাছ কাটতে হয়। সেটাকে করাত দিয়ে ফালি করতে হয়। করতে গিয়ে দেখলাম হয়তো বড্ড পাতলা হয়ে গেল। কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পুরু। তখন ঘষো তাকে, পাতলা কর—সে এক ঝঞ্ঝাটই বলা যায়।

তবে তাতে সাময়িক অশান্তি হয় ঠিকই কিন্তু মজাও পাই। সময়ের তো এখানে আমার কোনো মূল্য নেই। কোনো কাজে বেশিক্ষণ লাগলে কেউতো আর জবাবদিহি চাইবে না। তো ভাবনা কীসের। বিস্তর খাটাখাটি করে অনেক দিন পরে বানালাম চেয়ার আর টেবিল। অমনি কটা তাকও তৈরি করলাম। সেটা অবশ্যি কম ঝঞ্ঝাটের। কেননা জাহাজ থেকে আনা চেরা কাঠগুলো সঙ্গেই ছিল। গুহার দেয়ালে তাই থাকে থাকে বসিয়ে দিলাম। নিচে দিলাম মস্ত বড় বড় পেরেক আটকে। আর চিন্তা কীসের। মাল রাখব এবার থেকে এইসব তাকে। সাজালাম তাক। দরকারী যাবতীয় জিনিস এনে রাখলাম। হাতের গোড়ায় বলতে যা বোঝায় আর কি। সে ভারি আনন্দ। খুঁজতে হয় না মোটে, জিনিস হাতড়াতে হয় না, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।

আর টেবিল চেয়ার দুটোই যখন আছে, তখন লিখতে বসতেই বা অসুবিধা কি। শুরু হলো লেখা। একে বিবরণী বলাই ভালো। আমি তো আর লেখক নই। ঘটনা যেমন যেমন ঘটছে বা ঘটেছে, আমি লিখে রাখছি পর পর। নথিবদ্ধ করা বলতে যা বোঝায়। হয়তো এইভাবে শুরু করলে ভালো হতো : '৩০ সেপ্টেম্বর। অনিবার্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমি ডাঙ্গায় উঠিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার কথা সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় নাই। কেননা পাকস্থলীতে প্রভূত পরিমাণে লবণাক্ত জল। প্রথম কাজ সেগুলি বমি করিয়া বাহির করা। তাহাই করা হইল। কিছুটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। তখন মনের মধ্যে কেবলই অনুতাপ আর দুঃখবোধ। এ কোথায় আসিলাম আমি! কী আমার পরিণতি! অবোধ বালকের মতো তখন কেবলই ক্রন্দন আর অশ্রুপাত। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন জ্ঞান হারাইয়াছি জানি না। জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম আমি ঘাসের উপর শুইয়া আছি। শরীর প্রচণ্ড দুর্বল। চোখ যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে চায়। কিন্তু অদূরে যে বনরাজি দেখিতেছি—উহাতে কি হিংস্র কোনো জন্তু আছে? আমাকে কি অতর্কিতে আসিয়া গ্রাস করিবে? সেই ভয় লইয়াই আমি একটু পরে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।

সম্ভব হয় নি এভাবে আমার পক্ষে লেখা। ভাষার এত কারিকুরি আমার জানা নেই। সাদা-মাটা ভাবেই লিখেছি যেমন কলম এগিয়েছে ঠিক তেমনি। ভাঙা জাহাজ থেকে দিনের পর দিন নানান জিনিসপত্র নিয়ে আসার বিবরণ যে ভাষায় আছে, একই ভাষায় বলা হয়েছে আমার হতাশার কথা—যখন বারে বারে পাহাড়ের মাথায় উঠে একটাও জাহাজ না দেখতে পেয়ে দুঃখে বেদনায় আকুল হৃদয়ে শিশুর মতো আমি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছি। তা-ও।

মোটমাট আমি যে কথাটা বোঝাতে চাই—সহজ সরল অনাড়ম্বর আমার এই বিবরণী। ৩১ তারিখ থেকেই শুরু। যদিও আরম্ভ করেছি অনেক পরে। টেবিল চেয়ারে আর কোনো অসুবিধে নেই। কাগজও বেশ কিছু আছে। তবে কালিটাই যা সমস্যা। শেষ হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে আমি জানি। তারপর আর লেখার কোনো উপায় থাকবে না। তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখা যাক, কবে ফুরোয় আর কতখানি অব্দি আমি লিখতে পারি।

বিবরণী

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ ॥ হতভাগ্য আমি। রবিনসন ক্রুসো আমার নাম। ঝড়ের মুখে পড়েছিল আমাদের জাহাজ। ছন্নছাড়া বিপর্যস্ত। রক্ষা পেয়েছি কোনোক্রমে। উঠেছি এসে এই দ্বীপে। এও এক হতভাগ্য দ্বীপ। এর নাম দিয়েছি আমি হতাশার দ্বীপ। আমার

সহযাত্রীরা কেউ আর বেঁচে নেই। জলের বুকে তলিয়ে গেছে কে কোথায় কে জানে। একলা আমিই কোনোক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি।

সারাটা দিন এই নিয়ে আমার কী অনুতাপ। আর কত অশ্রুবর্ষণ। এ কোথায় এলাম! খাব কী আমি? জামা কোথায়, বাড়ি কোথায়! থাকব কোনখানে? কী পরব? অস্ত্রও তো নেই যে বাঁচাব নিজেকে। কত হিংস্র জন্তু আছে, কে তার খোঁজ রাখে। নরখাদক মানুষও তো থাকতে পারে। হয়তো অনাহারে মরতে হবে আমাকে। এই সব চিন্তা একের পর এক। শেষে রাত ঘনিয়ে এল। তখন একটা গাছের উপর উঠে শক্ত করে ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লাম। কী যে শান্তি! সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির মধ্যেই আমি অঘোরে ঘুমোলাম।

১ অক্টোবর ॥ ঘুম থেকে উঠে দেখি অবাক কাণ্ড! আমাদের জাহাজটাকে ঠেলতে ঠেলতে ঢেউ এনে কূলের কাছে বালির চড়ায় তুলে দিয়ে গেছে। কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। তবে ডাঙ্গা থেকে সে অনেকখানি দূর। আর চারধারে জল। সান্ত্বনা এই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি বা উল্টে পড়ে নি। তার মানে মালপত্র যা ছিল জাহাজে সবই ঠিকঠাক আছে। মনে খানিকটা ভরসা পেলাম। নিজের দরকার মতো খাবার দাবার তাহলে নিয়ে আসা যাবে। সাথীদের কথা ভেবে বুকটা যেন ভেঙে গেল আমার। তড়িঘড়ি ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যদি থাকতাম জাহাজে তবে হয়তো এ দশা আজ হতো না। পারতাম যেন-তেন-প্রকারে জাহাজ সমেত নিজেদেরকেও রক্ষা করতে। যদি জাহাজ যেত ভেঙে, তাতেই বা পরোয়া কী। রইলাম তো আমরা সবাই জীবিত। ভাঙা জাহাজের কাঠ কুটো দিয়ে নয় বানিয়ে নিতাম ডিঙি। তাতে করে সমুদ্রে পাড়ি জমাতাম। এই সব নানান চিন্তা ভরে রাখল মন। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে জাহাজের কাছে। দেখি শুকনো একদম, খটখটে। তখন সাঁতার কেটে ঘুরে পেছনধার দিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলাম। আজও বৃষ্টির কামাই নেই। তবে সান্ত্বনা এই, হাওয়ার দাপট আজ কম।

চব্বিশ তারিখ অব্দি আমি ভীষণ ব্যস্ত। বারে বারে প্রায় প্রতিদিনই একবার করে জাহাজে যাই। নিয়ে আসি যা চোখে পড়ে সব। ভেলায় করে। বৃষ্টি আছে। তবে মাঝে মাঝে আকাশ পরিষ্কার হয়। এটা বর্ষাকাল।

২৪ অক্টোবর ॥ আজ ভেলাটা উল্টে গেল। নিজের ভুল বলব না, আসলে স্রোতের টানে পড়ে টাল সামলাতে পারি নি। জিনিস-পত্র সব গেল জলে। আমিও জলে হাবুডুবু খেতে খেতে সামলে নিলাম। তবে গভীর জল নয়। লোহালক্কড় জাতীয় যা যা ছিল তা ছাড়া বাকি সব হাতড়ে উদ্ধার করলাম। অনেক কিছু জলের নিচেই রয়ে গেল।

২৫ অক্টোবর ॥ সারাদিন সারারাত ধরে আজ বৃষ্টি। সঙ্গে বাতাসের দাপট। কোথায় যে ভেসে গেল জাহাজ, না কি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল তাই বা কে জানে। বাতাসও একটু একটু করে বাড়ছে। আজ আর বাইরে বের হলাম না। সামলে সুমলে রাখলাম মালপত্র। সেটাই আজকের প্রধান কাজ। বৃষ্টির হাত থেকে তো সব কিছু রক্ষা করতে হবে।

২৬ অক্টোবর ॥ সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম আজ আস্তানা কোথায় করা যায় তার খোঁজে। রাত্রে নিরাপদে ঘুমোতে হবে। তা ছাড়া হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাটাও বড় কথা। পেলাম মনের মতো জায়গা বিস্তর ঘোরাঘুরির পর। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। মোটামুটি যা চাই আমি সেইরকম। মাটির একটা দেওয়াল তুলব

চারদিকে। তার ওপরে তারের বেড়া। ব্যস, আর আমাকে পায় কে। কে আর আমার নাগাল পাবে।

২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর ॥ নতুন আস্তানায় এনে তুললাম যাবতীয় জিনিসপত্র। কটা দিন এতে কেটে গেল। বৃষ্টি হলো মাঝখানে খানিকটা। তবে সে নাম মাত্র। আমার কাজ বন্ধ করার মতো কিছু নয়।

৩১ অক্টোবর ॥ ভোরবেলা বের হলাম বন্দুক কাঁধে। দুটো মতলব আমার। শিকার করে খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করা আর এই ফাঁকে যতখানি সম্ভব দ্বীপের চারধার ঘুরে দেখে আসা। এক ধরনের অভিযান বলা যায়। শিকার বলতে পেলাম একটা ছাগল। সঙ্গে তার বাচ্চা। বাচ্চাটাকে কোলে করে গুহায় নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম পুষব। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। কিছু খেতে চায় না সে। তখন তাকেও মেরে ফেলতে হলো।

১ নভেম্বর ॥ গুহার সামনা সামনি পাহাড়ের ঢালে একটা তাঁবু খাটালাম। সেখানেই কাটালাম রাত। বেশ বড় সড়। জায়গা বিস্তর। মালপত্র সব রাখলাম চার ধারে টাল দিয়ে।

২ নভেম্বর ॥ আজ বেড়া বাঁধার কাজ শুরু। ভেলা বানিয়েছি যত কাঠ দিয়ে সব জড় করে খুঁটি গেড়ে সেগুলো পেরেক পুঁতে আটকে দিলাম। বেশ মজবুত হলো। সঙ্গে তারের টানা দেওয়া। নিরাপদই বলা যায়।

৩ নভেম্বর ॥ বন্দুক নিয়ে আজও বেরলাম ভোর সকালে। দুটো মুরগি মারলাম। দেখতে অদ্ভুত। অনেকটা পাতিহাঁসের মতো। মাংস অতি সুস্বাদু। বিকেলে টেবিল বানাতে বসলাম।

৪ নভেম্বর ॥ কাজের ব্যাপারে এবার একটা শৃঙ্খলা দরকার। অর্থাৎ নিয়মমাফিক এবার থেকে চলতে হবে। এইভাবে সাজালাম সারাদিনের হিসেব।—সকালে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ঘুরব দু থেকে তিন ঘণ্টা। বৃষ্টি হলে সেটা অবশ্যি বন্ধ থাকবে। ফিরে এসে বসব টুকিটাকি কাজ নিয়ে। চলবে এগারোটা অব্দি। তারপর দুপুরের খাবার খাব। বারোটা থেকে দুটো অব্দি একটানা ঘুম। এটা দরকারও। কেননা প্রচণ্ড গরমে দুপুরে বসে কাজ করা দায়। বিকেলে ফের বসব কাজ নিয়ে। মোটমাট টেবিলটা আমাকে বানাতেই হবে। পাকা ওস্তাদ তো আমি ছুতোরের কাজে! কিছুতেই আর হিসেবমাফিক কিছু করে উঠতে পারি না। তবে সে যাই হোক। কাজটা যেভাবে হোক শেষ করতে হবে।

৫ নভেম্বর ॥ কাঁধে বন্দুক, পেছনে পেছনে আসছে কুকুর—যথারীতি আমি ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বেরিয়ে পড়লাম। একটা বন বিড়াল মারলাম গুলি করে। বেশ তুলতুলে নরম চামড়া, কিন্তু মাংস একেবারে বিস্বাদ। মুখে মোটে টেকাতেই পারি না। যা বিশ্রী তার স্বাদ! ফেলে দিলাম সব। তবে চামড়াটা নয়। চামড়া আমি সব কটাই রেখে দিই। যখন যে জীব মারি প্রত্যেকের! এলাম সমুদ্রের ধারে। দেখি এক ঝাঁক মোরগ। এদের ধরন আলাদা। সম্ভবত সামুদ্রিক জীব। আর দেখি দুটো শীল মাছ। বাপরে হঠাৎ দেখে আমার যা ভয়! দেখি নি সাক্ষাৎ আগে কোনোদিন। তবে ভয় তারাও কিছু কম পায় নি। একটু পরে সুড়সুড় করে জলের নিচে তলিয়ে গেল।

৬ নভেম্বর ॥ প্রাতঃভ্রমণের পর যথারীতি টেবিল নিয়ে কাজে বসলাম। আজ শেষ করতেই হবে। বহু কষ্টে শেষ হলো। তবে সে এক বিতিকিচ্ছিরি চেহারা। মোটে পছন্দ হলো না আমার নিজেরই। তবু কী আর করা—যাহোক হলো তো একটা টেবিল!

৭ নভেম্বর ॥ আবহাওয়া আপাতত বেশ চমৎকার। ১২ তারিখ অব্দি ক'দিন ধরে একটানা চলল আমার চেয়ার বানাবার কাজ। বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করে সেটাকে মোটামুটি একটা চেহারায় আনা গেল। তবে ঐ—আমার নিজেরই অপছন্দ। তা-ও তো কতবার কতরকম বদলা বদলি করলাম। হ্যাঁ, ভালোকথা। রবিবারের হিসেব রাখতে মাঝখানে হঠাৎ একদিন ভুল হয়ে গেছে। সেই থেকে বে-হিসেবেই চলছে রবিবারের দিনটা। তা নিয়ে অবিশ্যি আমার বিশেষ মাথাব্যথাও নেই।

১৩ নভেম্বর ॥ বৃষ্টি হলো ঝমঝমিয়ে। তাই শান্তি। কী যে গরমে হাঁসফাঁস করেছি কটা দিন! সঙ্গে বজ্র বিদ্যুতের দাপাদাপি। তাতে করে খানিকটা বারুদে আগুন ধরে গেল। হায় হায়, সে যা দুঃখ আমার! তখন বসে বসে ছোট ছোট অনেকগুলো পুরিয়া বানালাম। বাকি যা বারুদ আছে তাই দিয়ে। তখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার এত দরকারী জিনিস—সব একসাথে পুড়ে নষ্ট হবার আর তো সুযোগ রইল না।

১৪-১৬ নভেম্বর ॥ বিস্তর ছোট ছোট চৌকোনা কাঠের বাক্স বানালাম তিনদিন ধরে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। একেকটার আকৃতি একেক রকম। কোনোটাতে ধরবে এক পাউন্ড বারুদ। কোনোটাতে দু পাউন্ড। পুরিয়াগুলো ফের ভেঙে আলাদা আলাদা করে বাক্সে ভরলাম। রাখলাম গুহার একদম ভিতর দিকে। সম্পূর্ণ নিরাপদ এবার। একটা পাখি মারলাম বড়সড়। কী পাখি জানি না। তবে মাংস খুব সুস্বাদু। কদিন বেশ আয়েস করে খাওয়া গেল।

১৭ নভেম্বর ॥ গর্ত খুঁড়ে গুহাটাকে আরো বড় করার কাজ আজই শুরু হলো। কিন্তু সে কি আর শুধু হাতে পারা যায়! ঢাল নেই তলোয়ার নেই ... এক্ষেত্রে ঢাল তলোয়ার বলতে একটা শাবল, বেলচা একটা, আর ঝুড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু। কিছুই তো নেই। তখন কাজ বন্ধ করে বসলাম প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম বানিয়ে নিতে। ছিল লোহার একটা মস্ত আংটার মতো। সেটাকেই সিধে সাধা করে বানানো হলো শাবল। কিন্তু বেলচা বানাব কী দিয়ে? নেহাৎ কোদাল হলেও চলত। কিন্তু বানাবার যেকোনো উপকরণ নেই।

১৮ নভেম্বর ॥ বের হলাম ভোরবেলা যথারীতি। আজ সিধে জঙ্গল। কাল রাতেই ভেবে রেখেছি আমি মতলবটা। লোহার অভাবে এক্ষেত্রে কাঠ দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে নেব। তা খুঁজতে খুঁজতে দেখি সঠিক জিনিসটিই একেবারে চোখের গোড়ায়। মস্ত একটা গাছ। ব্রাজিলে এই গাছের কাঠকে বলে লোহা কাঠ। লোহারই মতোন শক্ত আর সেই অনুযায়ী ভারী। মোটাসোটা দেখে একটা ডাল কাটব বলে মনস্থির করলাম। কিন্তু সে কি আর সহজে পারা যায়! কুড়ুল মোটে বসতে চায় না। ভোঁতাটোতা হয়ে সে তো যাচ্ছে তাই অবস্থা। সে যাই হোক, ডাল অবশেষে কাটা গেল। নিয়ে যাব কাঁধে করে। পারি না তুলতে। যা প্রচণ্ড ভারী! বহুকষ্টে অবশেষে খানিকটা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে খানিকটা বয়ে সেটাতে তাঁবুর সামনে এনে ফেললাম।

আর তাকে কেটেকুটে মাপ মতোন করা, তাই দিয়ে বেলচা বানানো—সে যে কী ঝামারি ব্যাপার তা আপনারা আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন। তবু পারলাম শেষ অব্দি। এটাই যা সান্ত্বনা। হাতলটা হাতলের মতোই হলো। অবশ্যি লোহার একটা বেড় মতো থাকে, সেটা বাদ। বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না। আসলে জোরটা তো হাতলের উপরই পড়ে। তবে কাজ চালাবার পক্ষে চমৎকার। এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

বহুকষ্টে অবশেষে খানিকটা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ...

এবারে দরকার একটা ঝুড়ি। অথবা একটা ছোট চার চাকার গাড়ি। ঝুড়ি বুনবার জন্যে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলাম কদিন। বেত তো নেইই, উপরন্তু এমন কোনো গাছ নেই যার কচি ডাল দুমড়ে মুচড়ে গোল করে ঝুড়ি বোনা যায়। সেক্ষেত্রে চাকার গাড়িটা তবু খানিকটা সম্ভব। সব পারব শুধু চাকা বাদে। কেননা চাকার জন্যে লাগবে লোহা। লোহার ডাণ্ডাটা লাগানো থাকবে গাড়ির নিচে, তার সঙ্গে লাগানো থাকবে চাকা। কীভাবে লাগাব? কোথায় বা পাব লোহার ডাণ্ডা? সুতরাং এটাও আপাতত খারিজ? তখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাঠের মস্ত চেটানো থলো মতো বানালাম। এতে করে দেখেছি মিস্ত্রী মজুরেরা বাড়ি তৈরির সময় চুন সুরকি মাখা লেই বয়ে নিয়ে যায়। সে যাই হোক। আমার কাজ তো এতে চলবে।

মোটমাট চারদিন লাগল আমার এই সব বানাতে। উদয়াস্ত বলতে গেলে খাটুনি। শুধু সকালের প্রাতঃভ্রমণটুকু বাদ। এটা আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি না পড়লে বন্ধ হয় না। বন্দুক ঘাড়ে ঘুম থেকে উঠেই ঠিক রোজকার নিয়ম মতো বেড়িয়ে পড়া। তাতে লাভও প্রচুর। ফেরার সময় প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিকার আমার সঙ্গে থাকে।

২৩ নভেম্বর ॥ অন্য সব কাজ এখন বরবাদ। শুধু নতুন তৈরি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গুহার আয়তন বাড়াবার কাজ। লাগল মোট আঠারো দিন। আগে যতটুকু জায়গা ছিল গুহায়, এখন তার প্রায় দ্বিগুণ।

মোটামুটি এতখানি বাড়াব এই মন নিয়েই আমি কাজ শুরু করেছিলাম। একাধারে আমার ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, রান্নাঘর, আর তাক। সব আমি গুহাতেই করতে চাই। নিজে এখানে থাকব না, শোবো রাত্তির বেলা তাঁবুতেই। কিন্তু মালপত্রগুলো তো সব রাখতে পারব। তাতে শুকনো থাকবে, ভাঙবার ভয় নেই, এমন কি আগুনে পুড়বারও। তবে তাঁবুতে বৃষ্টি বেশি হলে ধার দিয়ে জলের ছাঁট আসে। এটা অস্বস্তিকর। তখন চার

পাশে কখনো খুঁটি গেড়ে কাঠকুটো পাতা দিয়ে চালা মতো একটা তুললাম। বারান্দাও বলতে পারেন। ঢাকা বারান্দা। তবে নিশ্চিন্ত। যাক, বৃষ্টির হাত থেকে তো রক্ষা পাওয়া গেল।

১০ ডিসেম্বর ॥ গুহা বাড়াবার কাজ শেষ, হঠাৎ একদিন একটা অংশ থেকে খানিকটা মাটি ধসে পড়ল। আমি তো থ। ভয়ও পেয়ে গেছি খুব। যদি থাকতাম আমি এখন ঐ অংশে! তবে তো জ্যান্ত কবর। নতুন করে কবর খুঁড়ে মৃতদেহ শোয়াবার আর ব্যবস্থা করতে হতো না। (অবিশ্যি এই বিজন বিভুঁয়ে কে-ই বা করবে সে ব্যবস্থা!) সে যাই হোক, কাজ খানিকটা বাড়ল। মাটি তুলে ফেলে দিলাম বাইরে। ছাদটাকেও মেরামত করা দরকার। মোটমাট নিশ্চিন্ত হতে চাই, এরকম ধস ভবিষ্যতে আর কখনো নামবে না।

১১ ডিসেম্বর ॥ মেরামতির কাজে আজ থেকেই লেগে পড়েছি। একদিনে হবার নয়। ঝামেলা যে অনেক। লাগল মোট সাতটি দিন। খুঁটি গাড়লাম ভিতরে বেশ কয়েকটা। খুঁটির মাথায় চেরা কাঠ দিলাম সেঁটে। এইভাবে বলতে গেলে আগাগোড়া ছাদটাই। তাতে এক ঢিলে দু পাখি মারা হলো। ছাদের সুরক্ষা, সেই সাথে খুঁটি দিয়ে ঘরের মধ্যে মোটামুটি একটা ভাগাভাগি মতো। অর্থাৎ এ খুঁটি থেকে ঐ খুঁটি অব্দি রান্নাঘর। ওটা থেকে ঐটা অব্দি ভাঁড়ার। এই রকম।

১৭ ডিসেম্বর ॥ ২০ তারিখ অব্দি একনাগাড়ে করলাম তাক লাগাবার কাজ। খুঁটির গায়ে পেরেক পুঁতলাম একরাশ। সব জিনিস তো আর বসিয়ে রাখা যাবে না, কিছু কিছু ঝুলিয়ে রাখারও দরকার হবে। তা হলো সে ব্যবস্থা। এবার খিড়কি দোরটার দিকে নজর দিতে হবে।

২০ ডিসেম্বর ॥ যাবতীয় মালপত্র গুহায় নিয়ে এলাম। এবার সাজিয়ে রাখবার পালা। আরো কটা তাক লাগাতে হলো। এদিকে চেরা কাঠের টানাটানি। কত আর থাকতে পারে, সবই তো মোটামুটি এটা নয় ওটা নানান কাজে লাগানো। ইতোমধ্যে আরেকটা টেবিলও বানিয়েছি।

২৪ ডিসেম্বর ॥ আজ সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। চলল সারারাত। আমি বাপু গুহার মধ্যে গুটিসুটি মেরে সারাদিন বসা। বাপরে বাপ, এই বৃষ্টিতে কোনো সুস্থ মানুষ বের হতে পারে!

২৫ ডিসেম্বর ॥ সারাদিন আজও বৃষ্টি।

২৬ ডিসেম্বর ॥ বৃষ্টি আজ আর নেই। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বেশ চমৎকার লাগছে।

২৭ ডিসেম্বর ॥ একটা ছাগল মারলাম। আরেকটার পায়ে লেগেছে গুলি, যথেষ্ট জখম, আমি গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে তাঁবুতে নিয়ে এলাম। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। দেখি পা-টা ভেঙেছে। লতা পাতা দিয়ে বাঁধা ছাদা করে দিলাম। সারল ধীরে ধীরে পা। পোষও মানল। না মেনে উপায় কী। এতদিন ধরে এত সেবা, এত যত্ন, তার তো একটা প্রতিদান বলেও জিনিস আছে! ঘাস খেত কুচকুচ করে। আমার তাঁবুর সামনেই তো কত ঘাস! যেত না কোথাও। দেখে দেখে আমারও মনে খেলে গেল নতুন মতলব। তাই তো এমন কয়েকটা জীব ধরে এনে পোষ মানালে কেমন হয়! ঘরের থেকে তো আর কিছু দেবার দরকার হবে না। বরং বারুদ ফুরিয়ে গেলে এরাই আমার দিনের দিন অন্ন যোগাবে।

২৮-৩০ ডিসেম্বর ॥ ভীষণ গরম। একটুও হাওয়া নেই। প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত। গাছের পাতা একটু নড়ে না পর্যন্ত। বিকেলে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে আমি শিকারের অন্বেষণে বের হই। আর সারাদিন ছায়ায় বসে দরজা তৈরি নিয়ে খুটখাট করি।

১ জানুয়ারি ॥ প্রচণ্ড তাপ। কমে নি একটুও। ভোর সকালে বেরিয়ে যাই, সূর্য উঠতে না উঠতে ফিরে আসি। ফের বের হই বিকেলে। দুপুরে চিৎপটাং বিছানায় শোয়া। আজ বিকেলেই একটা নতুন আবিষ্কার হলো। পাহাড়ের ওপাশটায় চলে গিয়েছিলাম। দেখি মনোরম এক উপত্যকা। সেখানে প্রচুর ছাগল ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। বড় লাজুক তো ওরা। আমাকে দেখা মাত্র সে যা ছুট! কাল কুকুরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। গুলি না চালিয়ে দেখি একটাকেও ধরতে পারি কিনা।

২ জানুয়ারি ॥ আজ সাথে কুকুর নিয়ে এসেছি। লেলিয়ে দিলাম। দেখি উল্টো ব্যাপার। শিং উঁচিয়ে দল বেঁধে সবাই এককাট্টা হয়ে দাঁড়াল। কুকুর মশাই তো হতভম্ব। এমন যে হতে পারে আমার মতো সেও তো আশা করে নি। দেখি মানে মানে পিছু হটতে লেগেছে।

৩ জানুয়ারি ॥ মাটির দেয়াল আর তারের বেড়াটা নিয়ে ফের উঠে পড়ে লেগেছি। কেবলই মনে ভয় পাছে কেউ যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে। মোটমাট আরো পুরু করতে হবে দেয়াল এবং আরো পোক্ত।

[১৪ এপ্রিল অব্দি একটানা দেয়াল নিয়ে লেগে রইলাম। অন্য কিছু করার সময় আর মোটে করে উঠতে পারি না। এমন একটা বিরাট কিছু নয়। মাত্র ২৪ গজ লম্বা ঘোরানো দেয়াল। একদিক থেকে অপরদিক চওড়ায় মাত ৮ গজ। তাঁবু আর গুহা দুটোই দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে। গুহার দরজাটা ঠিক মাঝ বরাবর।]

সে একেবারে উদয়াস্ত খাটুনি। মাঝখানে হপ্তা বলতে গেলে একটানা বৃষ্টি হলো। তাতে ক্ষতি হলো কাজের। কিন্তু আমারো সেই এক গোঁ।—যেভাবে হোক, দেয়ালটা গড়ে তুলতেই হবে। এটা আমার নিরাপত্তার জন্যে একান্ত দরকার। জঙ্গল থেকে কাঠের খুঁটি কেটে আনা থেকে শুরু করে মাটি কাটা, মাটি তোলা, তাকে কাদা করা—সব এই দু হাতে। এ যেন অসাধ্য সাধনের মতো ব্যাপার।

তা দেয়াল যখন শেষ হলো, আমি স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হয়েছে বেশ খানিকটা উঁচু। এমনকি জাহাজ যদি আশেপাশে আসে, হঠাৎ দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এটা পাহাড়েরই অংশ না আর কিছু। মনুষ্য-বসতির বিন্দুমাত্র লক্ষণ তাদের নজরে পড়বে না। না পড়ুক। আমিও সেটাই চাই।

তাই বলে কাজে যেহেতু ব্যস্ত, ভাববেন না, রোজকার শিকার করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু বৃষ্টি হলে যা অন্য ব্যবস্থা। আর বের হলে সে যে কত নতুন নতুন আবিষ্কার। এক একটা আবিষ্কার হয় আর প্রাণ মন আনন্দে নেচে ওঠে। একদিন দেখি এক ঝাঁক বন-পায়রা। তারা গাছে থাকে না, পাহাড়ের গায়ে ফাঁক ফোকরে বাসা বেঁধে বাস করে। একদিন কয়েকটা ফোকরে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে এলাম কটা বাচ্চা। পুষলাম। বড় হলো। ওমা, দেখি একদিন ফুড়ুৎ। সে যা দুঃখ আমার! অবিশ্যি ওদের দোষ নেই। খাবার তো কিছু দিতে পারি না। কদিন আর পারে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে! তা আমিও হাল ছাড়বার পাত্র নই। ফোকরে হাত গলিয়ে প্রায়ই নিয়ে আসতাম একটা কি দুটো বাচ্চা। কদিন পুষে তারপর কেটে কুটে খেতাম। অপূর্ব সুস্বাদ মাংস।

অর্থাৎ বলা যায় ইদানীং আমি নিজেকে নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত। ঘর গেরস্থালি সাজানো থেকে শুরু করে রান্না-বান্না সব এই দুহাতে। কিন্তু নানান জিনিস যে এখনো আমার

দরকার। প্রয়োজন যে একটু একটু করে বাড়ছে। যেমন জল রাখবার একটা কুঁজো বা কলসি আমার অবিলম্বে চাই। কোথায় পাব কলসি? বর্ষাবাদলের দিনে ঘরে আগে থেকে জল তুলে না রাখলে বড় অসুবিধে হয়। চেষ্টা করলাম বিস্তর। প্রথমে মাটি দিয়ে, তারপর কাঠ দিয়ে। কিছুতেই আর হয়ে উঠে না। যেমন ভাবে বানাই, কোথাও না কোথাও চুঁইয়ে পড়ার একটা জায়গা থেকে যায়। তাই দিয়ে পড়ে যায় সব জল। তখন বাধ্য হয়ে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করলাম।

বাতিরও খুব দরকার বোধ করি। বাতির অভাবে সন্ধ্যে লাগতে না লাগতে আমাকে শুয়ে পড়তে হয়। সাতটা বাজে তখন মোটে। খানিকটা মোম পেলেও চলত। সেই যেমন আফ্রিকায় ছিল সঙ্গে, তাই দিয়ে নৌকোয় জ্বালাতাম বাতি। এখন অবিশ্যি খানিকটা চর্বি সম্বল। সেই একটা ছাগল মেরেছিলাম, তারই চর্বি জমিয়ে রেখেছি। রোদে নিয়েছি শুকিয়ে। বানিয়েছি মাটি দিয়ে একটা ছোট্ট থালা। তাতে শুকনো চর্বি রেখে তার মধ্যে দিয়েছি একটা ন্যাকড়ার পলতে। তাতেই জ্বলে বাতি। আলো অবিশ্য তেমন একটা জোরাল নয়, তবু কাজ চলে আমার।

ইতোমধ্যে আর এক কাণ্ড। একদিন জাহাজ থেকে আনা এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা থলি, তাতে কিছু শস্য দানা। এগুলো মুরগির খাবার। আমাদের জাহাজের সঙ্গেই এসেছে। তবে এ যাত্রায় জাহাজে মুরগি ছিল না। ছিল আগের যাত্রায়। তারই উদ্বৃত্ত খাবার পড়ে ছিল হয়তো থলিতে। কেউ খেয়াল করে নি। তাতে ইঁদুর মহারাজদের পোয়াবারো। খেয়েছে প্রাণ ভরে যত খুশি। তা তাঁবুতে সেই থলিটা খুলে দেখি কিছু খোসা আর আধ খাওয়া দানা। কী হবে এ সব রেখে? ফেলে দিলাম ঝেড়ে তাঁবুর সামনের উঠোনে। থলিটা তখন আমার খালি করা একান্ত দরকার। বারুদ রাখব। তারপর আর সেই দানার কথা আমার মনে নেই।

মাঝখানে কদিন টানা বৃষ্টি গেল। তারও প্রায় মাস খানেক পর। হঠাৎ একদিন চোখ পড়তে দেখি—বা রে বাঃ! সবুজ সবুজ কটা চারা যে বেরিয়েছে। সে কী আনন্দ আমার! গুনে দেখলাম সব মিলিয়ে মোট বারোটা। সবই যব গাছ। আমাদের ইংল্যান্ডে এই জাতের যব হয়।

শুধু আনন্দ বললে কম বলা হয়, যতটা আনন্দ ঠিক ততখানিই যেন বিস্ময়। সত্যি বলতে কি, আমার প্রায় হতবাক মূক বিমূঢ় অবস্থা তখন। কী বলব একে—ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কী অন্য কিছু একে বলা যায়? কিন্তু আমি তো ঈশ্বরকে একবারও ডাকি নি। এই কদিনে একবারও স্মরণ করি নি তার নাম। ধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমার তেমন একটা আসক্তি বা আগ্রহ নেই। তবে কেন আমার মতো মানুষের প্রতি তাঁর এত দয়া! ঐ যে বলে—সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর—একি তাঁরই প্রতিরূপ! হয়তো মানস চক্ষে দেখেছেন তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্যে এখানে এই ছন্নছাড়া দ্বীপে আমার কিছু খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। আচমকা তারই ব্যবস্থা করে দিলেন।

চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন আমার। আনন্দের অশ্রু। আমি ধন্য। প্রকৃতির তথা ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ অযাচিত ভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। শুধু যব নয়। পরে দেখি কটা ধানচারাও আছে ওর মধ্যে। একই সাথে দুরকমের খাদ্য। চোখে যে জল আসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

অবাক হয়ে এখনো ভাবি সেই সব কথা। মঙ্গলময় ঈশ্বরের অসীম করুণা পরম। তার প্রমাণ আমি আরো অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি। যেমন ধরুন সেই থলি ঝেড়ে ফেলা। যদি ফেলতাম সেটা কোনো মুক্ত জায়গায়, তবে রোদে পুড়ে কবে খাক হয়ে যেত।

ঈশ্বরের অজ্ঞাত নির্দেশে আমি ফেলেছি তা পাথরের আড়ালে ছায়াময় স্থানে। সেখানে জল বুকে নিয়ে প্রাণ পেয়েছে বীজ। একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। তাতে ধান হয়েছে যব হয়েছে আর কী চাই আমার। আমি কৃতার্থ।

জমিয়ে রেখে দিলাম প্রতিটি দানা। থাক আপাতত মজুত। লাগাব ফের বর্ষাকালে। অর্থাৎ জুনে। তা থেকে যা ফসল পাব—এবার তো আর আগের মতো দুটো চারটে হবে না, হবে অজস্র, তা দিয়ে রুটি গড়তে পারব, বাকিটা জমিয়ে রাখলে হবে আমার ভবিষ্যতের সঞ্চয়। তা এই সব হিসেব করে সময় মেপে বীজ ফের পরের মরশুমে ছড়িয়ে দিলাম। সবটা নয় অবিশ্যি। কিছুটা। গেল সব নষ্ট হয়ে। সময় হিসেব করতে ভুল হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে সব গেল ছারখার হয়ে। এমনিভাবে চার বছর পার হতে তবে আমি নিজের খাদ্য নিজে চাষ করতে সক্ষম হলাম।

ধানও হলো বেশ খানিকটা। মন্দ নয়। মোটের উপর দুরকম ব্যবহার জানি আমি ধানের। গুড়ো করে রুটির মতো করে খাওয়া, কিংবা রান্না করে খাওয়া। সেটা যখন অবিশ্যি যেমন যেমন সুযোগ হবে সেই ভাবেই খাব। এখন তো থাক মজুদ। এই অবকাশে আমি আবার আমার দিনপঞ্জিতে ফিরে আসি।

খুব খাটুনি গেল তিন চার মাস। সেই দেয়াল তোলা নিয়ে। শেষ হতে হতে ১৪ এপ্রিল। বেশ উঁচু। ঢুকবার কোনো ফাঁক ফোকর নেই। আছে শুধু একটা মই। সেটা দিয়ে বেয়ে উঠি দেয়ালের মাথায় তারপর মই তুলে ভিতরে পাতি। নামি বেয়ে বেয়ে। ব্যস আমি সব দিক থেকে নিরাপদ।

১৬ এপ্রিল ॥ মইটা আজ শেষ হলো। মন্দ নয়, ব্যবস্থা হিসেবে চমৎকার। দেয়াল টপকে নামতে পারলে আমার আর দুশ্চিন্তা বলতে কিছুই থাকে না। তা কম জায়গা তো ঘিরি নি। ঘুরে ফিরে বেশ স্বচ্ছন্দেই বেড়ানো যায়। আর বাইরের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন। মন্দ কী! এই তো বেশ।

পরের দিনই সে এক তুলকালাম কাণ্ড। এত খাটুনির দেয়াল আমার। গেল চোখের নিমেষে তছনছ হয়ে। আর আমি যেন মানুষটা মরতে মরতে প্রায় বেঁচে গেলাম। সে যা দুর্ভোগ! ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

গিয়েছিলাম বাইরে, মই বেয়ে সবে ভিতরে নেমেছি কি নামি নি হঠাৎ গুড় গুড় গুম গুম চারপাশে একটা অদ্ভুত শব্দ। আমি তো অবাক। দেখি গুহার উপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নামছে এক বিশাল পাথর। দেখতে না দেখতে তাঁবুর দুটো খুঁটি ভেঙে যেন দৈত্যের মতো আমাকে গ্রাস করবে বলে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এল। আমি তো ঘাবড়ে এক লাফে মই বেয়ে পাঁচিলের মাথায় গিয়ে উঠেছি। দেখি পাঁচিল পায়ের নিচে টলছে। ঠিক দুলুনি যে রকম। কেউ যেন নাড়াচ্ছে সমস্ত শক্তি দিয়ে। চটপট মই তুলে বাইরে নামলাম। নামতে না নামতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একদিকে দেয়াল। বলতে গেলে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম। আর তখনি বিদ্যুৎ চমকের মতো কারণটা মনের পর্দায় এসে ঝাপট মারল। তবে কি ভূমিকম্প! নইলে এই যে দাঁড়িয়ে আছি আমি মাটির উপর, এটা এত দুলবে কেন? তিন তিনবার সে যে কী দুলুনি! আমি তো টাল খেয়ে পড়ে যাবার যোগাড়। এমন নড়চড়ানির হাতে কি আর মাটির তৈরি একহারা দেয়াল রক্ষা পায়! বড় বড় দালান অব্দি কাত হয়ে পড়বে দেখতে না দেখতে। সমুদ্রের দিকে চোখ যেতে দেখি জলেও ভীষণ তোলপাড়। ফুলে ফুলে উঠছে জল। ঢেউ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাপট মারছে পাড়ে। সে যেন ফুঁসিয়ে ওটা দুরন্ত একটা কালসাপ। আমার ভাগ্য ভালো, আমি এখনো এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বহাল তবিয়তে বেঁচে বর্তে আছি।

তবে একটা কথা। বড্ড ভয় ধরে গেছে মনে। সেই সাথে বিস্ময় বিমূঢ় একটা ভাব। সেই যে বলে না বিপদের মুখে পড়ে থ মেরে যাওয়া, ব্যাপারটা ঠিক তাই। বিশ্বাস করতে পারছি না এতক্ষণ যা নিজের চোখে দেখলাম। সব এখন শান্ত। তবু আমি যেন কান পাতলে শুনতে পাই সেই পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। কিংবা সমুদ্রের সেই দুরন্ত তোলপাড়। ঢেউয়ের গোঙানি। বুকের ভেতরটায় এখনো যে হাতুড়ি পিটছে। যেন সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে ফিরে এলাম।

বসে রইলাম চুপ করে মাটির উপর। ভাঙা দেয়াল ডিঙিয়ে ওধারে যেতে এখন ভয় করছে। আতঙ্ক যাকে বলে। তবে প্রথমের সেই অতটা ভয় এখন আর নেই। কিন্তু কী করব বা করা উচিত সেটা বুঝতে পারছি না। আর অবাক ব্যাপার, এই যে এতক্ষণ ধরে এত উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল আমার সময়, কই একবারও তো মুখ দিয়ে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করি নি!

বসে থাকতে থাকতেই কালো হয়ে এতো আকাশ। সে একেবারে কুচকুচে কালো রঙ। যেন মসীকৃষ্ণ। বৃষ্টি হবে। হলো না তখন। আগে উঠল ঝড়। বাতাস বাড়তে বাড়তে সে একেবারে এলপাথাড়ি তুফান যেন। গাছের ডালপালা নাড়িয়ে হু-হু বেগে প্রকৃতি ওলট পালট করা ভীষণ তুফান। চলল প্রায় নাগাড়ে তিন ঘণ্টা। তারপর বৃষ্টি নামল।

আমি কিন্তু ঠায় সেইখানেই বসা। একটা জিনিস বুঝতে পারছি, এই তুফান এই বৃষ্টি—সব ভূমিকম্পেরই ফল। তার মানে ভূমিকম্প আপাতত আর হবে না! তবে মিথ্যে এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজি কেন? গেলাম তখন তাঁবুর ভেতর। গুহায় এখন যাব না। তাঁবুটা তা-ও বরং নিরাপদ। আসলে আতঙ্ক তখনো আমার পুরোপুরি কাটে নি। ভয় ভয় ভাবটা আছে। কিন্তু তা-ও বা কতক্ষণ! বৃষ্টির ঝাপট যে ভীষণ। তাঁবুর একটা ধারের চালা গেছে পড়ে, সেখান দিয়ে দমকা ছাঁট আসছে হু-হু বেগে। তখন সব ভয় ঝেড়ে ফেলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গুহার মধ্যেই ঢুকলাম।

বৃষ্টি হলো সারারাত। পরদিনও প্রায় দুপুর অব্দি। আমি তো ঠায় গুহাতে বসা। বাপরে বাপ, বের হই কখনো! আর বসে বসে কেবল তোলপাড় খাচ্ছে নানান চিন্তা আমার মনে। এই যে ভূমিকম্পের ভয়াল রূপ দেখলাম, এরপরও কি এখানে থাকা সমীচীন! গুহায় থাকা আর সম্ভব হবে না। কোনোদিন হুড়মুড়িয়ে গোটা পাহাড়টা ভেঙে পড়বে, আমি চাপা পড়ে জ্যান্ত কবরে যাব। সে আমার ঘুমের মধ্যেও হতে পারে। তার চেয়ে বরং সময় থাকতে বাইরে কোনো মুক্ত জায়গায় আস্তানা গাড়া ভালো। চারপাশে নয় পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেব। তাহলে আর চিন্তা কী! সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সংশয় থাকবে না এবং যত দ্রুত সে রকম ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল।

মোটমাট সরিয়ে নিয়ে যাব যে আস্তানা, এ ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা নেই, সিদ্ধান্তে মোটের উপর আমি অটল। কিন্তু কোথায় সরাব সেটাই এখন প্রশ্ন।

এপ্রিল মাসের ১৯ আর ২০ তারিখ এই দুটো দিন জায়গা পরখের কাজেই কাটল।

এদিকে ঘুমটাও কদিন ধরে হয় না বললেই চলে। রাতে শুয়ে থাকি চুপচাপ কিন্তু ঘুম আর আসে না। সেই আতঙ্ক আর কি। যদি পাহাড়টা ভেঙে পড়ে মাথার উপর! যদি জ্যান্ত কবর হয়! তাছাড়া জিনিস পত্র যে টেনেটুনে নিয়ে যাব নতুন জায়গায় এটাও আরেক সমস্যা। কীভাবে নেবো কী করব শুয়ে শুয়ে সেই সবই কেবল ভাবি।

মোটের উপর যাই করি না কেন, সেটা সময় সাপেক্ষ। চট করে তো আর ইচ্ছে হলো অমনি চলে গেলাম কোনো একটা জায়গায়, তাঁবু গাড়লাম, নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোলাম, তা তো আর হয় না। নিরাপত্তাটা সব সময়ই বড় প্রশ্ন। আগে তাঁবু খাটালে চলবে না।

এখানেই মোটামুটি মেরামতি করে থাকতে হবে এখনো অনেক দিন। আগে দেয়াল তুলব নতুন জায়গায়—এবার আর শুধু মাটি দিয়ে নয়, শক্ত খুঁটি গেড়ে তাতে তারের বাঁধুনি দিয়ে তার উপর দেয়াল। সেটা সহজে পড়বে না। তারপর দেয়াল সম্পূর্ণ তৈরি হলে মালপত্র এক এক করে নিয়ে যাব। শেষে করব তাঁবু। তখনি গিয়ে থাকার প্রশ্ন আসে।

... যেন দৈত্যের মতো আমাকে গ্রাস করবে বলে ধেয়ে এলো

২২ এপ্রিল ॥ আজ সকাল থেকেই কাজে লাগলাম। কিন্তু সে এক নতুন সমস্যা। যন্ত্রপাতি যা ছিল সাথে তার তো বড়ই বেহাল অবস্থা। যেমন করাত বা কুড়ুল, এতদিন তা দিয়ে কেটেছি অজস্র শক্ত কাঠ, তাতে ধার গেছে নষ্ট হয়ে, এখন সবই বলতে গেলে ভোঁতা। তাই দিয়ে কি আর পারা যায় নতুন করে গাছ গাছালি কাটা। তাই সর্বপ্রথম দরকার সেগুলোতে শান দেওয়া। কিন্তু দেব কীভাবে? যাঁতা একটা আছে ঠিক, কিন্তু তাতে তো ধার দেবার উপায় নেই। নতুন একটা কোনো পথ বের করতে হবে। হবেই এবং সেটাই আমার সব কাজের প্রথম কাজ।

তখন বিস্তর ভাবনা চিন্তা করে দুদিন খেটে তৈরি করলাম একটা চাকা। সেটা পাথরের। তাতে ফুটো করলাম। তারপর দড়ি গলিয়ে নিলাম মাঝখান দিয়ে। খুব একটা ভারী না আবার বড়ও না। প্রান্তদেশ মসৃণ। বসে দুপায়ের আঙুলে দড়ি বেঁধে পাক খাইয়ে মোটামুটি সেটা বেশ ঘোরানো যায়, তখন হাত দুটো থাকে আলগা। তাতে কুড়ুল, করাত বা ছুরি নিয়ে স্বচ্ছন্দে ধার দেওয়া যেতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের যন্ত্র সম্পূর্ণ আমার নিজেরই মগজ খাটিয়ে তৈরি। আগে কোথাও কোনোদিন দেখি নি বা নিজের হাতে তৈরি করব যে কখনো তাও ভাবি নি। নেহাত অবস্থার চাপে পড়ে করতে হলো। বলা যায়, আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা এখানে মৌলিক আবিষ্কারের পথ ধরল।

২৮ ও ২৯ এপ্রিল ॥ দুদিন ধরে বানালাম আমার যাবতীয় কাজের সরঞ্জাম। শান দেবার বস্তুটা বেশ চমৎকার কাজ করছে।

৩০ এপ্রিল ॥ রুটির সঞ্চয় একটু একটু করে কমে আসছে। আজ সময় নিয়ে ভালো করে হিসেব কষে দেখলাম যা পড়ে আছে তাতে আমার আর কতদিন চলতে পারে। মোটমাট কমতির পথে এটা ঘটনা। সেক্ষেত্রে আপাতত বেশ কিছুদিন দৈনিক একখানা করে বিস্কুট ছাড়া আমার আর সঞ্চয় থেকে এক কণা খাবারও গ্রহণ করা উচিত নয়।

১ মে ॥ সকাল। আনমনে রোজকার অভ্যেস মতো তাকিয়েছি একবার সমুদ্রের দিকে, দেখি কূলের কাছে জলের উপর কী যেন একটা ভাসছে। দেখতে যেন একটু বড় সড়। গেলাম ছুটতে ছুটতে। দেখি একটা পিপে। আশে পাশে কয়েকখানা কাঠের টুকরো। মোটমাট ঝড়ের দাপটে যে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ভিড়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভেতরে বারুদ ঠাসা তবে জল ঢুকেছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তাতে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে বারুদ। তবু বারুদ তো। সে যে অবস্থাতেই থাকুক তার একটা ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই আছে। তাই ঠেলতে ঠেলতে পিপে নিয়ে এলাম কূলে। ডাঙ্গায় তুললাম। যাক, শান্তি। এটাকে নিয়ে যাব আমার তাঁবুতে।

আর অবাক কাণ্ড, দেখি পাহাড়ের আড়ালে ডাঙ্গা থেকে প্রায় দু আড়াই মাইল দূরে আমাদের জাহাজটাও বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে কি এখানেই ছিল এতদিন, আমি দেখতে পাই নি? হয়তো তাই। প্রায় দু ফুট মতো বালির মধ্যে ডোবানো। ভাঙচুর হয়েছে তবে খোলটা আস্ত আছে। আর বালিতে বোঝাই। সে যে কত বালি! ঢেউ এসে তুলে দিয়ে গেছে পরতে পরতে বালির স্তূপ। তাতে চট করে দূর থেকে বোঝাও যায় না ওটা জাহাজ। কী করি এখন! যেতে যে ভারি মন চাইছে জাহাজের কাছে। কিন্তু অনেকটা যে জল। আগের মতো আর কী সম্ভব হবে? হোক অসম্ভব, তবু যাবই যাব। নতুন আস্তানা গড়ার প্রয়োজনে অনেক কিছু এখন আমার দরকার। দেখা যাক, তার কতটা পারি জাহাজ থেকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু যাব যে জাহাজে, রাস্তা কোথায়! চতুর্দিকে যে জল। পাটাতনে উঠব তারও তো উপায় নেই। বালিতে যে গোটা পাটাতন বোঝাই। তবে কি নিরুদ্যম হয়ে ফিরে যাব? মোটেই না। কোনো জিনিসে হতাশ হওয়া আমার অভ্যাসের বাইরে। যাব সাঁতার কাটতে কাটতে জাহাজের কাছে। ঐ অবস্থাতেই বালি সরিয়ে ওঠার পথ তৈরি করব। ভেঙে চুরে খুলে নিয়ে আসব যা পারি যতটুকু পারি সব। মোটমাট কোনো কিছুই এবার আর ফেলে আসব না। যা পাই তাতেই আমার লাভ। যা আনব তাইতেই আমার নতুন আস্তানা গড়ার কাজ হবে।

৩ মে ॥ আজ কাজে হাত দিলাম। করাত নিয়ে এসেছি সঙ্গে। কাটলাম মস্ত বড় একটা খুঁটি। অবিশ্যি তার আগে বালি সরিয়ে নিয়েছি। সেটা কাটতে ভিতরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। তবে বালি সেখানেও আছে অল্প বিস্তর। চেষ্টা করলে সেই ফোকর দিয়ে খোলের মধ্যে ঢোকা যাবে। কিন্তু চেষ্টার সুযোগ আর হলো না। জল বাড়তে শুরু করেছে। আমি সাঁতার কেটে খুঁটিটাকে ভাসাতে ভাসাতে কূলে এসে উঠলাম।

৪ মে ॥ মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। একটাও ওঠে নি। সমস্ত পরিশ্রম আমার বৃথা। ধরা ঝক্কিও বটে। বড়শি তো নেই, শুধু খানিকটা মোটা সুতো। তাতে টোপ বেঁধে ফেলে দিই জলে। তাই খায়। আলটপকা টান মারলে সটান উঠে আসে কূলে। অনেকগুলো আবার ফসকেও যায়। তবে যা পাই তাতেই আমি খুশি। কাজ চলে যায়। শুকিয়ে রাখি রোদ্দুরে। পরে কখনো কখনো শিকার না পেলে চিবিয়ে খাই। মন্দ লাগে না। হ্যাঁ ভালো কথা, আজ মাছ ধরতে গিয়ে মস্ত একটা ডলফিন দেখেছি।

৫ মে ॥ আজ ফের জাহাজে। আবার একটা খুঁটি কাটলাম। পাটাতন থেকে পর পর কয়েকখানা কাঠ খুলে আনলাম। বাঁধলাম একসাথে সব দড়ি দিয়ে। ভেলার মতো হলো। তাই নিয়ে ভাসতে ভাসতে এলাম কূলে। ঢেউ বাড়ছে।

৬ মে ॥ আজ অনেকগুলো লোহার বল্টু খুলে ফেললাম। আমার খুব কাজে লাগবে। লোহার পাতও অনেকগুলো পাওয়া গেল। আজ খুব পরিশ্রম গেছে। ফিরে এলাম বেলা থাকতে থাকতে আস্তানায়।

৭ মে ॥ জাহাজে গেলাম কিন্তু কাজের ইচ্ছে নিয়ে নয়। কেমন যেন সকাল থেকেই গা এলানো ভাব। গিয়ে দেখি, বাতাস আর ঢেউয়ের ঝাপটায় আমার কেটে নেওয়া খুঁটি বরাবর সব ভেঙেচুরে ডাই হয়ে পড়ে আছে। সেটা অবিশ্যিই আমার পক্ষে খুবই মঙ্গল। পরিশ্রমের আর তেমন দরকার হবে না। আর খোলের ভিতরটাও এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেখানে থই থই করা জল আর নিচে বালির স্তূপ।

৮ মে ॥ আজ পাটাতনের সব কাঠ খুলে নিয়ে আসব। সেই মন নিয়ে গেছি খুব সকাল সকাল। কিন্তু সব আনা হয়ে উঠল না। লোহার আংটা ছাড়িয়ে খুলতে পারলাম মোটে খানকতক। সেগুলোই পর পর দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলার মতো ভাসাতে ভাসাতে কূলে নিয়ে এলাম।

৯ মে ॥ কটা আংটা এমনই কড়া, কিছুতেই পারলাম না ভাঙতে। সে যে কী পরিশ্রম সারাদিন। সীসের সেই পাতটার দিকে চোখ পড়ল। প্রচণ্ড ভারী। কীভাবে যে নিয়ে আসব সেটাই সমস্যা।

১০ থেকে ১৪ মে ॥ সব কাঠই প্রায় নিয়ে আসা হলো। আর বিস্তর লোহার নাট, বল্টু, আংটা। সব মিলিয়ে ওজন প্রায় দু তিনশ হন্দর।

১৫ মে ॥ দুটো হাত কুড়ুল নিয়ে আজ জাহাজে গেলাম। সীসের পাতটা আজ কেটে আনতেই হবে। কিন্তু কাটব কীভাবে, জলের নিচে যে ডোবানো। প্রায় দেড় ফুট মতো জল। কিছুতে পারলাম না জল ভেদ করে কুড়ুলের ঘা মারতে।

১৬ মে ॥ কাল রাতে ঝড়ের খুব দাপাদাপি গেছে। সকালে উঠে বের হলাম শিকারে। পায়রা ধরতে মিথ্যে অনেকখানি সময় নষ্ট হলো। ফিরে এসে দেখি, জল বাড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় জাহাজে যাওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা। তাই আর গেলাম না।

১৭ মে ॥ ঢেউ ভাসিয়ে এনেছে বিস্তর কাঠ। পড়ে আছে বালির উপর। কিন্তু সে প্রায় দু আড়াই মাইল দূর। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে সেখানে। কিন্তু অসম্ভব ভারী। বয়ে আনা আমার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আনা আর হয়ে উঠল না।

২৪ মে ॥ এই সাতদিন রোজ একবার করে গেছি জাহাজে। বলতে গেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম। খোলাখুলি সব শেষ। কাঠ ছাড়াও পেয়েছি নাবিকের মালপত্র রাখার দুটো পেটি আর কটা মদের পিপে। আজ পিপে আর পেটি দুটো ফেলে দিলাম জলে। চিন্তা নেই, ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের তাড়নায় ঠিক কূল অব্দি পৌঁছে যাবে। কিন্তু কাঠ ভাসাবার সাহস পেলাম না। হাওয়া ছুটছে ডাঙ্গার দিক থেকে। তাতে ঠেলতে ঠেলতে সব নিয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে।

১৫ জুন অব্দি টানা চলল সব কিছু নিয়ে আসার কাজ। খাটুনি অবিরাম। শুধু দুপুর বেলা গিয়ে দুটি খেয়ে আসি। তখন ঢেউটাও বাড়ে কিনা। তা এনেছি যতখানি মোটের উপর আমি নিশ্চিন্ত। লোহা আর কাঠ দিয়ে এখন যেকোনো মুহূর্তে চমৎকার একটা নৌকো বানিয়ে নিতে পারি। সীসেও অনেকখানি আনতে পেরেছি। তাতে ঝালাইয়ের কাজ হবে।

১৬ জুন ॥ আজ একটা মস্ত বড় কাছিম দেখলাম। ইয়া বিরাট। আগে কখনো কাছিম এতদঞ্চলে দেখি নি। আছে বিস্তর। সেটা এপারে নয়, পাহাড় পেরিয়ে ওদিকে। ইচ্ছে হলে দিনে একশ দুশ অব্দি ধরা যায়।

১৭ জুন ॥ বেশ করে রাঁধলাম আজ কাছিমের মাংস। পেটে প্রায় ষাটটার মতো ডিম। আর মাংসর সে যা স্বাদ। আহা, অপূর্ব! কতদিন যে খাই নি এ জাতীয় মাংস। শুধু তো ছাগল আর মুরগি। খেতে খেতে জিভ যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

১৮ জুন ॥ আজ সারাদিন বৃষ্টি। বাইরে বের হলাম না। শীত করছে। হাড়গোড়ের ভিতরে কেমন যেন হিম হিম ভাব। অবাক কাণ্ড, আগে তা কখনো এমন হয় নি।

১৯ জুন ॥ শরীর খুবই খারাপ। কাঁপুনি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গা হাত পা যেন দুমড়ে মুচড়ে দেয়। আর যা শীত!

২০ জুন ॥ সারারাত ছটফট করে কাটিয়েছি। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। জ্বর জ্বর লাগছে।

২১ জুন ॥ অসহ্য অবস্থা আজ আমার। ভারি অসুস্থ। মনে হয় এ থেকে আমার আর অব্যাহতি নেই। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। হায়, কে আমাকে করবে সেবা শুশ্রূষা। কে আমাকে পথ্য দেবে, কপালে বুলিয়ে দেবে সান্ত্বনার হাত। ঈশ্বরকে আকুল কণ্ঠে ডাকলাম। এই প্রথম। মাথার মধ্যে কেমন যেন এলমেল ভাব। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পারছি না সুস্থির চিত্তে কিছু ভাবতে।

২২ জুন ॥ সামান্য সুস্থ আজ। অর্থাৎ কালকের তুলনায় একটু ভালো। তবে অসুস্থতা পুরোপুরি কাটে নি।

২৩ জুন ॥ আজ আবারো প্রথম দিনের মতো অবস্থা। কাঁপুনি আর সেই সাথে শীত। মাথার যন্ত্রণাও ভীষণ।

২৪ জুন ॥ আজ অনেকটা ভালো।

২৫ জুন ॥ একটু ভালো। একটু কেন বলি, অনেকটা। ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু খাবার বলতে মজুত যে কিছুই নেই। বন্দুকটা নিলাম। কিন্তু ভীষণ দুর্বল। হাঁটতে যেন পা ভেঙে আসে। ছাগল মারলাম একটা। বয়ে নিয়ে আসা সে যে কী কষ্ট! ঝলসে নিলাম। খানিকটা দিয়ে একটু ঝোল মতো করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাখার যে পাত্র নেই।

২৭ জুন ॥ আজ আবার সেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। ঠায় শুয়ে সারাদিন বিছানায়। ক্ষিধে খুব। কিন্তু খাব যে কিছু সে সামর্থ্যটুকুও নেই। জল পিপাসাও প্রচণ্ড। কিন্তু ঘরে যে জল নেই। যেতে হবে সেই বাইরে, জল আনতে হবে তারপর খাব। যাব কী ভাবে, আমার কি ওঠার শক্তি আছে। শুয়ে শুয়ে শুধু ঈশ্বরকে আকুল কণ্ঠে ডাকি।—প্রভু আমাকে বাঁচাও। আমাকে শক্তি দাও, আমাকে দয়া কর। দু তিন ঘণ্টা শুধু এই আকুল প্রার্থনা। তখন বেহুঁশ ভাব। আর ঘুম ভাঙল তখন মাঝরাত। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। সেই ভাবেই চুপচাপ শুয়ে রইলাম। থাকতে থাকতে ফের ঘুম। তখন দেখলাম একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন।

সে যা ভয়ঙ্কর! দেয়ালের বাইরে আমি বসা। ঝড় বইছে হু-হু করে। সেই ভূমিকম্পের পর। তখন দেখি আকাশে কালো মেঘের বুক চিরে একজন লোক নেমে এল। তার সারা গায়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে জ্বলে উঠল সারা মাঠঘাট, বন ও পাহাড়। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি। কী যে বীভৎস তার মুখ! আমার ভাষা নেই আমি সে চেহারা বর্ণনা করতে অপারগ। মাটিতে যখন নামল যেন দুলে উঠল সারা পৃথিবী। ঠিক ভূমিকম্পের সময়কার মতো। আর দাউ দাউ করে চারদিকে জ্বলছে আগুন।

সেই অবস্থাতেই আমার দিকে এগিয়ে এল। হাতে একটা বর্শা। আমাকে তাই দিয়ে গাঁথবে। দাঁড়াল এসে একটা উঁচু জায়গায়। আমাকে বলল, কীরে, তোর মনে তবু অনুতাপের নামগন্ধ নেই? তবে তোর এখন মৃত্যুই শ্রেয়। জলদপ্রতিম সেই কণ্ঠস্বর। বলে বর্শাটা আমাকে তাক করে শূন্যে তুলল।

তখন দেখলাম একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন

সে যা ভয় আমার! আমি ভাষায় ব্যক্ত করে আপনাদের বোঝাতে পারব না। আমার সাধ্যের বাইরে। যদিও স্বপ্ন, কিন্তু দেখছি যখন আমি, সেটা তো বাস্তবেরই মতোন। ভয়টাও বাস্তব। সেই ভয়ের দাপটেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

সত্যি বলতে কি আমার তো তেমন ভক্তি টক্তি নেই। আমার বাবা খুব ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। ধর্ম সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান তিনি একসময় আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কি আর লেশমাত্র মনের মধ্যে আছে! আটটা বছর তো দেখতে দেখতে সমুদ্রের বুকেই কেটে গেল। দুঃসাহসিক সব অভিযান। কত শয়তানি, কত নষ্টামি তার ভাঁজে ভাঁজে। তাতে কি ধর্মকর্ম বলে কিছু থাকে! নিজেকে নিয়েই যে ব্যস্ত থাকতে হয় সারাক্ষণ। মনে তো পড়ে না, এই দীর্ঘ আট বছরে একটি দিনের তরেও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেছি বা অন্তরে ভেবেছি তাঁর কথা। মনটা যেন মন নয়। যেন কাঠখোট্টা আত্মসুখী বিবেকবর্জিত একটা পদার্থ। তাতে ঈশ্বরকে ভয় করা তো দূরের কথা, বিরাট একটা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির পর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে নিদেনপক্ষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, সে বোধটুকুও আমার মধ্যে নেই।

নেই বলেই হয়তো এত দিন ভাবতে পারি নি, এই সব যাবতীয় অঘটন দুর্বিপাকের মধ্যে ঈশ্বরের হাত আছে কিংবা এই যা ঘটছে আমার জীবনে—একের পর এক বিপর্যয়, তা আমার অতীতের কৃতকর্মেরই ফলাফল। অতীত বলতে এখানে আমি বাবার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তার কথাই বলতে চাই। তাঁকে যে অগ্রাহ্য করেছি, মানি নি তাঁর

উপদেশ, তার জন্যে শাস্তি তোলা ছিল আমার ভাগ্যে, এখন একের পর এক তাই ফলতে চলেছে—এমন বোধ কখনো আমার মনে স্থান পায় নি। কিংবা সেই যখন গিয়ে পড়লাম শাম্পানে করে ভাসতে ভাসতে আফ্রিকার উপকূলে—একবারও মনে হয় নি, কী হবে আমার! আমি কি সুস্থ জীবনের আর দেখা পাব! ঈশ্বরের নাম ভুলেও মুহূর্তের জন্যে মনে উদয় হয় নি। বলি নি একবারও, হে ঈশ্বর, আমাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও। এমনকি সেই যখন বর্বর মানুষদের মুখোমুখি হয়েছিলাম কিংবা জন্তুর সাথে লড়াইয়ে মেতেছিলাম তখনো। শুধু উপস্থিত বুদ্ধি তখন আমার সহায়। আর মনের জোর। আপনারা হয়তো শুনলে বলবেন, আমি নৃশংস, আমি মহাপাপী। কিন্তু এতটুকু বানিয়ে বলছি না। উপস্থিত বুদ্ধি আর মনের জোর যদি নৃশংসতা হয়, তবে এছাড়া অন্য কারো উপর আমি সেই মুহূর্তে ভরসা করতে পারি নি।

পর্তুগিজ জাহাজের কাপ্তেন যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখনো মোটামুটি আমার একই মনের অবস্থা। অপূর্ব তাঁর ব্যবহার, আমার প্রতি দয়া ভালোবাসা আন্তরিকতা, সে জন্যে তাকেই আমি জানিয়েছি হাজারো ধন্যবাদ, ভুলেও বারেকের তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই নি। ফের যখন জাহাজডুবি হয়, যখন অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকে আমি বেঁচে এই দ্বীপে এসে উঠি, তখনো ঈশ্বরের কথা এক লহমার জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি। বরং নিজেকে ভেবেছি আমি মন্দভাগ্য এবং তার জন্যে সম্পূর্ণ নিজেকেই আমি দোষী সাব্যস্ত করেছি।

ডাঙ্গায় ওঠার পর চিত্রটা অন্যরকম। আমি সেই প্রথম বুঝতে পারলাম আমার সহযাত্রীরা সকলেই হত, কেবল একলা আমিই বেঁচে আছি। তখন এক অদ্ভুত বিস্ময়বোধ আমার মধ্যে বা আনন্দের অপ্রাকৃত এক অবস্থা। আর কেউ হলে একে ঈশ্বরের মহান অবদান বলে চিহ্নিত করতে কালক্ষেপ করতেন না। আমি সেটা পারি নি। আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিহ্বল ভাব কাটিয়ে তখন আমার মধ্যে ভীষণ এক আনন্দের ভাব। আমি যে জীবিত এটা আমার কাছে তখন অনেকখানি। এটা প্রায় প্রতিটি নাবিকের ক্ষেত্রেই সাধারণ ঘটনা। জাহাজ নিরাপদে তীরে ভেড়ার পর সবাই এভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। তখন আর নিজেকে ছাড়া অন্য কারো কথাই মনে আসে না। আমার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের কথা মনে আসার সুযোগ হয় নি।

এমনকি পরেও না। এই যে বিজন দ্বীপে আমার নির্বাসন, এই যে জনমানবের সঙ্গে সংযোগবিহীন একক-একাকী এই জীবন, যার থেকে হয়তো সারা জীবনে আমার মুক্তি নেই, নিস্তার নেই—কই তার জন্যে তো ঈশ্বরকে আমি কখনো ডাকি নি। বরং কীভাবে স্বাভাবিক করতে পারি একে, কীভাবে বেঁচে বর্তে সুস্থ হয়ে থাকতে পারি, সেটাই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার বাঁচাটাই এখন প্রধান ব্যাপার। তার জন্যে ঈশ্বরের সাহায্য বা দূর থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা পাবার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ করি নি।

আর ঐযে যখন ফেলে দেওয়া শস্য কণা থেকে গাছ গজাল প্রথমবার, আমি ঈশ্বরের নাম হয়তো করেছি, কিন্তু তেমন একটা আহামরি ভাবে নয়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা আমার মনে আদৌ কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। সেটা হয়েছে পরবর্তী কালে। তখন এর মধ্যে অলৌকিক যে একটা কিছু আছে আমি তাই ভাবতে শুরু করেছি। শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ নয়, অতিপ্রাকৃত কিছুও। তবে সে চিন্তা বেশি দিন আমার মনে স্থান পায় নি। ব্যাপারটা যখন সহজ হয়ে এসেছে, তখন সেই সব অবিশ্বাস্য চিন্তাও ধীরে ধীরে মন থেকে লুপ্ত হয়েছে।

ভূমিকম্পের ব্যাপারটা আমি আগে আপনাদের কাছে বলেছি। তার ভয়ঙ্করতা আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। সে যা মনের অবস্থা আমার! তখন ঈশ্বরের নাম করেছি এটা ঘটনা, কিন্তু ঐ অব্দিই। এ অবস্থায় সকলেই হয়তো এরকম করে থাকেন। বেশি যা করেন তা হলো তাঁকে নিয়ে মাতামাতি। সেটা আমি করতে পারি নি। একবারও ভাবি নি এ তাঁরই মহিমা কিংবা অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোনো বীভৎস ব্যবস্থা। মোটমাট ভূমিকম্পের প্রথম চোট কেটে যাবার পর আমি এর থেকে পরিত্রাণের কী উপায় আছে তারই চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়েছি।

শুধু এই মুহূর্তে সব ওলোটপালোট। এই যে অসুস্থ আমি, ভীষণ দুর্বল, পারি না হাঁটতে কি চলতে, পারি না প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেলেও জল নিয়ে আসতে—এখন এই দুর্বল মুহূর্তে বারে বারে মনে পড়ছে আমার পুরানো দিনের কথা। নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে মন চাইছে। ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা করছি—হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও, আমাকে দয়া কর। এটা সম্পূর্ণ আমার স্বাভাবিক চিন্তার বাইরে এবং এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী আমার অসুস্থতা। এই যে প্রচণ্ড জ্বর, এই বিকার, এই মাথার যন্ত্রণা, আমার ধারে কাছে পরিচিত কেউ নেই, সেবা শুশ্রূষা করার কেউ নেই, না আছে একটা ওষুধ কি আর কিছু—মন যে দুর্বল হবে এসময়, ঈশ্বরের সহানুভূতি যে চাইবে এটা ঘটনা। আমার মুখ, চোখ, মন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সব তালগোল পাকিয়ে আছে মাথার মধ্যে। মরার কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে চিন্তার মধ্যে পাক খাচ্ছে। ঠোঁট যে এসময় অসহিষ্ণু হয়ে ঈশ্বরকে ডাকবে এটা তো স্বাভাবিক।—প্রভু আমাকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা কর—প্রভু দুঃখী মানুষ আমি!—প্রভু আমার অসুখ না সারলে আমি আর বাঁচব না। মারা যাব, তুমি আমাকে নীরোগ কর। আর চোখ ফেটে বের হয় জল। সে-ও তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এক্ষেত্রে আমি মানুষটা কি-ই বা করতে পারি?

আর ঘুরেফিরে বারে বারে মনে পড়ে বাবার উপদেশের কথা। আমাকে বারবার সাবধান করেছিলেন যেন আমি বোকার মতো সমুদ্র যাত্রায় না যাই, এভাবে ভাগ্য পরিবর্তনের যেন চেষ্টামাত্র না করি। এতে ঈশ্বরের দয়া লাভে আমি বঞ্চিত হব, কিছুতেই পারব না একক চেষ্টায় আমার দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে। সত্যি তাই। আমি চিৎকার করে মাঝে মাঝে আপন মনেই বলে উঠি—হ্যাঁ বাবা, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বরের করুণা আমি লাভ করতে পারি নি। কেউ নেই এই দূর বিদেশে যে আমাকে সাহায্য করে, একটা দুটো পরামর্শ কি বুদ্ধি দেয়। আমি তোমার সদুপদেশে কর্ণপাত করি নি। আমি নির্বোধ। আমি মূঢ় আমি পাপী। আমি তোমার কথা শুনলে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বদেশে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতাম। আমার কোনো দুঃখ থাকত না। সব হেলায় পায়ে ঠেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমি অজানার ডাকে। এখন শুধু তার জন্যে আক্ষেপ আর অনুতাপ। এছাড়া আমার আর করার কিছু নেই। কেউ নেই আমাকে এতটুকু সাহায্য করার। আমি একা, সম্পূর্ণ একা। আমি দুঃখী। ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।

প্রার্থনা বলতে এটাই প্রথম। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি দয়া ভিক্ষা করে ঈশ্বরকে তলব করলাম। কিন্তু সেকথা থাক। আমি আবার আমার দিনপঞ্জীতে ফিরে আসি।

২৮ জুন ॥ মোটামুটি ঘুম ভালোই হয়েছে। আজ অনেকটা সুস্থ। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে সকাল সকাল। গতরাতের দুঃস্বপ্নের ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটে নি তবু মন অনেক প্রফুল্ল। জোর পাচ্ছি এখন অনেকখানি। কেমন যেন বিশ্বাস, কাল আর জ্বর হবে না।

আপাতত পেট ভরাবার মতো কিছু দরকার। যদি ফের কোনো কারণে অসুস্থ হই, তার জন্যে যোগাড় তো রাখতে হবে। তবে সবার আগে চাই জল। একটা বোতলে করে পাশের ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে এলাম। মদের বোতল খুলে খানিকটা মদ মিশিয়ে নিলাম জলে। এটা এখন আমার দরকার। চাঙ্গা হতে হবে সবচেয়ে আগে। কিন্তু খালি পেটে খাওয়াটা তো উচিত নয়, তাই খানিকটা মাংস নিলাম। সেই ছাগলের মাংস। ঝলসে নিলাম। মুখে দিতে মুখটা যেন বিস্বাদ। ইচ্ছে করছে না খেতে। বোতল থেকে খানিকটা তরল ঢেলে দিলাম গলায়। একটু সুস্থ লাগছে। তখন হাঁটলাম একটুখানি। ভারি দুর্বল শরীর। টাল খেয়ে পড়ে যাই বারবার। ফের সামলে নিই। আর মন দুঃখে ভরে ওঠে। শুয়েই রইলাম। আতঙ্কটা ফের একটু একটু করে মনের আনাচে কানাচে ফিরে আসছে। হয়তো কাল আমার ফের জ্বর হবে। নির্ঘাৎ। তখন উপায়! মৃত্যু কি আসন্ন!

রাত্রে কটা কাছিমের ডিম আগুনে ঝলসে খেলাম। হাঁটলাম খানিকটা। কষ্ট। বন্দুকটা হাতে নিলাম। যেন ভীষণ ভারী। বসে পড়লাম মাটিতে। চাঁদ উঠেছে। সমুদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। ছবির মতো নীল শান্ত নির্বাক সমুদ্র। নানান ভাবনা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল মনে।

আচ্ছা, এই যে পৃথিবী এবং এই সমুদ্র—কোথা থেকে এর জন্ম? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে?

আমাদের জন্মের পিছনে শুনি আছে এক অলৌকিক শক্তি। তাঁরই মধ্যে এই জগৎ, এই সমুদ্র, এই সব কিছু? তিনি কে?

এর একটিই উত্তর। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। কিন্তু সৃষ্টির একমাত্র অধিকারী যদি তিনিই হয়ে থাকেন, তবে নিয়ন্ত্রণেরও একাধিপত্য তাঁরই। অর্থাৎ এই জল স্থল অন্তরিক্ষ সব তাঁরই তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা আছে এবং যদি সত্যি হয়, তবে জগতে কিছুই তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটতে পারে না।

সেটাকে যদি সত্যি বলে মেনে নিই, তাহলে এই যে আমি এখানে, এই অজানা অখ্যাত দ্বীপে এটা আর কেউ না জানুক, তিনি ঠিকই জানেন। আমার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ভাবে তিনি অবহিত এবং যদি ধরে নিই তাঁর নির্দেশ ভিন্ন কোনো কাজ হবার সুযোগ হয় না, তবে এই যে আমি এখানে এটাও তাঁর নিজেরই নির্দেশে।

এত অব্দি বলতে গেলে নির্ভুল চিন্তা। নিজের কাছে নিজেরই একের পর প্রশ্ন। একে প্রতিবাদ করার শক্তি বা সাহস আমার নেই। তবে একটিই সান্ত্বনা, যা করেন তিনি জীবের মঙ্গলের জন্যেই করেন। সেক্ষেত্রে আমার এই নির্বাসনের পিছনেও নিশ্চয় কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। কী সেই মঙ্গল? যদি তাঁর অমোঘ নির্দেশেই সব ঘটনা ঘটে থাকে, তবে কী সেই নির্দেশ?

এবং কেন সেই নির্দেশ তিনি দিলেন? কী করেছি আমি যে এই নির্দেশ আমার উপর বর্তাবার সুযোগ হলো?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছি আমি। এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। ঈশ্বরের উপর খবরদারী করতে পারে কোন মূর্খ? যেন জবাবটাও সাথে সাথেই পেয়ে গেলাম। কে যেন ভিতর থেকে বলে উঠল—হতভাগা, তোর এতবড় সাহস, কি করেছিস তুই জানতে চাস? তবে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন কর, জবাব পাবি। তোর তো আগেই সংহারের অবস্থা হয়েছিল, মনে নেই সেকথা? ইয়ারমাউথে ঝড়ের পর সেই মর্মান্তিক অবস্থা, তার মধ্যেও তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম। ভুলে গেলি সেই কাহিনী? জলদস্যুরা জাহাজ

দিল তছনছ করে, কত মানুষ মারা পড়ল, তুই রইলি জীবন্ত? তোর লজ্জা হয় না! আফ্রিকার উপকূলে হিংস্র জন্তুর মুখে মরতে মরতে তুই বেঁচে গেলি! এখানেও তো একই হাল। ডুবে মরতিস তোর সাথীদের মতো। একমাত্র তোরই জীবন রক্ষা পেল। এত কিছুর পরেও ফের জবাবদিহি চাস?

সত্যি বলতে কি আমি তখন থ। মূক হতবাক, বিস্ময়ে স্তব্ধ। একটি কথা বলার শক্তিও আমার নেই। ভীষণ বিমর্ষ ভাব। সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে উঠলাম। গেলাম তাঁবুর ধারে। ঘুমোব এবার, কিন্তু ঘুম যে ছুটি নিয়েছে চোখ থেকে। চেয়ারে বসলাম। আলো জ্বাললাম। ভয় করছে খুব। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আতঙ্কের ভাব। যদি ফের আমার জ্বর হয়। যদি কাল আবার পড়ি বেহুঁশ হয়ে। তখন মনে পড়ল ব্রাজিলের কথা। অসুখ বিসুখ হলে সেখানে সকলে খায় তামাক। তাতেই নাকি সব রোগ সেরে যায়। তামাক তো খানিকটা আমার সাথেও আছে। কিছুটা তার শুকনো, কিছুটা কাঁচা। দেখা যাক না, যদি কোনো উপকারে পাই।

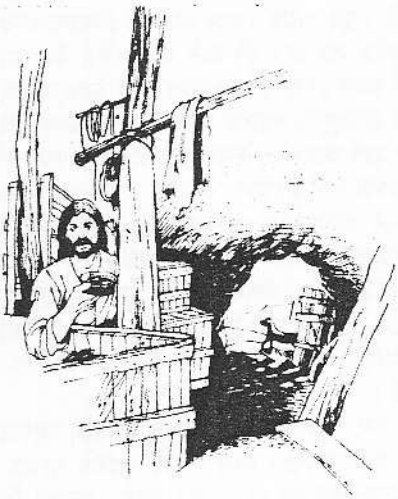

এই তো তামাক

সে যেন ঈশ্বরেরই অদৃশ্য নির্দেশ। উঠলাম ঘোরগ্রস্থ মানুষের মতো পেটি খুললাম। এই তো তামাক। পাশে জাহাজ থেকে আনা সেই বই ক'খানা। তার মধ্যে বাইবেলও আছে। সেটাও নিলাম। সঙ্গে তামাক। তারপর ফের এসে বসলাম চেয়ারে।

তামাকে কি সারে কতটুকু সারে আমার জানা নেই, তবু এইটুকুই ভরসা, খেয়ে দেখতে হবে আমাকে, সারবে যে এটা নির্ঘাৎ। একটা পাতা মুখে ফেলে চুষতে লাগলাম। সে যা তেজ। মুহূর্তে যেন টলতে লেগেছে আমার মাথা, সঙ্গে সারা শরীর। কাঁচা পাতা কিনা, তাই তেজ পাকা পাতার চেয়ে বেশি। এদিকে আমি তো আর তামাক টামাকে অভ্যস্ত নই। তখন আরো খানিকটা নিয়ে সেই বোতলের তরলে ভিজিয়ে রাখলাম। তা প্রায় ঘণ্টা দুই। মিশল তেজ। এবার এক অনুপান এই বোতল থেকে খাব। এটা আমার ওষুধ।

খেলাম তাই। শুকনো পাতাটা নিয়ে আগুনের কাছে ধরলাম। দেখি ঝাঁজ বেরচ্ছে। তখন নাকটা এগিয়ে নিলাম পাতাটার কাছে। ভক করে খানিকটা ধোঁয়া ঢুকল নাকে। সরালাম না। মোটমাট যতক্ষণ সহ্য হয় আমি ঘ্রাণ নেব। দেখি ফল কী দাঁড়ায়।

বাইবেল ততক্ষণে খুলে ফেলেছি। পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু মাথা যে এখন দেখি টলে যায়। সেই তামাক পাতা চুষে খাওয়ার ফল। পারছি না পড়ার দিকে মন বসাতে। বই কিন্তু খোলা। ঘুরে ফিরে চোখে পড়ে শুধু একটা মাত্র ছত্র—বিপদের দিনে আমার স্মরণ নিও। আমি তোমার পরিত্রাতা। আমাকে মহিমান্বিত করবে তুমি।

প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আমার হৃদয় স্পর্শ করল। অপূর্ব সংগীতের মতো এর শ্রুতি, কানের পর্দায় অনুরণন সৃষ্টি করে। কিন্তু সব কথা কি ঠিক? আমার বাস্তব অবস্থায় প্রতিটি কথার কি মূল্য আছে? যেমন : আমি তোমার পরিত্রাতা। কিন্তু কীভাবে তিনি ত্রাণ করবেন আমাকে এই অদ্ভুত পরিবেশ থেকে? এ কি আদৌ সম্ভব? আমি তো আশার লেশমাত্র দেখতে পাই না। তবে কেন এই প্রবঞ্চনা?

সে যাই হোক, রাত বাড়ছে। ঝিম মেরে আছে মাথার মধ্যে। তামাকের প্রতিক্রিয়া আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়লাম। আলো নেভালাম না। জ্বলুক। যদি রাত্রে কখনো উঠি দরকারে লাগবে। কী মনে হতে ফের উঠে বসলাম শয্যা ছেড়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। করি নি এমন কোনোদিন। আজ ভারি ইচ্ছে করছে। প্রার্থনা করব আজ। ঈশ্বরকে বলব তার সব প্রতিশ্রুতি যথাযথ ভাবে পূরণ করতে। আমাকে যেন মুক্তি দেন এই দুর্দশা থেকে। যেন ত্রাণ করেন।—ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা কর। ... তারপর বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিকটা পানীয় গিলে ফেললাম। খুব কড়া লাগছে। তামাকটা মিশেছে বেশ চমৎকার ভাবে। মনে এবার বেশ জোর পাচ্ছি। আমার আর ভয় নেই। নেই কোনো দুর্ভাবনা। এবার শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। গভীর গাঢ় নিদ্রা। ভাঙতে ভাঙতে সেই বিকেল। তখন তিনটে প্রায় বাজে। ঝলমল করছে রোদ। তবে পরে চিন্তা করে দেখেছি, পরদিন নয়, ঘুম ভেঙেছে তারও পরের দিন। অর্থাৎ ঘুমিয়েছি আমি মোট দেড়দিন এক রাত। নইলে কি করে আমার একটা দিন হিসেব থেকে কমে যায়। পরে হিসেব মেলাতে গিয়ে এটা নজরে পড়েছে।

ঘুম ভাঙতে আমি তো পুরোপুরি সুস্থ। কী যে তাজা লাগছে শরীর! ভিতরে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। মনও প্রফুল্ল। কাজ করতে উৎসাহ লাগছে। আর ক্ষিধে পেয়েছে ভীষণ। মোটের উপর সুস্থ লোকের যা যা হয় তাই। আমার হিসেব মতো সেটা ২৯ তারিখ।

পরদিন যথারীতি বন্দুক নিয়ে বের হলাম। শরীরে তেমন ক্লান্তি নেই, মোটের উপর সুস্থ স্বাভাবিক আমি। বেশ ভালো লাগছে। তবে বেশি দূর যাবার দরকার হলো না। পথে দেখি একটা মুরগি। মারলাম। পরে আরো একটা। তাকেও প্রাণ দিতে হলো। নিয়ে এলাম তাঁবুতে। কিন্তু রাঁধতে আজ আর ইচ্ছে করছে না। তখন কাছিমের ডিম ছিল কটা, তাই খেলাম। বেশ লাগছে খেতে। ওষুধ বানালাম আরো একটা বোতল। সেই মদ, তাতে তামাক, মিলে মিশে তামাকের আরক, খেলাম একটুখানি। অর্থাৎ অনুপান মতো। তবে কাঁচা পাতা আর চিবিয়ে বা চুষে খেলাম না। তামাকের ধোঁয়াও নিলাম না আজ। জানি না সেই জন্যে কিনা, পরদিন অর্থাৎ ১লা জুলাই শরীর আবার গোলমাল করল। সেই অসুস্থ ভাব। তবে ততটা প্রবল নয়। হিম হিম ঠাণ্ডা ভাব আছে, কিন্তু তার দাপট প্রথম দিনের মতো ততটা নেই।

২ জুলাই ॥ ওষুধ চলছে। অনুপান আগের তুলনায় আরেকটু বাড়িয়েছি। প্রায় দু গুণ। মাথায় ঝিম ধরা ভাবটা আছে।

৩ জুলাই ॥ সুস্থ বলতে পারি না, তবে ঝিম ঝিম ভাব। বেহুঁশ মতো অনেকটা। ওষুধের ক্রিয়া কিনা কে জানে। শরীরে তাগদও আজ কম। পরিপূর্ণ বল ফিরে পেতে আরো অনেকদিন লাগবে এটা জানি। তবে এই দুদিন ধরে সমানে বাইবেলের সেই লাইনটা ফিরে ফিরে আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।—আমি তোমার পরিত্রাতা। অসার অহেতুক এই ভাষ্য। তবু একে কেন্দ্র করে মনের গভীরে কোথায় যেন আশার এক চিলতে আলো দেখতে পাই। কে জানে, হয়তো ত্রাণ পেলেও পেতে পারি। উদ্ধার পেতে পারি এই সংকট থেকে। কিন্তু কী সেই উপায়? মোটমাট প্রশ্রয় দিই না একদম। চিন্তা এলেই মন থেকে দূর করে দিই। যা অসম্ভব তাকে নিয়ে কী আর অহেতুক কল্পনাবিলাস ভালো! তবে পুরোপুরি কল্পনাই বা বলি কী করে। কোনোরকম ত্রাণ কি আমি পাই নি? সংকট থেকে এতটুকু মুক্তি কি পরিত্রাণ? এই তো অসুখ হয়েছিল আমার। নেই কেউ কাছে যে একটু সেবা করে বা দেখাশোনা করে। ঈশ্বরই তো অদৃশ্য দু হাতে আগলে রেখেছেন আমাকে সারাক্ষণ, সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মনে যে ভয়ের জন্ম হয়েছিল তা থেকে তিনিই তো আমাকে উদ্ধার করেছেন। সে ভয় এখন আমার মনে কোথায়? পাশাপাশি, পারি নি তো আমি তাঁকে গৌরবান্বিত করতে। অন্তত এ সবের জন্যে একটু কি ধন্যবাদ প্রাপ্য ছিল না তাঁর? আমি এমনই অবোধ, পারি নি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে মুখ উজ্জ্বল করতে।

মরমে মরে যাওয়া যাকে বলে। আমার অবস্থা ঠিক তাই। হায় হায়, এ আমি কী করেছি! অমনি বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায়। নিজের অন্যায়ের জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করলাম। সরবে জানালাম ধন্যবাদ। মনটা এতক্ষণে হালকা লাগছে।

৪ জুলাই ॥ সকালে বাইবেল খুলে বসলাম। গভীর মনোযোগে শুরু করেছি পড়া। এবার থেকে নিয়ম করে সকালে রাত্রে আমি বাইবেল পড়ব। পড়বই। কেউ পারবে না আমাকে এই নিয়ম থেকে চ্যুত করতে। তা ঐ এক গোল। যেই শুরু করি অমনি মন অনুতাপে দগ্ধ হয়। মনে পড়ে সেই বিকটদর্শন স্বপ্নের কথা। সেই ভয়ঙ্কর মানুষ। হাতে তার বর্শা। আমারই বুক লক্ষ্য করে উদ্যত। বলছে—এত সবের পরেও তোর মনে একটু অনুতাপ নেই? ... ঈশ্বর, তুমি আমাকে অনুতাপ দাও। আমি যেন আমার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হতে পারি। এই ভাবি সারাক্ষণ। আর দু চোখ অধীর আগ্রহে পাতার পর পাতা ছত্রের পর ছত্র পড়ে যেতে থাকে। পড়তে পড়তে হঠাৎ থমকে গেলাম একটা জায়গায়।—অনুতাপ পারে মানুষকে মহান করতে, ঈশ্বরকে মহান করতে, রাজাকে সম্মানের আসনে উন্নীত করতে।

অমনি ছুড়ে ফেলে দিলাম বই। আর পড়তে মন চাইছে না। মনে এখন এক গভীর উল্লাস। আমি হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দুহাত তুলে ধরলাম।—প্রভু, তুমি আমাকে অনুতাপ দাও, আমার মন দুঃখে তাপে জর্জরিত কর। তুমি মহান ত্রাতা। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আমি তোমাকে আরো মহান করব।

এ আমার অন্তরের প্রার্থনা। এমন ভাবে ঈশ্বরকে আর কখনো ডাকি নি। আমার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে, আমার অতীত আমার ভবিষ্যৎ সব কিছুরই সঙ্গে মিশ খাইয়ে এ এক অনবদ্য অপরূপ স্বর্গের সুষমামাখা প্রার্থনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর এ প্রার্থনার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

নতুনভাবে এখন থেকে সব কিছু আমি বুঝতে পারছি। এতদিনে 'আমি তোমার পরিত্রাতা' কথাটির সারমর্ম আমি অনুধাবন করতে পারছি। এ আর কিছুই নয়, মানুষ যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্দি হয়ে পড়ে, তার নিজস্ব ভুল ভ্রান্তির গহ্বরে,—এ তারই থেকে ত্রাণ। দ্বীপ আমার কাছে কারাগার আমি জানি। সেখানে আমি বন্দি, তা-ও আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সে বন্দিত্ব আমার কাছে বড় নয়। তার চেয়েও বড় হলো আমার নিজের চেতনা, আমার অতীতের ভুল ত্রুটি পাপ অন্যায় প্রভৃতির কাছে দাসত্ব। এর হাত থেকে মুক্তিই তো আসল মুক্তি। তবে না মন আমার শুদ্ধ হবে, পাপ স্খালন হবে। সেটাই মানুষের কাম্য। মনকে শুদ্ধ করাই সব চেয়ে বড় ব্যাপার। আমি বন্দি দশা থেকে ত্রাণ পাবার আগে চাই নিজেকে শুদ্ধ করতে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। অনেক গভীর অনেক তাৎপর্যে ভরা চিন্তা। সেটা আপাতত স্থগিত থাক। আমি ফিরে আসি আবার আমার বিবরণীতে।

মনের দিক থেকে এখন আমি অনেকটা মুক্ত। যদিও অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় নি। যেমন পরিবেশে ছিলাম তাই আছি। তবু ভাবতে পারি এখন স্বচ্ছন্দে। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের হাতের ছোঁয়া দেখতে পাই। যেন তাঁরই নির্দেশে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, তাঁকে অগ্রাহ্য করে এক পা চলার শক্তি আমার নেই। রোজ পড়ি তাঁর নির্দেশাবলি। প্রার্থনা করি। মন উন্নীত হতে চলেছে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অচেনা অজানা এক জগতে। তাতে অসীম তৃপ্তিবোধ। জানি না কোন সে দেশ, কী সেই স্থান। তবু ভাবতেও চমৎকার লাগে। আমার শরীরে একটু একটু করে হৃত বল আবার ফিরে আসছে। সম্পূর্ণ সুস্থ বলতে যা বোঝায় তাই। যা চাই আমি সবই এখন মোটামুটি পেয়ে থাকি। জীবনের গতিও এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

৪ থেকে ১৪ জুলাই অব্দি প্রধান কাজ আমার নিয়মিত বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়া। খুব একটা দূর অব্দি যেতে পারি না, এখনো পুরো তাগদ ফিরে পাই নি। তবে রোজই একটু একটু করে বাড়াই যাতায়াতের সীমা। তাতে সুস্থতা একটু একটু করে ফিরে আসে। আগে হলে জানি না এই ভাবে করতাম কিনা। অবিশ্যি সে প্রশ্নও আসে না, কেননা আগে তো আমি ভয়ের কবলে কখনো পড়ি নি। মোটমাট কী করতে হবে এবং করা উচিত সেটা এখন ঠিকঠিক অনুধাবন করতে পারি। এটাই লাভ। মন মুক্ত হলে পারে বোধহয় মানুষ এমন করতে। মাঝে মাঝে কাজ একটু নিয়মছাড়া হলে ভিতরে ভিতরে কাহিল লাগে। তবে সে মুহূর্তের জন্যে। মনে স্থান দিই না সে সব ভাবনা। আশা যে মনে এখন বিস্তর। আশাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এরই মধ্যে কতগুলো জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি। বৃষ্টি আমার একদম সহ্য হয় না। বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত সহ শুকনোর দিনের বৃষ্টি। ভিজলে নির্ঘাৎ আমার শরীর খারাপ হবেই। বরং সেপ্টেম্বর অক্টোবরের বৃষ্টি অনেক ভালো। ঝড় বিদ্যুতের বালাই নেই। ঝরঝর করে খানিকটা ঝরে তারপর শেষ হয়। বছরে এখানে দুটো বর্ষাকাল।

দশ মাস তো হলো আমি আছি এই দ্বীপে। মুক্তির চিন্তা আর করি না। স্থানও দিই না মনে। মুক্তি আমার নেই এটাই ধরে নিয়েছি। আমি বোধহয় প্রথম মানুষ যার পায়ের ছাপ এতদিনে এই দ্বীপে পড়ল। বোধহয় বলি কেন, এটাই ঠিক। আর কেউ এলে তার কোনো না কোনো চিহ্ন আমার ঠিকই নজরে পড়ত। তবু একটা কাজ এখনো বাকি। তা হলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বীপটাকে একবার পর্যবেক্ষণ করা।

এবং সে কাজে পনেরোই জুলাই থেকেই লেগে পড়লাম। প্রথমে যাব খাঁড়ির দিকে। আমার ভেলা এনে ওখানেই প্রথম ভিড়িয়ে ছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম মাইল

দুয়েক পথ। দেখি ঢেউ এদিকটায় কম। নদীটাও এদিকে খুবই সঙ্কীর্ণ। কুল কুল করে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে। জল এখন হাঁটু সমান। এটা তো টানের সময় তাই। এই যা জল, এতে নৌকো বাওয়া অসম্ভব।

আর কী চমৎকার মাঠ নদীর ধারে! ঘাসের যেন মখমল বিছিয়ে রাখা। খোলা আকাশের নিচে উদার উন্মুক্ত বিশাল এক ক্ষেত্র। মনে হয় বর্ষার দিনে এই মাঠে জল ওঠে। তবে পুরোটাতে নয়। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেছে প্রান্তদেশ। সেখানে কত বিচিত্র যে গাছ গাছালি। বিস্তর তামাক গাছ। আকারে বেশ বড় বড়। সচরাচর এমন তামাক নজরে পড়ে না। আরো সব কত কি গাছ, তরতরে সবুজ তাদের পাতা। চিনি না আমি। দেখি নি আগে কোনোদিন।

ক্যাসাভা গাছের মূল থেকে আদিবাসীরা রুটি বানায়। খুঁজলাম তাই আঁতিপাঁতি। পেলাম না। দেখি আখ হয়ে রয়েছে বিস্তর। মস্ত বড় বড়। কেউতো আর চাষ করে নি, তাই বুনো বুনো ভাব, আর গায়ে গায়ে লেগে যেন গভীর এক জঙ্গল। আজ এইটুকুই থাক। মোটামুটি যা আবিষ্কার হলো আমি খুশি। এতটা যে দেখতে পাব এমন আশা করে তো বের হই নি। আরো দেখার প্রয়োজন আছে। তবে চিনি না যে বিশেষ কিছু। ব্রাজিলে থাকতে খেয়াল করে তো দেখি নি কোনোদিন। কোনটা কোন গাছ, কী তার উপকার এগুলো জেনে রাখা অনেক ভালো। তাহলে বিদেশ বিভুঁয়ে অনেক সময় উপকার হয়।

পরদিন ষোলো তারিখ। একই পথ ধরে এগোলাম। তবে এগিয়ে গেলাম আজ আরো খানিকটা পথ। এদিকে প্রকৃতির ভিন্ন রূপ। ঘাস কমতে কমতে ঘন সবুজ বনানী। বড় বড় গাছ। তাতে অজস্র ফল। কত যে মৌসুম কত আঙুর আরো কত কী আমি বলে বোঝাতে পারব না। থোকায় থোকায় আঙুর, আর কী মিষ্টি! খেলাম কয়েকটা। বেশ স্বাদ। তবে বেশি নয়। নিজেকে সংযত করলাম। শুনেছি এই জাতীয় ফল খাবার পরিণামের কথা। বন্দিদের ছেড়ে দিত এমনই সব নির্জন দ্বীপে। আঙুর খেত খুব। তারপর জ্বর হতো। সে জ্বর আর কমার নয়। তবে আমার তো আর অত খাবার প্রয়োজন নেই। এটা শুকনোর দিনের সঞ্চয়। পানীয় জলের অভাবে গলা ভেজাতে পারব, তৃষ্ণা মিটবে আকণ্ঠ। কিছুটা কিছুটা করে তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়েও রাখতে পারি। তখন হবে কিসমিস। দু এক দানা মুখে ফেলে চুষব। সেও তো একটা অন্য ধরনের খাবার।

সারাদিন সেখানেই কাটল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আসুক, আজ আর বাড়ি ফিরব না। দরকার কী ফেরার। এই তো ফলফলাদি মজুত। একটা রাত কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বরং বাড়ি ফিরলে কাল আবার এতদূর উজিয়ে আসতে হবে। তারপর ফের এগোনো। দরকার কী অনর্থক বেশি হাঁটার। তখন কাছের একটা গাছে উঠলাম। বাঁধলাম শক্ত করে নিজেকে গাছের সঙ্গে। তারপর ঘুম। তাঁবু গাড়ার পর এই প্রথম আমি বাইরে ঘুমোলাম। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল। শুরু হলো ফের হাঁটা। এগিয়ে গেলাম আরো প্রায় মাইল চারেক। চলেছি উত্তর মুখো। ডাইনে পাহাড়ের রেখা। দক্ষিণ থেকে উত্তর আগাগোড়া বলতে গেলে পাহাড়।

এদিকটা মোটামুটি ফাঁকা। গাছপালা বিশেষ নেই। একটা মোটে ঝরনা। তাতে টলটল করছে সুস্বাদু পানীয় জল। পাহাড়েরই বলতে গেলে লাগোয়া। আর অবাক কাণ্ড। এত সাজানো গোছানো এই দিক! এটা পশিচম। মনে হয় যেন কেউ গাছগুলোকে হাতে করে বসিয়েছে। কোনো নিপুণ মালী। আমার ভারি অবাক লাগছে।

উপত্যকা এটা। দেখতে দেখতে চলেছি। অপূর্ব এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আর মনে খুব খুশি খুশি ভাব। এই সারা দ্বীপ, এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই ঝরনা এই

গাছগাছালি—সব কিছুর, আমি একচ্ছত্র অধিপতি। কেউ পারবে না এর মালিকানা আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে। ইংল্যান্ডের যেকোনো সামন্ত প্রভুর চেয়ে আমার জমিদারীর পরিমাণ কম নয়। দেখি বিস্তর কোকো, কমলালেবু, লেবু, আর জামির গাছের ছড়াছড়ি। ফল ধরে নি। বুনো গাছ তো। তাই ফল ধরে না। বা ধরলেও তেমন সুস্বাদু হয় না। বাতাপি পেলাম অনেক। কাঁচা। মাটিতে ঝড়ে পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিলাম ভিতরটা দেখি টকটকে লাল। জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরে অনেক খেয়েছি। অপূর্ব স্বাদ। আঃ প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়।

এবার ফেরার পালা। সঙ্গে বিস্তর বাণিজ্যের পশরা। বাণিজ্যই বলব একে, না অন্য কিছু? আঙুর প্রচুর, সেই সাথে বাতাপি, আর বিস্তর মৌসুম্বি লেবু। কিন্তু নেই কীভাবে? তখন টাল দিয়ে সাজিয়ে রাখলাম পাশাপাশি। নিলাম অল্প স্বল্প। যতটা পারা যায় জামায় বেঁধে। থাক আজ বাকিটা এই অবস্থায়। কাল আসব থলি নিয়ে। তাইতে করে সব নিয়ে যাব।

প্রায় তিনদিন পর বাড়ি ফিরলাম। সে যা আনন্দ আমার। তাঁবুটাকেই আপাতত বাড়ি বলতে শুরু করেছি। আর সেই গুহা। এসে দেখি আঙুরগুলো সব পচে গেছে। পাকা তো ছিল খুব। বেঁধেছি জামায় শক্ত করে। সে চাপ আর সহ্য করতে পারে নি। বাতাপি আর মৌসুম্বির কোনো বিকার নেই। তবে দুঃখ এই—এত বড় বড় ফল, পারি নি একসাথে অনেকগুলো আনতে।

পরদিন উনিশ তারিখ। গেলাম ফের। সঙ্গে দুটো থলি। অবাক কাণ্ড, পৌঁছে দেখি কাল যে টাল দিয়ে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম ভাগে ভাগে ফল—কে যেন দিয়েছে সব তছনছ করে। লণ্ডভণ্ড বলতে যা বোঝায়। ঠিক যেন দাপাদাপি করে পায়ে পিষে দলিয়ে দেওয়া। নির্ঘাৎ কোনো জানোয়ারের কাজ। আমি হলফ করে বলতে পারি। আমার অজ্ঞাতসারে এসে এই কাণ্ড করে গেছে।

আর তো ওগুলো নেওয়া যায় না। তখন চলল নতুন করে আর এক দফা সংগ্রহের পালা। বিস্তর আঙুর নিলাম। সঙ্গে বাতাবি আর মৌসুম্বি। বেদম ভারী। তবে এক কাজ করা যাক। আঙুর আর বাড়ি অব্দি নিয়ে যাব না। দেখেশুনে উঁচু মতো একটা গাছে থলিটা ঝুলিয়ে দিলাম। রোদ পাবে এখানে। তাতে শুকোবে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে একদিন এসে নিয়ে যাব। আজ বরং বাতাবি আর মৌসুম্বিই নিয়ে যাই।

মোটামুটি বেশ লাগছে এখন। সাম্রাজ্য আবিষ্কারের কাজ শেষ। খাদ্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন নতুন করে আস্তানা গড়ার সমস্যা। কোথায় করি সেটা। মন ছুটে যায় পশ্চিমের সেই অংশে, সাজানো বাগানের মতো সেই যে দিক। ইচ্ছে করে ফাঁকা মাঠে তাঁবু গেড়ে সুস্থির হয়ে বসবাস করি। কিন্তু তাতে সমস্যা অনেক। প্রথমত মালপত্র টেনে নিয়ে আসা এক ঝামেলা। তার উপর যদি সমুদ্রের কাছ থেকে সরে অন্য দিকে যাই তবে সমুদ্র দেখার যে একটা প্রয়োজন আছে—কোনোদিন যদি দেখা পাই কোনো জাহাজের, কিংবা আমারই মতো কোনো হতভাগ্য যদি ভাসতে ভাসতে এসে দ্বীপে ঠেকে—তার আর পরিচর্যা করা হবে না। কিংবা জাহাজ এলে সেটা দেখাও যাবে না। মোটমাট এ জায়গা ছেড়ে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

তবে হ্যাঁ আলাদা একটা ডেরা করা দরকার। বাসা যেরকম। একটু দূরেই নতুন একটা তাঁবু গাড়া হলো। মোটের উপর খোলামেলা চারধার। চারপাশে বেড়া দিলাম। গাছের ডাল কেটে সারি সারি তাই পুঁতে দেওয়া। তাঁবুর চারধারে পালা আর মাথার উপর ত্রিপল। গোটা ব্যাপারটাই একটা মাচার উপরে। অর্থাৎ তাঁবুতে ঢুকতে গেলে আমাকে মই

বেয়ে প্রথমে মাথায় উঠতে হয়, তারপর তাঁবু। নিরাপত্তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত। সব মিলিয়ে খাটতে হলো আমাকে জুলাই মাসের বাকি কটা দিন। আগস্টের শুরু থেকে নতুন তাঁবুতে রাত কাটানো শুরু করলাম।

কিন্তু কদিন কাটতে না কাটতে তুমুল বৃষ্টি। সে কি আর তাঁবুর ত্রিপল পারে রুখতে। তখন ঢুকলাম গিয়ে ফের গুহায়। আমার তো বৃষ্টিতে ভেজা বারণ। ভিজলেই না আবার জ্বরের কবলে পড়ি। জ্বর নিয়ে আমার আতঙ্ক কিন্তু এখনো আছে।

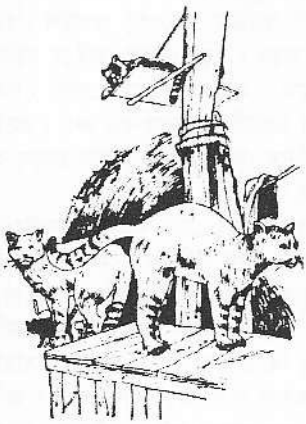

এদিকে বলতে ভুলে গেছি, ঝড় বাদলের সম্ভাবনা দেখে তিন তারিখ গিয়েছিলাম সেই আঙুর বাগানে, ঝোলানো সেই থলি নিয়ে এসেছি। শুকিয়েছে চমৎকার। যদি বৃষ্টি পড়ত তবে তো পচে গলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ভালোই হলো। বর্ষার দিনে তো বাইরে বের হওয়া ঝঞ্ঝাট। চলবে প্রায় অক্টোবর অব্দি। তখন এগুলো দিয়েই যেমন করে হোক ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজ হবে।

এদিকে পরিবার পরিজন ক্রমশ কিন্তু বাড়ছে। দুটো বেড়ালের মধ্যে একটা আছে, আরেকটা পালিয়ে গিয়েছে সেই কবে। তারপর থেকে সে আর আসে না, বা বনে বাদাড়ে ঘুরে দেখাও পাই না কোনোদিন। ধরে নিয়েছি সে আর জীবিত নেই। ওমা, দেখি বর্ষা পড়তে না পড়তে শ্রীমতি বিড়ালনি তিন তিনটা বাচ্চা সমেত গটগটিয়ে সটান গুহায় এসে হাজির। আমি তো হতবাক। আমার বাকি বিড়ালটাও মাদী। এ তাহলে বাচ্চার মা হলো কোত্থেকে? একটা বনবিড়াল মেরেছিলাম একদিন এটা ঘটনা। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে তো বুনো ভাব এতটুকু নেই। তবে নির্ঘাৎ এখানে এমনি বিড়ালও আছে।

দেখতে না দেখতে বছর দুইয়ের মধ্যে গুহা আমার বেড়ালে বেড়ালে সয়লাব। সমানে দুটোতে বাচ্চা বিয়োয়। এদিকে পুরানো বাচ্চারাও ক্রমে সাবালক হচ্ছে। তাদেরও পড়ে গেছে বাচ্চা দেবার ধুম। আমার তো ত্রাহি ত্রাহি হাল। তাড়িয়ে দিলেও যায় না। শেষে কটাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হলাম। দূরে পার করে দিয়ে এলাম কটাকে। তবে যা শান্তি।

১৪ আগস্ট থেকে ২৬ তারিখ অব্দি সমানে বৃষ্টি। যেন মুহূর্তের জন্যেও কামাই নাই। আমার তো বের হওয়া একদম বন্ধ। বাপরে বাপ, ভুলেও আর বৃষ্টিতে ভিজি! এদিকে খাবারের আকাল। তখন বাধ্য হয়ে বৃষ্টি একটু থামতে বেরিয়ে পড়লাম। একবার নয়,

মোট দুবার। একদিন মারলাম একটা ছাগল, আরেকদিন আস্ত এক কাছিম। সঙ্গে কিসমিস তো আছেই। তোফা ব্যবস্থা। সকালে ঝলসানো ছাগলের মাংস, সঙ্গে একমুঠো কিসমিস, বিকেলে কখনো মাংস নয়ত কাছিমের ডিম। রান্না করার উপায় নেই, কেননা বাটি নেই একটাও আমার সাথে। যদি থাকত তবে ঝোলটোল যাহোক রেঁধে কদিন বেশ দারুণ আয়েস করা যেত।

তাই বলে বসে নেই চুপচাপ। বসে থাকলে হাত আমার নিশপিশ করে। গুহাটাকে একটু একটু করে বড় করছি। খুঁড়ছি রোজ। একদিন দেখি খুঁড়তে খুঁড়তে সটান বাইরে এসে উঠেছি। আমার বেড়াটা ছাড়িয়ে আরেকটু ওপাশে। ভালোই হলো। এটাকে এবার থেকে দরজা বলে ব্যবহার করব। তবে বেড়ার বাইরে হলো দরজাটা। এটাই যা একটু দুশ্চিন্তা। মুখ আগলাতে হবে। নইলে এভাবে খোলা মেলা রেখে নিশ্চিন্তে তো আর ঘুমোনো যায় না। জীবজন্তুর ভয়টাই সবচেয়ে বড় কথা। তবে তেমন কিছু হিংস্র জন্তু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এতদিনে দেখেছি মোটে কটা ছাগল আর ভাম। এছাড়া অন্য কিছু আছে বলে তো মনেও হয় না।

৩০ সেপ্টেম্বর ॥ আমার জীবনের সেই চরমতম দুর্ভোগের দিন। আজ ঠিক একবছর পূর্ণ হলো এখানে আসার পর। দাগ মিলিয়ে দেখলাম ঠিক তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। সারাটা দিন ছিলাম অনাহারে। কূলে পড়েছিলাম বেহুঁশের মতো। তারপর ডাঙ্গা। তারপর অচেতন। মৃত্যুর মুখোমুখি হবার যে কত যন্ত্রণা সেদিন আমি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছি। আজও একইভাবে আমি অনাহারে কাটালাম। সারাদিন প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে।—হে করুণাময়, আমাকে ক্ষমা কর, মুক্তি দাও। আমি পাপী। আমি বহু অন্যায় করেছি। তুমি আমার সব পাপ স্খালন কর। এইভাবে রইলাম টানা বারো ঘণ্টা। এক আঁজলা জল অব্দি মুখে তুলি নি। তারপর সন্ধ্যা ঘনাতে বিস্কুট খেলাম, আর কিসমিস। মাংস সেদিন আর স্পর্শ করলাম না। তারপর সটান বিছানায়। শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে ঘুম নামল।

দিনের হিসেব রাখতে গিয়ে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। রবিবার উপাসনার দিন। দাগ কাটার সময় সেটা আর আলাদা ভাবে মার্কা রাখি নি। বস্তুত প্রথম দিকে রাখবার প্রয়োজন আছে বলেও বোধ হয় নি। ধর্মের দিকে তেমন তো মতিগতি ছিল না। এখন যেহেতু রোজ প্রার্থনা করি, রোজ পড়ি বাইবেল, তাই মনটা কেবলই উসখুস করে। তখন গোড়া থেকে ফের হিসেবে করে করে রবিবারগুলো ঠিক করলাম। এবার থেকে রাখতে হবে রবিবারের হিসেব। দাগটা একটু বড় করে দিলেই বুঝতে পারা যাবে। মোটমাট উপাসনার দিন এবার আর একটিও আমি বাদ যেতে দেব না।

এদিকে কালির সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। সেটা আমার কাছে নিদারুণ আশঙ্কার বিষয়। এখন থেকে শুধু দিনপঞ্জী ছাড়া অন্য কিছু লেখা চলবে না।

কোনটা টানের সময় আর কোনটা বর্ষাকাল সেটাও এতদিনে আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেইভাবেই মোটামুটি নিজের কার্যক্রম রচনা করি। কিন্তু শুধু দেখে তো আর হয় না, ঠেকেও অনেক কিছু শিখতে হয়। একেকটা ঘটনা ঘটে আর মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বুঝতে শেখে, জানতে শেখে। যেমন আমার চাষের সেই প্রথম বার। ঘটনাটা কী বলি।

একদম প্রথম বারের ফেলে দেওয়া সেই বীজ, তার যা ফসল আমি তো রেখে দিয়েছি জমিয়ে। ভাবলাম, আসছে বর্ষাকাল, এবার একটু হিসেব মতো চাষবাস করি।

জায়গা ঠিক করলাম। খুঁড়লাম নিজের যা যন্ত্রপাতি আছে তাই দিয়ে। যব আর ধান মিলিয়ে সঞ্চয় আমার প্রায় দু মুঠো। একবার ভাবলাম সবই ছড়িয়ে দিই। পরে ভাবলাম থাক, বরং এক মুঠো সঞ্চয়ে থাকুক। যদি কোনো কারণে ফসল না ফলে!

তখন এক মুঠো রেখে বাকি এক মুঠো ছড়ানো হলো। দিনের পর দিন যায়, দেখি অঙ্কুর গজাবার আর লক্ষণ মাত্র নেই। হবে কোত্থেকে? তারপর কি আর বৃষ্টি হয়েছে? রোদের তেজ যে ভীষণ। মাটির বুকে যেটুকু জল ছিল তাও নিয়েছে শুষে। সব চেষ্টা আমার বিফলে গেল।

তারপর এল বর্ষাকাল। নতুন একটা জায়গা ঠিক করলাম। আমার মাচানের ঠিক কাছ বরাবর। জমি তৈরি হলো। বীজ ছড়ালাম। দেখি কদিনের মধ্যেই অঙ্কুর গজিয়েছে। সে যে কী আনন্দ আমার! দেখতে দেখতে বড় হলো গাছ। তাতে দানা হলো। যব আর ধান মিলিয়ে সে অনেকখানি। আমি সব জমিয়ে রেখে দিলাম।

ততদিনে আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ বনে গেছি। ঐ যে বলে না, ঠেকে মানুষ শেখে। একবার বীজ নষ্ট হলো বলেই না আমি প্রকৃত বর্ষাকাল কোনটা জানতে পারলাম। খরার সময় বাদ দিয়ে দুই বর্ষায় আমি এর পর থেকে দুবার করে বীজ বুনতাম। তাতে মোটামুটি প্রচুর ফসল হতো।

আরো একটা আবিষ্কার হলো। আবিষ্কারই বলব, কেননা আচমকা যে উপপত্তি জন্মে তাকে আবিষ্কার বলতে কোনো বাধা নেই। মাচান ঘিরে সেই যে বসিয়েছিলাম নানান গাছের ডাল, দেখি তারই কটা থেকে বর্ষার জল পেয়ে বেশ চমৎকার ডালপালা বেরিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা কুঞ্জ। অদ্ভুত সেই আবিষ্কার। কিন্তু পাতা তো পুরোপুরি তখনো হয় নি। কদিন ধরে দেখে দেখে আমি মোটে হদিশ করতে পারি না কোনটা কোন গাছ থেকে কাটা, কোনটার নাম কী। শেষে দেখি উইল গাছ। বেশির ভাগই তাই। দু একটা আলাদা। তখন চটপট আরো কটা ডাল কেটে বসিয়ে দিলাম আমার তাঁবুর দেয়াল ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে সার বেঁধে। বছর তিনেকের মধ্যে সে এক রীতিমতো বেড়া। গাছগাছালিতে ঘেরা অদ্ভুত মনোরম এক পরিবেশ।

ছায়ার ছায়াও আছে আবার বেড়া বলেত যা বোঝায় অনেকটা তাই। রোদের তাপ বাড়লে এখন আর আগের মতো কষ্ট হয় না।

অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ফেলে এবার বসলাম খাতা কলম নিয়ে। মাসগুলোকে ঋতুমাফিক সাজিয়ে ফেলতে হবে। ইউরোপে যেমন দুটো প্রধান ঋতু—শীত আর গ্রীষ্ম, এখানে তো তা নয়। এখানে বর্ষা আর গ্রীষ্ম। জলের সময় আর টানের সময়। তালিকাটা মোটামুটি এই রকম :

ফেব্রুয়ারির শেষার্ধ মার্চ এপ্রিলের প্রথমার্ধ	বর্ষাকাল। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার বরাবর বা কাছাকাছি।
এপ্রিলের শেষার্ধ মে জুন জুলাই আগস্টের প্রথমার্ধ	গ্রীষ্ম। খরার সময়। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার উত্তরে।

আগস্টের শেষার্ধ সেপ্টেম্বর অক্টোবরের প্রথমার্ধ	বর্ষাকাল। সূর্যের অবস্থান আবার বিষুবরেখা বরাবর।
অক্টোবরের শেষার্ধ নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধ	গ্রীষ্ম। খরা। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার দক্ষিণে।

বর্ষাকালটা যেমন আমি দেখালাম তালিকায়, হুবহু সেই মতো নয়। কখনো তালিকার চেয়ে আরো বেশি দিন স্থায়ী হয়, কখনো বা স্থায়িত্ব কিছুটা কমে। সব নির্ভর করে বাতাসের উপর। তবে মোটের উপর গড় হিসেব মতো দ্বীপে বর্ষাকাল বলতে বছরের চারটে মাস। আমি আর তখন বাইরে বের হই না। গুহার মধ্যে থাকি, আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখি আমার খাদ্য সামগ্রী। তাছাড়া বসে বসে করার মতো কাজও কিছু রেখে দিই এই কটা মাসের জন্যে। সময় দেখতে দেখতে কেটে যায়।

যেমন এই এ বছর করার মতো বিস্তর কাজ হাতের গোড়ায় মজুত। শুধু উপকরণে অভাব এটাই যা বড় কথা। ঝুড়ি বানাতে হবে কয়েকটা। তার জন্যে চাই বেত বা বেতের মতো অন্য কোনো গাছ। বানানোর কৌশল আমি ছোট বেলা থেকেই জানি। বাড়ির কাছে ছিল একটা ঝুড়ি তৈরীর কারখানা। যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে দেখতাম তার সৃজন কৌশল। আর বালক বয়েসের যা ধর্ম—নিশপিশ করত নিজের দুহাত, আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতাম, এগিয়ে দিতাম এটা ওটা। তাতে জ্ঞান বেশ ভালোই জন্মেছে। কিন্তু ঐ যে অভাব-উপকরণ নেই। সারা দ্বীপে নেই কোনো বেত গাছ। এ অবস্থায় কী করে ঝুড়ি বানাই।

তখন ভাবতে ভাবতে মাথায় একদিন একটা ফন্দি খেলে গেল। আচ্ছা, ঐ যে উইল গাছের কচি কচি ডাল—আমার মাচানের পাশে জন্মেছে বা দেয়ালের ধারে,—যদি তাই দিয়েই বানাবার চেষ্টা করি! ইচ্ছেমতো দোমড়ানো যায়, ভাঙে না—আর সব ডালের মতো মট করে, শুধু ডালগুলো ছোট ছোট আকারের হবে, এটাই যা অসুবিধে। বেশ তো, নয় একবার চেষ্টা করেই দেখি।

তখন কেটে আনলাম একরাশ কচি কচি ডাল। বেতের চেয়ে সামান্য একটু মোটা। তাকে ফালি ফালি করে কঞ্চি মতো করলাম। বিস্তর কঞ্চি এইভাবে জমা হলো। এবার তৈরির পালা। নেমেছে বর্ষা। চেষ্টা করে দেখি—বারে, চমৎকার, ঝুড়ি তো সত্যি সত্যি একটা তৈরি হলো! তখন আরো একটা, তারপর আরো, আরো। সুঠাম বুনুনি। সুবিধে হলো খুব। মাটি বইতে হয়, এটা ওটা রাখার দরকার পড়ে—কোথায় পাব অত বাসনপত্র! পরে ধান আর যবও এই ঝুড়িতে করে রেখে দিতাম।

মিটল একটা সমস্যা। এবার আরেকটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে। একটি নয়, বলতে ভুল হয়েছে, দুটি। জল জাতীয় কোনো কিছু রাখব—মাত্র কটা বোতল আর একটা কেটলি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। অর্থাৎ সর্বপ্রথম জল রাখার একটা পাত্র চাই আর চাই দু একটা বাটি বা ঐ জাতীয় কিছু। ঝলসানো মাংস খেতে খেতে মুখ একেবারে বিস্বাদ

হয়ে গেছে। দু একদিন ঝোল টোল রেঁধে খেতে সাধ হয়। নিদেনপক্ষে সেদ্ধ বা ঐ রকমই অন্য কিছু। কিন্তু পাত্রের অভাবে পারি না সে ব্যবস্থা করতে। চটপট আমার কিছু পাত্র চাই।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম। বিস্তর ডাল পালা কেটে লাগিয়ে দিলাম দেয়ালের কিছুটা দূরে সার বেঁধে। আগে যে একটা লাগিয়েছিলাম এ তারই সম্প্রসারণ। বলতে গেলে কটা মাস এই কাজেই কাটল।

তখনো হাতে কিছু সময় আছে। ফের আসবে বর্ষা। এখনো সারা দ্বীপ ঘুরে দেখা আমার শেষ হয় নি। পাহাড়ের একটা দিকই মাত্র ঘুরে এসেছি। আরেক দিক এখনো বাকি। তাই বেরিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে বন্দুক, কুঠার, বেশ খানিকটা বারুদ আর আমার কুকুর। বিস্কুট আর কিসমিসও নিয়েছি অনেকখানি। ঝলমল করছে রোদ। পশ্চিম নয়। এবার যাব পুবের দিকে। যতদূর অনুমান গোটা দ্বীপের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো।

কোথায় যে দ্বীপের প্রকৃত অবস্থান সেটা আমি এখনো অনুমান করতে পারি নি। কখনো মনে হয় আমেরিকার অংশ বিশেষ। স্পেনের কাছাকাছি। যদি সেটা ঠিক হয়, তবে নিকটের স্থলভাগে যে সব মানুষ বসবাস করে তারা আদিম প্রকৃতির। সভ্যতার ছোঁয়া এখনো লাগে নি তাদের গায়ে। আমার সান্ত্বনা এই, তাদের মাঝখানে গিয়ে পড়ি নি। তবে যে কী বিপদে পড়তাম তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এখন সেকথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি।

যদি স্পেনের উপকূলস্থ কোনো দ্বীপ এটা হয়, তবে জাহাজ আমি অতি অবশ্য দেখতে পাব। স্পেনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু জাহাজ যে কখনো পড়ে না নজরে। তবে কি এটা স্পেন এবং ব্রাজিলের মধ্যবর্তী কোনো উপকূলস্থ দ্বীপ? সে ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা প্রবল। এরকম অন্যান্য দ্বীপে আমি শুনেছি নরখাদক বর্বর মানুষ বসবাস করে। তারা অপরিচিত মানুষ দেখলে কেটে কুটে খায়। নৃশংসতায় তাদের জুড়ি মেলা ভার। আমার সৌভাগ্য আমি সেই জাতীয় কোনো দ্বীপে গিয়ে পড়ি নি।

এই সব চিন্তা করতে করতেই চলেছি এগিয়ে। পশ্চিম থেকে সোজা এবার পুবে। ভারি মনোরম সে অঞ্চল। রাশি রাশি ফুল গাছ। তাতে কী মিষ্টি কী সুন্দর দেখতে ফুল! কত তার রং! আর কাকাতুয়া। সে যেন অগুণতি। আর টিয়া। কথা বলতে পারে কাকাতুয়া। আমার ভারি ইচ্ছে হলো একটা ধরে নিয়ে যাই। তাক করে লাঠি ছুড়ে একটা বাচ্চা কাকাতুয়া জখম করলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। পোষ মেনেছ আমার। তাকে পরে আমি কথা বলা শিখিয়েছি। তবে এমন কিছু নয়। আমার নাম ধরে ডাকত। হয়তো শেখাতে পারতাম আরো অনেক কিছু। কিন্তু ঐ যে গোড়ায় সেই বাধা। লাঠি ছুড়ে আমি যে ওকে জখম করেছিলাম। সেটা হয়তো মনে রেখেছে। তাইতেই গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান।

আরো অনেক কিছু দেখতে পেলাম এ যাত্রায়। দেখি পুবের মাঠে হাজারে হাজারে খরগোশ আর অজস্র শেয়াল। সচরাচর যেমন দেখি আমরা সেরকম নয়। মাংসও তেমন একটা সুস্বাদু হবে মনে হয় না। গুলিতে মারা পড়ল অজস্র। মাংসের প্রয়োজনে নয়। এমনি খেয়াল গেল। চালিয়ে দিলাম গুলি। মাংসের প্রয়োজন মেটাবার মতো জীব আমি আবিষ্কার করেছি। ছাগল আর কাছিম। সঙ্গে কিসমিসের মতো মুখরোচক খাদ্য। আর কী চাই!

হাঁটলাম দীর্ঘ পথ। তবে একদিনে নয়। প্রতিদিন দু মাইল হিসেবে একটু একটু করে। আসলে পথ পরিক্রমা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য প্রতিটি অংশ খুটিয়ে দেখা। কী নতুন জিনিস পড়ে দৃষ্টির নিরিখে, তাকে ভালো ভাবে যাচাই করে দেখা। দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামে। তখন গাছের উপরে উঠে বিশ্রাম করি। নিজেকে বেঁধে নেই আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর ঘুম।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম একদিন সমুদ্রের ধারে। দেখে তো আমি অবাক। হায় হায়, এমন মনোরম জায়গা থাকতে আমি কিনা বেছে নিয়েছি বন্ধ্যা খটখটে শুকনো একটা পাহাড়ি এলাকা। এত দেখি হাজারে হাজারে কাছিম! কী বড় বড় আর অগণিত পাখি। মুরগি বলব না। তবে অনেকটা ঐ জাতীয়। পেঙ্গুইনও আছে। কী অপূর্ব তাদের বাহার। জানি না মাংসের স্বাদ কীরকম।

নিশপিশ করছে হাত। চালিয়ে দেব নাকি গুলি! মরবে ঝাঁকে ঝাঁকে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু লাভ কি। বরং এর চেয়ে একটা ছাগল মারলে আমার অনেক লাভ। মাংস অঢেল, চলে দুচার দিন। দেদার খাও। তবে হ্যাঁ, মারাটাই যা ঝমকারি। কাছে মোটে পারি না ঘেঁষতে। আসতে দেখলেই অমনি পালিয়ে যায়। তখন ওঠো পাহাড়ের উপর, তাক কর, তারপর টেপো ঘোড়া। তবে না পরিশ্রম সার্থক।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এদিকটা আমি যে অঞ্চলে থাকি তার চেয়ে অনেক বেশি মনোরম। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও প্রচুর। অর্থাৎ সুবিধে যাকে বলে। কিন্তু তথাপি আমি আমার আস্তানা ভেঙে এখানে এসে উঠতে রাজি নই। ওটা যে ঘর আমার। পাকাপাকি ব্যবস্থা। হোক তাঁবু, তাতে কী এসে যায়। তবু তো গোড়া থেকে ওখানেই আছি। মায়া পড়ে যায় না। পারে কেউ মায়া ত্যাগ করে ছেড়ে যেতে? অসম্ভব। আর কেউ পারুক কি না পারুক আমি পারব না। এই নির্জন পরবাসে এই একটা জিনিসই তো আমার নিজস্ব। এই ঘর। আমি এসেছি এখানে, মনে হয় যেন বেড়াতে এসেছি। কদিন পরে আবার ফিরে যাব বাড়িতে। প্রায় মাইল বারো দূর তো বটেই। আর ভালো লাগছে না। এবার ফিরতে হবে। তা এলাম যে এতদূর, একটা খুঁটি নয় কোথাও গেড়ে রেখে যাই। সমুদ্রের পাড়ে। সেটা হবে আমার এতদূর পরিভ্রমণের চিহ্ন বিশেষ। পরের বার ঘুর পথে আবার আসব এদিকে। চিহ্নটা দেখে বুঝতে পারব এর পরের জায়গাগুলো আমার আগেই ঘোরা হয়ে গেছে।

আর ফেরার ব্যাপারেও ভিন্ন একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। এসেছি যে পথে, সে পথে আর ফিরব না। যাব নাক বরাবর। দেখি কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারি।

খুঁটি পুঁতে আমি তো সেই ভাবেই রওনা হলাম। দুতিন মাইল হাঁটার পর দেখি মস্ত একটা উপত্যকা আমার সামনে, এখান থেকে কোন পথে যে বের হব সেটা আর ঠিক করতে পারি না। অর্থাৎ পথ ভুল। এদিকে পাহাড়ে বনও বেশ গভীর। সূর্য দেখে একমাত্র এ অবস্থায় পথ ঠিক করা যায়। কিন্তু আকাশে সকাল থেকেই আজ মেঘলা ভাব। সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। ফলে চিনবার রাস্তাও বন্ধ।

দুর্ভোগের সে যেন চরম অবস্থা। তিনদিন ধরে সমানে মেঘলা। তিন তিনটে দিন আমি সেই উপত্যকায় অন্ধের মতো পাক খেয়ে ঘুরে বেড়ালাম। শেষে মরিয়ার মতো সামনে যে রাস্তা তাই ধরেই সটান বেড়িয়ে পড়লাম। বেশ খানিকটা পথ গিয়ে দেখি সমুদ্র। খুঁজতে খুঁজতে খুঁটিটা পেলাম। ঢের হয়েছে বাপু। কাজ নেই আর অভিযানে। এবার ভালোয় ভালোয় যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরে যাই বাড়িতে।

হলো তাই। এদিকে গরমও পড়েছে খুব। ভ্যাপসা ভাব। হাঁটতে চলতে ভারি কষ্ট। সঙ্গে আবার আমার বন্দুক বারুদ আর এটা ওটা নানান যন্ত্রপাতির বোঝা। বোঝা বয়ে নিয়ে হাঁটা যেন আরো কষ্টকর।

ফেরার পথে কুকুরটা গিয়ে তেড়ে ধরল একটা ছাগলছানাকে। আমি হাঁই-মাই করে ছুটে গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। নইলে নির্ঘাৎ জানে মারত। দেখি পায়ে বেশ চোট। কামড়ে ধরেছিল যে ঠ্যাং খানা। তা মন্দ কি। নয় নিয়েই যাই বাড়িতে, পুষব। আমার তো বহুদিনের সাধ এরকম কটা ছাগল টাগল পুষি। তাতে লোকসানের চেয়ে লাভই বরং বেশি। অনটনের দিনে আয় দেবে। মাংসের দরকারটাকে তো আর অবহেলা করা যায় না।

জল আসতে চায় চোখ ফেটে। কিন্তু আসে না।

তখন গলায় বাঁধবার মতো এক টুকরা দড়ি পাকিয়ে নিলাম। আর বেড় দেবার জন্যে একটা ফিতে মতো। সেটাও দড়ির মতো ঘাস পাকিয়ে তৈরি। বাঁধলাম গলা। টানতে টানতে নিয়ে চললাম। দেখি হাঁটতে আর পারে না। তখন কোলে নিলাম। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ সম্ভব। বোঝার উপর যে শাকের আঁটি। বাড়িতে পৌঁছবার আগে পড়ল আমার গাঁয়ের বাড়ি, অর্থাৎ সেই মাচান। তার চারপাশে ঘন গাছের বেড়া। তারই মধ্যে দিলাম ছেড়ে। আমি বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

ওঃ, ফিরে অব্দি সে যা আনন্দ আমার! একেই বোধহয় বলে বাড়ির টান। সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়। যেন দুহাত বাড়িয়ে নরম উষ্ণ আদর আমাকে বুকে টেনে নিল। প্রায় একমাস শুই নি নরম বিছানায়। বাইরে বাইরে কাটিয়েছি রাত। আজ ঘুমোব নিশ্চিন্তে। কোনো উদ্বেগ থাকবে না আমার মনে। ঘুমটাও ভারি চমৎকার হবে।

এক হপ্তা বলতে গেলে টানা বিশ্রাম। ঘর থেকে যেন মোটে বের হতেই ইচ্ছে করে না। শুয়ে বসে আলস্যে কেটে যায় সময়, শুধু কাকাতুয়ার জন্যে একটা খাঁচা বানালাম। বানাবার অবিশ্যি দরকার নেই, কেননা এ কদিনে রীতিমতো পোষ মেনে গেছে আমার। আদর করে নাম দিয়েছি পোল। এখন না ডাকলেও কাছে চলে আসে, কাঁধের উপর উঠে

বসে থাকে চুপটি করে। খাঁচা বানাতে বানাতেই হঠাৎ যেন হুঁশ হলো আমার।—তাইত, ছাগল ছানাটাকে যে সেই থেকে বেঁধে রেখে এসেছি আমার মাচান বাড়িতে, তার খবর তো আর নেওয়া হয় নি। অমনি ছুটলাম পড়ি কি মরি করে। পৌঁছে দেখি, আহারে বেচারা করুণ চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নাগালের মধ্যে একটা পাতা কি একটু ঘাসও নেই। রোগা হয়ে গেছে খুব। ইস, কী ভীষণ পাপী আমি? না জানি কবে থেকে এই হাল! অমনি চটপট কটা পাতা দিলাম এনে ছিঁড়ে। আঁচলা ভরে জল এনে দিলাম। ধরলাম মুখের কাছে। সোঁ সোঁ করে এক টানে খেয়ে নিল। আর পাতা তো চোখের নিমেষে উধাও। এনে দিলাম আরো। মোটমাট এইভাবে খানিকটা সুস্থ করে দড়ি ধরে নিয়ে চললাম বাড়ির দিকে। দড়িটা এখন বাহুল্য। কেননা পোষ ইতোমধ্যেই মেনে গেছে। ক্ষুধার মুখে খাবার দিলে কে না মানে পোষ! আমাকে টানতে হচ্ছে না, দেখি নিজের থেকেই লাফাতে লাফাতে চলছে আমার পিছন পিছন।

এদিকে বর্ষাকাল ততদিনে সমাগত। এটা মরশুমের দ্বিতীয় বর্ষা। ফের সেই ৩০ সেপ্টেম্বর। আমার এই দ্বীপে অবস্থানের দ্বিবার্ষিকী। অবস্থা একই রকম আছে। আমার মুক্তির আশা ক্রমশই মন থেকে উধাও হতে শুরু করেছে। তবু দিনটিকে আগের বারের মতোই উদ্‌যাপন করলাম। অনাহারে রইলাম বারো ঘণ্টা। ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানালাম বারে বারে।—ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর। আমি মুক্তি আর চাই না। এখানেই থাকতে চাই। জানি না মানুষের মাঝখানে গেলে আমি আর এই দুর্লভ সুখ পাব কি না। আর সত্যি সত্যি কীসেরই বা দরকার আমার মুক্তির। এইতো আছি বেশ। এই একাকীত্ব একটু একটু করে আমার সহ্য হয়ে গেছে। অভাব বোধটাও এখন আর নেই। কীসের অভাবই বা এখানে, আছে তো সব কিছুই। অঢেল মাংস, অঢেল কাছিমের ডিম, পাখি, পায়রা, মুরগি, বিড়াল, শেয়াল আরো কত কী। গাছে আছে থোকা থোকা আঙুর আর বাতাপি আর মৌসুম্বি আরো কত নাম না জানা ফল। আছে তামাক; আরো কতরকম উদ্ভিজ্জ। সর্বশেষ যে অভাব তা-ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ হয়েছে। আমি নিজেই এখন খাদ্যশস্যের চাষ করতে সক্ষম। সুতরাং কেন তবে আর ফিরে যাবার জন্যে আকুলতা!

এ এক অপার অনন্ত শান্তির রাজত্ব। তুলনা করি মাঝে মাঝে আমার পুরানো দিনের সাথে। দুইয়ের মধ্যে ফারাক যেখানে সেখানে, যতখানি বা যত বিশাল, সব হিসেব করে দেখি। ও জীবনে আর আমার কোনো মোহ নেই। থাকবেই বা কেন, কী আছে আমার দেশে যে মোহ থাকবে? আমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমি আর আগের মতো ভাবতে পারি না। পারি না আগের মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে তার যেকোনো মূল্য নেই এই নির্জনতার মধ্যে। নেই কোনো প্রয়োজন। তবে কেন আর সভ্য দুনিয়ার জন্যে আকুলি বিকুলি!

তবু পারি না নিজেকে মাঝে মাঝে বাগ মানিয়ে রাখতে। ছটফট করে ওঠে মন। হয়তো বেরিয়েছি রোজকার নিয়মতো বন্দুক কাঁধে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো দুমড়ে মুচড়ে গুমড়িয়ে উঠল মনের ভিতরটা। যেন অদম্য অব্যক্ত যন্ত্রণা এক। আমি যে বন্দি, এ তারই যন্ত্রণা। এই বন্দিদশা আমার আর ঘুচবার নয়। কেউ পরায় নি হাতে শৃঙ্খল, পায়ে দেয় নি বেড়ি, বা কোনো কারাগারে আটকও করে নি, তবু এ যেন দুনিয়ার সব কারাগারের বাড়া। চারপাশে ঐ অসীম অনন্ত জলরাশি যেন কারাগারের দুর্লঙ্ঘ্য এক পাঁচিল। পারব না কিছুতে হাজার চেষ্টা করেও ঐ পাঁচিল ডিঙ্গাতে। এই নির্জনতার মধ্যে থাকতে থাকতেই একদিন আমার আয়ু ফুরিয়ে আসবে। জানতে পারবে না কেউ আমার কথা। ভারি দুঃখের চিন্তা। তখন কান্না পায়। বুক ফাটিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে মন চায়। কিন্তু পারি না

কাঁদতে। কেঁদে লাভই বা কী। কে শুনবে আমার কান্না? কে করবে এর প্রতিকার? তখন গুটিগুটি নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। ছুড়ে ফেলে দেই বন্দুক। বসে থাকি ঘাসের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জল আসতে চায় চোখ ফেটে, কিন্তু আসে না। তবু আসত যদি আমি খানিকটা শান্তি পেতাম। আমার দুঃখের বোঝা অনেকটা লাঘব হতো। হবে না তা। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি।

এটা আগের ভাবনা। এই আমি যা বললাম এতক্ষণ। এখন আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাইবেল পড়ি আমি নিয়ম করে। বাইবেলেরে নির্দেশের মধ্যে খুঁজি আমার মনের সান্ত্বনার কথা। সব আছে সেখানে আমি জানি। প্রতি ছত্রে নানান উপদেশ। নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে সেই উপদেশের বিচার করি। এখন মোটামুটি আমি নিশ্চিন্ত।

এই যেমন সেদিন। মন ভীষণ খারাপ। বসেছি বাইবেল নিয়ে। দেখি চোখ আটকে গেল একটা কথার উপর,—আমি কোনোদিন তোমাকে ত্যাগ করব না, কোনোদিন না, কেউ পারবে না তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। ... অবাক কাণ্ড, একি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা! আমি ভাবতে শুরু করলাম। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আমার দেখি অদ্ভুত মিল। সারা দুনিয়া যখন দিয়েছে আমাকে নির্বাসন, প্রভু বলেছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। কোনোদিন ত্যাগ করবেন না আমাকে! তার মানে কি তাহলে এই, যদি এই নির্জনতা ত্যাগ করে আমি আবার সভ্য জগতে ফিরে যাই, অন্তত যাবার মতো কোনো উপায় বের করি—তখন কি তিনি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন?

হয়তো তাই। সেক্ষেত্রে আমার সভ্য জগতের মায়া অতএব ত্যাগ করতে হচ্ছে। চাই না আমার ঐ সভ্যতা। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই। চাই তার করুণার ডালি। আমি ভালোবাসা চাই। ঈশ্বরের প্রেম। তার জন্যে এই নির্জনতা আমার পরম প্রিয়। সভ্য জগতের কোলাহল এখন আমার কাছে রীতিমতো দুঃসহ।

ভাবি এখন, পর মুহূর্তেই একরাশ প্রশ্ন এসে আমার মনে ভিড় জমায়। সত্যিই কি সভ্য জগতে আর আমি ফিরে যেতে চাই না? সত্যিই কি তার প্রতি আর আমার কোনো মোহ নেই? নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা এসব; নিজেরই সঙ্গে কারচুপি? বেকায়দায় পড়েছি বলেই কি এই নতুন পরিবেশকে আমি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি? যদি না পড়তাম এমন অবস্থায়, তবে কি ঈশ্বরকে এমনভাবে ডাকতাম? প্রার্থনা করতাম তাঁর কাছে আমাকে এই অবস্থা থেকে সরিয়ে না নিয়ে যাবার জন্যে?

তখন আবার নতুন করে ভাবতে বসি। ঈশ্বরকে আর ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হয় না। শুধু বলতে মন চায়, প্রভু এই অবস্থায় তুমি আমাকে ফেলছ, তাই আমার ভালোমন্দ বিচারের বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিজেকে খতিয়ে দেখবার ক্ষমতা। বরং সব কৃতিত্ব তোমার। আমি তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য। চির কৃতার্থ আমি।

দ্বীপে এই ভাবেই দুটি বছর আমার কেটে যায়। শুরু হয় তৃতীয় বছর। মনের আনাচে কানাচে নতুন নতুন প্রশ্ন জাগে। কিন্তু প্রশ্ন কখনো থমকে রাখে না আমায়। অলসের মতো পারে না বসিয়ে রাখতে। কাজ করি নিয়মিত। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ। এখন তো আর আগের মতো নয়, সময় এখন ভাগ করে নিয়েছি প্রতিটি কাজের জন্যে। যেমন সকালে উঠে প্রথম কাজ আমার ঈশ্বরের আরাধনা, তারপর বাইবেল পাঠ। মোট তিনবার পড়ি দিনে বাইবেল। ঘুমের প্রাক মুহূর্তে একবার, আর একবার দুপুরে। সকালে আরেকটি প্রধান কাজ বন্দুকসহ খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়া। এতে ঘণ্টা তিনেকের মতো সময় যায়। তারপর রন্ধনাদি পর্ব। শিকারের ছাল ছাড়ানো থেকে শুরু করে তার মাংস কাটা, তাকে রান্নার উপযোগী করে তোলা। এতেও সময় যথেষ্ট ব্যয় হয়। দেখতে দেখতে বেলা

দুপুর। তখন খাই পেট ভরে। সূর্য ওঠে মাথার উপর। তখন তো আর বাইরে বেরুনো সম্ভব নয়। একটু বিশ্রাম নিই তখন বিছানায় শুয়ে। তারপর উঠি আবার। শুরু হয় বৈকালিক কাজ। তার জন্যে সময় পাই চার ঘণ্টার মতো। সেটাই যথেষ্ট। বৃষ্টি হলে বা প্রচণ্ড গরম পড়লে দৈনন্দিন কার্য তালিকায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। তখন সকালের বদলে কোনো কোনো দিন বিকেলে বেড়িয়ে পড়ি খাদ্য অন্বেষণে।

বিকেলের ওই চার চারটে ঘণ্টা কাজ করার যে কত জ্বালা! করতে চাই অনেক কিছু, সম্ভব আর হয়ে ওঠে না। একদিনের কাজে লাগে পাঁচ দিন। করব কী। আমি যে এক অর্থে অসহায়। না আছে কাজের কোনো উপযুক্ত হাতিয়ার, না তার উপযুক্ত পরিবেশ। সাহায্য পাব যে কারুর কাছ থেকে, এমন আশাও নেই। শুধু নিজের দুখানা হাত সম্বল। এই তো দেখুন না, বানাব তাকের জন্যে চওড়া একফালি কাঠের তক্তা, সময় লাগল তাতে মোট দশ দিন। শেষ যেন আর হতে চায় না। কিছুতে হয় না মনের মতোন। অথচ কী-ই বা এমন কাজ। করাতির হাতে পড়লে লাগতো বড় জোর দেড় থেকে দু ঘণ্টা।

একবার তক্তা বানাতে কী কী করতে হলো আমাকে শুনবেন? প্রথমে তো বেশ চওড়া দেখে একটা গাছ বাছলাম। চওড়া এই কারণে কেননা আমার তক্তাটা করতে হবে বেশ চওড়া মাপের। গুঁড়িটা কেটে ফেললাম। বলতে যত সংক্ষেপ কাজের বেলা মোটেই নয়। লাগল সর্বমোট তিনটে দিন। পড়ল অতঃপর সেটা মড়মড়িয়ে মাটিতে। তখন ডালপালা ছাঁটতে হলো। তাও কমপক্ষে তিন চার দিনের কাজ। এবার হালকা হলো খানিকটা। অর্থাৎ ঠেলে একধার থেকে আরেক ধারে নেওয়া যেতে পারে। নিয়ে গেলাম সরিয়ে। তারপর উপরের দিকটা চাঁছলাম। মোটামুটি মসৃণ হলো সেই ধার। তখন দিলাম ফের উল্টে। সে ধার গেল নিচে, উঠে এল উপরে আরেক ধার। এবার চাঁছলাম সেই দিক। তাতে ঝড়তি পড়তি সব বাদ দিয়ে হলো তিন ইঞ্চি চওড়া একখানা তক্তা। সব মিলিয়ে মোট বেয়াল্লিশ দিন।

তবে একটা কথা। এই যে করি নানান কাজ, এতে একই সাথে আমার ধৈর্য আর কাজের নিপুণতার প্রমাণ মেলে। ধৈর্যটা এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন। সব সাশ্রয়ের তো কোনো ব্যাপার নেই। তাতে আমার অঢেল সময়। অমনি নৈপুণ্যের দিকেও নজর পড়ে। দেখি না, কতটা নিপুণ করতে পারি কাজ! হয়ও মোটামুটি। এটা অবিশ্যি ধীরে ধীরে আয়ত্ত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি হবে যে, সে আশা আমি করি না। ঢাল নেই তরোয়াল নেই। আমি যে এক অদ্ভুত নিধিরাম সর্দার।

আসলে প্রয়োজনটা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। প্রয়োজন আমাকে সব শিক্ষা দিচ্ছে। আমার নিজের দরকার মতো আমি সব তৈরি করে নিচ্ছি বা বাধ্য হচ্ছি তৈরি করে নিতে। এর জন্যে যতটা ধৈর্য যতটা নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তা আমাকে আয়ত্ত করতেই হবে।

এবার ফলনও খুব ভালো পেয়েছি। এটা নভেম্বর মাস। ডিসেম্বরে আমি শস্য ঘরে তুলতে পারব। যব এবং প্রচুর ধানও হয়েছে। জমিতে সার দিয়ে মোটামুটি চাষ যোগ্য করে তুলেছি। তা এবার সব মিলিয়ে আধ বস্তা তো হবেই। আরো হতো যদি না সেবারের অতগুলো বীজ আমার নিজেরই ভুলে নষ্ট না হতো। কিন্তু নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে এবার। চারা বাঁচিয়ে রাখাই দেখি এক সমস্যা। শত্রুর অন্ত নেই। একাধারে ছাগল এবং খরগোশ। কচি পাতার কী যে মধুর স্বাদ তারা পেয়েছে! ঘুর ঘুর করে সারাদিন ক্ষেতের ধারে। যেই না পাতা বের হয় অমনি কুটকুট করে খেয়ে নেয়। ফলে চারা থেকে আর শস্য বের হবার সুযোগ হয় না।

মহা সমস্যা। করি কী এখন! ভাবতে ভাবতে চারধারে বেড়া তুললাম। তাতে খাটনি গেল খুব। কাজও করতে হলো খুব দ্রুতগতিতে। কেননা যত সময় যাবে, ততই আমার লোকসান। তাও লাগল মোট তিন হপ্তা। বেড়া তৈরি হলো। ছোট জমি বলে রক্ষে। বড় হলে না জানি আরো কত দেরি হতো। ইতোমধ্যে বন্দুক ছুটিয়ে কটা খরগোশ মেরে ফেললাম। কুকুরটাকে ছেড়ে রাখতাম রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে। সে কী ঘেউ ঘেউ সারারাত জুড়ে! সাধ্য কি সেই ডাক আগ্রাহ্য করে কোনো জীব ত্রিসীমানায় ঘেঁষে। ফলন বেশ ভালোই হলো। তোলার সময় হয়ে এল প্রায়।

যেন ধোঁয়ার এক মস্ত কুণ্ডলী

তখন এক নতুন উৎপাত। এবার পাখি। পাখি বলব, না বনমোরগ? সে যে কত এল উড়ে তা আর বলবার নয়। পাকা ফসলের গন্ধ যেন টানতে টানতে নিয়ে এল সকলকে চারধার ঝেঁটিয়ে। আর এমনই তাদের গায়ের রং—মিশে থাকে গাছ-গাছালির আড়ালে, আমি বুঝতেও পারি না। হয়তো দেখলাম, একটা ধান খাচ্ছে। অমনি হাই হাই করে বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওমা, দেখি এ যে অসংখ্য। চারপাশ থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শুধু উড়ে পালাতে থাকে। উপরে উঠে মিলে মিশে যেন ধোঁয়ার এক মস্ত কুণ্ডলী বা ঘোলাটে এক টুকরা মেঘ। উড়ে গেল সাময়িক ভাবে, কিন্তু আমি জানি, ফাঁক পেলেই ফের এসে বসবে। কিন্তু ঐভাবে তো আর আমার এত দিনের সব পরিশ্রম নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তাহলে যে আমার খাদ্য বলতে কিছুই আর থাকবে না। তাছাড়া যদি সব ফসল ওরাই খায়, তবে আগামী দিনে আমি চাষ করব কী দিয়ে। মোটমাট বাঁচাতে হবে। কিন্তু কীভাবে বাঁচাব? কী যে করব আমি মোটে দিশা পাই না। এখনো যেগুলো পাকে নি, তা কিছু কম নয়, সেগুলো ওরা খায় নি। জমাতে পারলে আগামী মরশুমে ভালো আয় দেবে। কিন্তু কীভাবে জমাই?

কিছু ঠিক করতে না পেরে ঘর থেকে বন্দুকটা নিয়ে এলাম। ভিতরে ভিতরে সত্যি তখন আমার খুব রাগ। এসে দেখি যে কে সেই। এক মুহূর্ত আমি চোখের আড়াল হতে ফের এসে বসেছে গাছের মাথায়। পুরো একটা দঙ্গল। আসছে আরো সমানে। চারধারে

শুধু ডানার ঝটপটানির শব্দ। আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। এক একটা দানা খাবে ওরা, আর আমার মনে হবে দানা নয়, যেন আমার বুকের একেকটা পাঁজর। তখন বন্দুক চালিয়ে দিলাম। মারা পড়ল একসাথে তিনটে। বাকিরা উড়ে পালাল। তখন সেই তিনটেকে তুলে এনে টাঙিয়ে দিলাম খুঁটির গায়ে গায়ে দড়ি বেঁধে। এটা ইংল্যান্ডে মানুষের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার একটি বিশিষ্টতম পন্থা। একজনকে শাস্তি দিয়ে বাকি দশ জনকে দেখায়। তাদের মনে ভয় সঞ্চার করে। আমারো উদ্দেশ্য তাই। তাতে ফলও হাতে নাতে পেলাম। খেতে তো আর এলই না একটাও মুরগি, উপরন্তু সারা এলাকা ছেড়ে রাতারাতি সবাই যেন পিঠটান দিয়ে বাঁচল।

এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত। আর আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। খরগোশ তাড়িয়েছি, তারপর ছাগল, সবশেষে মুরগি। ফসল পাকল নিরাপদে। সেটা ডিসেম্বর। বলতে গেলে আমার এই দ্বীপে দু নম্বর ফসল চাষ। আরো কয়েকটা দিন দেখে আমি ধান, যব কেটে ঘরে তুললাম।

হায়রে, কাটতে সে যা কষ্ট! কাস্তে তো নেই। কাস্তে ছাড়া কি আর ফসল কাটা সম্ভব। শেষে তলোয়ার এনেছিলাম একখানা জাহাজ থেকে, তাই দিয়েই কাস্তের কাজ সারলাম। আগেরবার এ অসুবিধে বোধ করি নি কেননা তখন ফসল ছিল কম। এবার যে অনেকখানি। কেটে আনলাম শুধু শস্যের গোছাগুলো। গাছ দাঁড়িয়ে রইল মাটিতে, যেমনটি তেমন। মস্ত একটা ঝুড়ি বুনেছিলাম, সেটা একেবারে বোঝাই। তারপর ধান আর যব আলাদা করলাম। মাপবার তো কোনো সরঞ্জাম নেই। আন্দাজে বুঝলাম প্রায় দশ সের মতো যব আর দশ সের মতো ধান পেয়েছি। মোটমাট আগামী মরশুমে ফসল বুনতে আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

আহ্লাদে যাকে বল আমি একেবারে আটখানা। আর ঈশ্বরকে জানালাম যে কত ধন্যবাদ!—আপনি কৃতার্থ করেছেন আমাকে। ঠিক সময় মতো আমার ভাঁড়ারে যখন টান পড়েছে, জুটিয়ে দিয়েছেন খাদ্যশস্য। আপনার দয়ার তুলনা নেই।

কিন্তু তা নয় ঠিক, এবার যে ধান ও যব ভাঙবার ব্যবস্থা করতে হয়। কী করে ভাঙাব বা কেমন করে এ সব দিয়ে খাদ্য বানানো হয় কিছুই যে জানি না। নয় ভাঙলাম যেন তেন প্রকারে, কিন্তু রুটি গড়ব কীভাবে? কিংবা হয়তো গড়লাম রুটি, তাকে ভাজব কেমন করে? আগামী মরশুমের জন্যেই বা কতটা রাখব? এই সব নানান সমস্যা। তখন ভাবলাম, থাক, এক কাজ করি, একটি দানাও খরচ করে লাভ নেই। রেখে দিই বরং আগামী মরশুমের জন্যে। বীজ হবে। তা থেকে আরো বিস্তর ফলন হোক। ততদিনে মাথা খাটিয়ে কেমন করে রুটি গড়তে হয় বা কেমন করে তাকে সেঁকতে হয়, আমি একটু বিচার বিবেচনা করে দেখি।

পাঠক হয়তো অবাক হচ্ছেন আমার অবস্থা দেখে। ভাবছেন রুটি গড়া—এ আর এমন কী সমস্যা? আমিও জানি, সমস্যা আদৌ নয়। কিন্তু আমার বিশেষ পরিস্থিতিতে সমস্যা তো বটেই। কোনো যে উপকরণ নেই। না চাকি বেলুন, না তাওয়া, না আর কিছু। সে অবস্থায় আমাকে যে নতুন কোনো উপায় বাৎলাতে হবে, এছাড়া দ্বিতীয় আর রাস্তা কোথায়!

কিন্তু ভেবে ভেবে যেকোনো কূল আর পাই না। ভাবছি তো প্রথমবার শস্য পাওয়া থেকে সমানে। কোনো যে সুরাহা হয় না। খানিকদূর এগিয়ে বাতিল করতে বাধ্য হই। এবারও কি তাই হবে?

নেই একটা খন্তা কি খুরপি যা দিয়ে মাটি খুঁড়তে পারি। নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে কাঠ দিয়ে খন্তা মতো একটা বানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তার কাজ আর লোহার খন্তার কাজ!—আকাশ পাতাল ফারাক। কাঠের যন্ত্র দিয়ে কাঠের মতোই কাজ পাই। মাটির গভীর অব্দি তা আর পৌঁছতে পারে না। আর সময়ও লাগে বিস্তর। উপকরণ ঠিক ঠিক মতো পেলে আমার কি আর এত সময় নষ্ট হতো!

তবু ঐ যে বলে ধৈর্য,—আমি যার দীক্ষা নিয়েছি, বলা চলে, একটু একটু করে ধৈর্যশীল হতে পেরেছি, তাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। কাজে তাই আমার কোনো ক্লান্তি নেই। নিপুণ করে তুলতে চাই প্রতিটি কাজ কিন্তু উপকরণ যে নেই। এই তো জমিটা যখন তৈরি করলাম। কোপানো টোপানো শেষ, এবার যে মই দিতে হবে। কিন্তু কোথায় পাব মই। বাঁশই বা এখানে কোথায়। তখন মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি এনে তাই গড়িয়ে নিয়ে গেলাম এমাথা থেকে ওমাথা অব্দি কয়েকবার। তাতে কাজ হলো ঠিকই, কিন্তু নিপুণ হলো না। না হোক, আমার তো কিছু করার নেই।

যখন ফলল ফসল, তখনো কত কি জিনিস আমার দরকার। যেমন ধরুন বেড়া দিতে হবে চারধারে, ফসল রক্ষা করতে হবে, কাস্তে লাগবে ফসল কাটার সময়, তাকে ঝাড়তে হবে, মাড়াই করতে হবে, তারপর তুলে রাখব গোলায়। কী আছে আমার যে এত কাজ নিপুণ ভাবে করতে পারব! তার পরেও তো আরো অনেক কিছু দরকার। যেমন যব পেষাই করার জন্যে যাঁতা, তাকে চালবার জন্যে চালুনি, রুটি তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় মশলা আর নুন, তাকে সেঁকবার জন্যে তাওয়া—কে দেবে এনে আমার হাতের কাছে! পাব কোথায়! এসব ছাড়াই তাই চেষ্টা করতে হলো। তাতে যা এল তাই লাভ। নিপুণ না হোক, তাতে ক্ষতি কী! মোটমাট ফসল যে পেয়েছি বিস্তর এতেই আমি খুশি। জমিয়ে রাখব বেশির ভাগ, খাব যৎসামান্য, জীবনযাপনের মূল একটা চিন্তা থেকে তো অব্যাহতি পেতে পেরেছি। এটাই লাভ। নয় সময় কিছু ব্যয়ই হলো। নয় মনমতো ফল পাওয়া গেল না। আমার তাতে ঘেঁচু। আরো সময় লাগিয়ে আগামী মরশুমের মধ্যে দরকারী কিছু কিছু বাসন-কোসন আমাকে বানাতে হবে। আরো হাবিজাবি এটা ওটা। সংসার যখন ফেঁদে বসেছি তখন তো আর কিছু বাদ গেলে চলবে না।

তবে হ্যাঁ, বাসন-কোসন তৈরির আগে যেটা দরকার, তা হলো চাষযোগ্য অঢেল জমি। এবার তো আগের মতো ঐটুকু জায়গায় চাষ করলে চলবে না। এবার বীজ বেশি, সুতরাং জায়গাও চাই বেশি। প্রায় এক একরের মতো জমি আমার দরকার। আমি হিসেব করে দেখেছি। আর দরকার একটা কোদাল। এত বড় জমিতে কোদাল ছাড়া এবার আর চাষ সম্ভব নয়। তো কোদালটাই আগে বানাই।

লেগে গেলাম কাজে। প্রায় সাত দিন টানা পরিশ্রম। তৈরি যা হলো সেটা কোদাল ঠিক নয়, তবে কোদালের মতো। বাঁটটা ভীষণ ভারী। তুলতে রীতিমতো কষ্ট হয়। তবু সান্ত্বনা, কিছু তো একটা পাওয়া গেছে। এই দিয়েই আপাতত শুরু করা যাক কাজ।

জমি বাছাই হয়ে গেছে। গুহার গা ঘেঁষেই ঢালা একটা মাঠ। সাফ সুতরো করে আগাছা ছেঁটে ফেলার পর রীতিমতো জমি বলেই যেন মনে হচ্ছে। তখন সেই ভারী কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করলাম। শেষও হলো।

তখন বেড়া দিলাম চারধারে। ঝোপের মতো ছোট একধরনের গাছ। এনে বসিয়ে দিলাম গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চারধারের লাইন বরাবর। তোফা ব্যবস্থা। মোট লাগল তিন মাস। অবিশ্যি এতটা লাগার কথা নয়। কিন্তু বর্ষা যে নেমে গেছে। গায়ে জল লাগানো যে আমার বারণ। হিসেব করে এখন তাই পা ফেলতে হয়।

তা বৃষ্টির দিনে আমি যখন গুহায় কি তাঁবুতে থাকি, ভাববেন না, চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে আমি বসে আছি। বসে থাকা যে আমার অভ্যেসের বাইরে। তাছাড়া নতুন কাজ তখন—পোল্‌কে ভাষা শেখাতে হবে। পোল আমার কাকাতুয়ার নাম। পাখিকে দিয়ে কথা বলতে সে যা অসীম ধৈর্য আমার। প্রথমে নামটা দিনরাত মন্ত্র জপবার মতো কানের কাছে পড়ে পড়ে চিনিয়ে দিলাম। তারপর তাকে উচ্চরণ শেখাবার পালা। ওমা, দেখি কদিনের মধ্যে শিখে গেছে! প্রায়ই আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—পোল, পো-ল্! আর বুকটা আমার ঢিপ ঢিপ করতে থাকে উত্তেজনায়। দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম শুনলাম আমি মানুষের মতো উচ্চারণ, আমি ছাড়া দ্বিতীয় একজনের ভাষা। হোক সে পাখি, কী আসে যায়। আমার নিঃসঙ্গতা তো মোচন হলো! সঙ্গী পেলাম আরেক জন। কাজ যখন করব একাকী বসে, ও আমাকে শোনাবে মুখের ভাষা। এই না আমার কাছে অনেক! ইত্যবসরে বাসন কোসন বানাবার কাজ শুরু করে দিয়েছি। সে কি কম ঝকমারি! মাটি দিয়ে চেপে চুপে বানাই হয়তো একটা কিছু—হয় কলসি, নয় থালা, বা গ্লাস-দেখতে দেখতে চোখের সামনে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। কিছুতে আর আকৃতিতে আসতে চায় না। সে এক বিরক্তিকর অবস্থা যাকে বলে এবং এরকম বেশ কয়েকবার হবার পরে এই জ্ঞান আমার হয়েছে যে এই মাটিতে কাজ হবে না। চাই আঁঠাল ধরনের মাটি। তাতে জল রাখলে জল গলে বেরিয়ে যেতে পারবে না। অর্থাৎ এককথায় তার ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি।

তা খুঁজে পেতে নিয়ে এলাম অবশেষে সেই রকম মাটি। পাওয়া গেল। বানালাম তা দিয়ে অনেক কিছু। রোদে দিলাম। ফেটে ফুটে তো যাচ্ছেতাই অবস্থা তাদের। আর সে যা তৈরির নিপুণতা আমার! দেখতে প্রতিটা জিনিস এমনই কিম্ভূতকিমাকার যে গোমড়ামুখো লোক অব্দি এক নজর তাকালে হেসে ফেলবে। হাসুক। আমার তো কাজ চলা নিয়ে কথা। এইতো দুটো বানিয়েছি কলসিমতো। অর্থাৎ কলসিই বানাব বলে ভেবেছিলাম, এখন দেখি হয়েছে কিমাকার একটা জিনিস। কী নাম দেব এর ভেবে পাই না। তবু যাহোক, যদি না ফাটত, আমার জল রাখার কাজ তো ঠিকই চলত।

তখন মাটি দিয়ে ফের ফাটা জায়গায় জোড়া লাগিয়ে শুকিয়ে নিলাম। এবার আর ফাটল না। শুকিয়ে একেবারে খটখটে। তখন কলসি দুটো তুলে খুব আলগোছে বসিয়ে দিলাম দুটো ঝুড়ির মধ্যে। মাপ মিলিয়ে তৈরি কিনা। সেগুলোতে শস্য ভর্তি করে রাখলাম। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে বলা যায়। শুকনো থাকবে এতে ধান আগাগোড়া। আগামী মরশুমে পোকা লাগবে না বা কোনো ক্ষতি হবে না।

হাতটাও ইতোমধ্যে একটু পেকেছে। কাজ করতে করতে যে জ্ঞান আর কি মানুষের জন্মায়। পটাপট আরো কয়েকটা বাসন বানিয়ে ফেললাম। দিলাম রোদে। এদিকে হয়েছে কি—একদিন ভেঙে গেছে বাসনের টুকরো, আমি তো সেটা তুলে ফেলে দিয়েছি আগুনে। দেখি কদিন পরে পুড়ে একেবারে টকটকে লাল। তখন বুদ্ধিটা হঠাৎ করেই মাথায় এল।—আচ্ছা আমি যদি এইভাবে আমার সবকটা বাসন পুড়িয়ে নিই! অমনি দিলাম এনে সব উনুনে। বেশ খোলামেলা উনুন তো, বেশ বড়সড়, আর নিভবার কোনো ব্যাপার নেই। আগুন কিছুতে নিভতে দিই না। জলুক না যতদিন খুশি। তা তাতেই পুড়ে চমৎকার হলো থালা-বাসন। মাংস রান্না করার একটা ডেকচি অব্দি। মুখে বলছি ডেকচি, আসলে সঠিক করে সেটাকে কী বলা যায় আমি জানি না। থালা পেলাম অনেকগুলো। আর কটা বাটি। আমার তো আহ্লাদ আর ধরে না! এক ঢিলে কত পাখি যে একসাথে মারলাম! থালা-বাসন তো হলোই মাঝখান থেকে কাজটা আমি পাকাপোক্ত ভাবে শিখে নিলাম। এবার থেকে দরকার পড়লে এভাবেই যত খুশি বানিয়ে নেব।

আর শুরু হয়েছে তারপর থেকে দারুণ দারুণ সব রান্না। ঝোল বানাই, ঝাল বানাই; মাংস নিয়ে সে তো বলতে গেলে একের পর এক চলছে আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা। তবে ঐ যে একটা কথা। খেতে পেলে মানুষ চায় একটু আরাম করতে। আমারো মন কেবল হাঁকু পাঁকু করে একটু মশলার জন্যে। আহা, দুটো একটা রকমও যদি পেতাম! তাহলে দেখিয়ে দিতাম মাংস রান্না কাকে বলে।

সব তো মোটামুটি হলো, এবার একটা ভালো যাঁতা। যব ভাঙাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? আর যাই পারি না কেন—সে ছুতার হোক, কুমোর হোক—পাথর কাটার কাজ যে কখনো শিখি নি। ভাবতে কি পেরেছি ছাই আমাকে এ অবস্থার মুখোমুখি কোনোদিন হতে হবে। তবে নয় আগে ভাগে এটাও শিখে রেখে দিতাম। কিন্তু এ যে দেখি নিরুপায় অবস্থা। পাথর আছে বিস্তর কিন্তু সবই পাহাড়ের শক্ত মজবুত পাথর। মস্ত বড় বড় খণ্ড থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল পাথরের চাই। কেমন করে ঐ থেকে আমি আমার প্রয়োজনমাফিক কেটে নেব। যন্ত্র কোথায় আমার! কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ! খুঁজতে খুঁজতে দেখেছি এই পাহাড়েই আরেক অংশে অন্য এক জাতীয় পাথর আছে তা বড্ড নরম। একটু ঘা দিলে, ঝুরঝুর করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। তাতে কি আর যাঁতা তৈরি হয়। চাপ যে মোটে সহ্য করতে পারবে না। তাহলে উপায়!

শেষ অব্দি অনেক ভেবে চিন্তে পাথরের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ফের কাঠের দিকে নজর ঘোরালাম। এটা এখন মনে হচ্ছে তুলনায় যথেষ্ট সোজা। চ্যাটাল একটা অংশ গুঁড়ি থেকে তৈরি করে নেব, তাতে গর্ত থাকবে ভিতরে বেশ খানিকটা, আর একটা কাঠের কুঁদো দিয়ে পেটাই করব। বা সামান্য জোর লাগিয়ে নাড়াচাড়া করব। তাতে সব আটায় পরিণত হবে আর ধান থেকে হবে চাল। অমনি বসে গেলাম কুড়ুল টুড়ুল নিয়ে। খাটুনি হলো খুব। আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে গুঁড়ির মাঝখানটা বেশ খানিকটা গর্তও করলাম। বানালাম কাঠের একটা হামন। ভাঙা বা ফাটার তো আর ভয় নেই। দুটোই লোহা কাঠ দিয়ে তৈরি। এবার আর কি। গুঁড়ো হবে যব, ধান ভাঙা হবে। মোটমাট রুটি কি ভাত তৈরির ব্যাপারে আরো একধাপ এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু চালুনি একটা দরকার। এর প্রয়োজনীয়তা অসীম। চালুনি দিয়ে যবের গুঁড়ো সেঁকব, তবে না বের হবে ময়দা। ভুষি যে আলাদা করতে হবে। কিন্তু কী দিয়ে করি চালুনি! চাই সূক্ষ্ম ফুটো ফুটো সিল্ক ধরনের একফালি কাপড়। তেমন কাপড় কোথায়? বিকল্প কিছু সারা দ্বীপ খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারলাম না। ফলে মাসের পর মাস ভেবে আমি আর কূল পাই না। এদিকে আমার পোশাকের সঞ্চয় বলতে গেলে শূন্যের দিকে। যা আছে কিছু ছেঁড়া খোঁড়া শত তালি দেওয়া এক একটা অদ্ভুত দর্শন জিনিস। তবে হ্যাঁ, ছাগলের ছাল আছে কিছু। আর ছাগলের গায়ের পশম। ওগুলো আমি আলাদা করে জমিয়ে রেখেছি। জানি না তো কবে কী দরকার পড়ে যায়! কিন্তু পশম দিয়ে বুনে যে একটা কিছু তৈরি করব সে কৌশল যে জানি না। বা চেষ্টা যে করব সেজন্যে প্রয়োজনীয় যে সব উপকরণ দরকার, তা-ই বা কোথায়। তখন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল—তাইত কটা টাই তো পোশাক আশাকের সঙ্গে জাহাজ থেকে এনেছিলাম। মখমলের কাপড় দিয়ে তৈরি। তার একটাকে খুলে মাঝখানে দু-একটা সুতো সরিয়ে দিলেই তো চালুনি হয়ে যায়। দেখাই যাক না।

সফলই হলাম বলা যায়। সমস্যা মিটল। ভুষি আর ময়দা হলো আলাদা। এবার আর কি।—পরের কাজ রুটি তৈরি।

কিন্তু গড়ব কীভাবে রুটি! প্রথমত যে উনুনে দিয়ে ফোলাব, ফাঁপাব যেমন পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের বাজারে—সেই মশলা আমার কোথায়! নয় ধরে নিলাম, অতটা ফোলাবার দরকার নেই, ভাজা ভাজা যা হোক একটু হলেই হলো—কিন্তু তার জন্যে দরকার তো তাওয়া। আমার কি সেই তাওয়া আছে! বলব কি সে যা মনের অবস্থা আমার—যেটাই করতে চাই, খানিকটা এগিয়ে আর এগোতে পারি না। এটা ওটা নানারকম সমস্যা এসে হাত চেপে ধরে। ভিতরে ভিতরে ভোগ করি নিরুচ্চার এক যন্ত্রণা। শেষে মাসের পর মাস ভাবনার ফলে সমাধানে পৌঁছলাম। মাটির পাত্র বানালাম মস্ত একটা। অনেকটা বাটির মতো কাঁধ উঁচু। পরিসীমা প্রায় দু ফুটের মতো। গভীর প্রায় নয় ইঞ্চি। সেটিকে আগুনে নিলাম পুড়িয়ে। ব্যস, নিশ্চিন্ত এবার। এই তো আমার তাওয়া! সেঁকবার সময় আগুন তুলে নিই চুল্লী থেকে। চারপাশে ছড়িয়ে দিই। মাঝখানে রাখি ময়দা আর জল দিয়ে তৈরি করা মণ্ড। উপরে চাপা দিই চৌকো মতো পোড়া মাটির টালি। ব্যস, একের পর এক রুটি সেঁকা হয়ে যায়।

তবে এ ব্যবস্থা প্রথম দিককার। কাজ করতে করতে যেমন মানুষের অভিজ্ঞতা জন্মায়, আমারো তাই। পরের দিকে তাওয়ার মধ্যে আর আগুন তুলি না। তাওয়াটা নিয়ে আসি চুল্লীর কাছ গোড়ায়, ফলে গরম হয় পোড়া মাটি, চারধারে গনগনে লাল কাঠকয়লা দিই টাল করে। তারপর সরিয়ে নিই সে সব। এবার এই তাওয়ায় দিই ময়দার মণ্ড। উপরে চাপা দিই। সে একেবারে আদর্শ রুটি যাকে বলে। ভাপে সেঁকা হয়ে অপূর্ব তার স্বাদ। আর কী মিষ্টি খেতে! জানি না নিজের হাতে গড়া কিনা তাই। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারি। কালে দিনে আমি একজন পাকা পাচক ঠাকুর বনতে চলেছি। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। চালের গুঁড়ো দিয়েও এখন নানান ধরনের খাবার বানাই। তার মূল উপাদান ছাগলের মাংস, জল আর চালগুঁড়ো। মুরগির মাংস দিয়েও মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই। মোটমাট খাদ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে আমি এখন পুরোদস্তুর নিশ্চিত।

তৃতীয় বছরের বেশির ভাগ সময় আমার এসব কাজেই কাটল। এ এক নেশা যেন। চাষবাস, পশুপালন, সেই সাথে একের পর এক নতুন নতুন খাবার তৈরি। ফসল তুলেছি এবার ভালো। কেননা মরশুমের শুরুতেই বুনে দিয়েছিলাম বীজ। ফসলের ভারে গাছ ভেঙে পড়ার দাখিল। তুলে এনে জমিয়ে রেখে দিয়েছি গুহার এক ধারে। এছাড়া তো উপায় নেই। জায়গা প্রথমত কম, দ্বিতীয়ত ঝাড়াই মাড়াই করব এমন উপকরণের অভাব। যেমন যেমন দরকার হয় তুলে নিয়ে আসি মুঠো ভরে। হামনে ফেলে গুঁড়ো করি।

কিন্তু না, এরপর থেকে আর এভাবে ফসল রাখা চলবে না। গোলা বানাতে হবে অবশ্যই। সামনের বছর তো আরো বেশি ফলন পাব। কোথায় রাখব তখন! তাছাড়া সঞ্চয় হিসেবেও কিছুটা থাকা দরকার। মরশুমের আগেই দেখি ফুরিয়ে আসে দানা। মোটমাট বুঝতে হবে আমাকে সারা বছর খেতে কতটা মোট ফসলের দরকার হয়।

হিসেব করে দেখা গেল চাল আর যব মিলিয়ে সারা বছরে আমার দরকার প্রায় চল্লিশ বুশেলের মতো খাদ্যশস্য। কি লাভ অহেতুক বেশি চাষ করার! বীজের জন্যে যেটুকু বেশি দরকার তাই হলেই ঢের। মিথ্যে খাটুনির প্রয়োজন কী! ঠিক করলাম এবার থেকে হিসেব করে চল্লিশ বুশেলের একটু বেশি যাতে পাই সেরকম বীজই বুনব।

চাষবাস করি, খাবার বানাই, মাথার মধ্যে ঘোরে কেবল এপার থেকে দেখা ওপাশের ঐ যে দ্বীপ তার কথা। যেতে ইচ্ছে করে বারবার সেখানে। দখল নিতে মন চায়। ইচ্ছে করে ওপারে গিয়ে হাঁটা দিই নাক বরাবর। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই। তবে হয়তো বাসস্থানের নিকটবর্তী হব। হয়তো কেউ না কেউ থাকে সেখানে। নিশ্চয়ই কোনো গোষ্ঠী কি জাতি। তাদের সাহায্য নিয়ে রওনা দেব একদিন স্বদেশের দিকে। এই বন্দিদশা আমার ঘুচবে।

পারলাম না একে কোনো মতে স্থানচ্যুত করতে

কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা হিসেব করে সঙ্গে সঙ্গে ফের নিজেকে গুটিয়ে নিই। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা দ্বীপ—কে জানে যদি পড়ে যাই কোনো নরখাদক বর্বরের হাতে! যদি দেখামাত্র আমাকে তারা হত্যা করে। জ্যান্ত কেটে কেটে শরীরের মাংস খায়! এলাকাটা যে বর্বর নরখাদকের, এ আমি অনুমানে বুঝতে পারছি। হিংস্র জন্তুও আছে প্রচুর। তবে তাদের থেকে নরখাদক মানুষকেই আমার বেশি ভয়। পাশাপাশি এমন যদি ধরে নিই, এরা নরখাদক নয়, কোনো সভ্য জাতি, সেক্ষেত্রেও আমার বাঁচবার আশা কম। অনেক ইউরোপীয়েরই এই দুর্গতি হয়েছে আমি শুনেছি। ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছে ঐ ধরনের কোনো গোষ্ঠী বা জাতির হাতে। দেখা মাত্র তারা তাকে হত্যা করেছে। কোনো কারণ নেই। এমনিই হত্যা। সভ্য দুনিয়ার মানুষকে এরা বরদাস্ত করতে পারে না। দেখলেই মনের মধ্যে ঘৃণা আর ভয় মুখিয়ে ওঠে।

তবু হাল ছাড়ি না। অর্থাৎ মন থেকে পারি না ইচ্ছেটাকে তাড়াতে। বারবার যেতে মন চায়। জল ডিঙিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে ওধারে। দেখি না, কী আছে ভাগ্যে। আমি যে এখন পূর্ণ মাত্রায় ভাগ্যে বিশ্বাসী।

জুরি সঙ্গে থাকলে এসময় খুব ভালো হতো। কত যে ভাবি তার কথা! দু'জনে মিলে বানিয়ে নিতাম একটা নৌকো। তাতে করে পাড়ি জমাতাম। কিন্তু নেই যখন নিজেকেই

ভাবতে হবে উপায়। নতুন করে নৌকো বানাবার প্রশ্ন ওঠে না। একার পক্ষে তা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে যাই না দেখি গিয়ে জাহাজের নৌকোটা আছে কিনা।

গিয়ে দেখি আছে। স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে সেখানেই পড়ে আছে। তবে সোজা অবস্থায় নয়, উল্টো ভাবে। বালি ছেয়ে ফেলেছে প্রায় অনেকটা অংশ। কিন্তু জল নেই। সেটাই সান্ত্বনা। জল থাকলে নির্ঘাৎ কাঠ পচে যেত।

কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি হয় সব সময়। তবে তো পৃথিবীতে হতাশা বলে কোনো কথাই থাকত না। নৌকো তো কমদিন ধরে ওখানে পড়ে নেই। তা প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চলল। গিয়ে দেখি গেঁথে আছে বালির মধ্যে। একেবারে পাথরের মতো ভারী। পারি না একটু নড়াতে কি সরাতে। আর এমনিতে ওজন তো খুব। দু এক জায়গায় সামান্য চোট লেগেছে। সারিয়ে নিলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। চাই কি এই নৌকোয় চেপে ব্রাজিল অব্দি স্বচ্ছন্দে পাড়ি জমাতে পারতাম। সবই দুরাশা। বিস্তর ঠেলাঠেলি ধাক্কা ধাক্কি করেও পারলাম না একচুল টলাতে। তখন গাছের ডাল কেটে নিয়ে এলাম। তাই দিয়ে চেষ্টা করব। চাড় দিয়ে দেখব পারি কি পারি না। হায়রে, সে যে কী ঝকমারি। এর থেকে গোটা দ্বীপটা ঠেলে নড়ানোও যেন সহজ। পারলাম না একে কোনোমতে স্থানচ্যুত করতে।

চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। আপনারা শুনে হয়তো বলবেন—এটা করেন নি কেন, ওটা করা উচিত ছিল। সবিনয়ে জানাই, আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তার এতটুকু কসুর আমি করি নি। প্রায় চার হপ্তা একটানা করেছি পরিশ্রম। শেষমেশ বালি অব্দি চারপাশ খুঁড়ে ফেলেছি। যদি কোনোমতে একটুখানি নিচে ঢোকার উপায় থাকে। বা নিদেনপক্ষে একখণ্ড কাঠ ঢোকাবার অবস্থা থাকে। তবে একবার শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখব।

সে চেষ্টাও বিফল। সেভাবেও পারি নি। এতটুকু নড়াতে। নিচে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আগাগোড়া পেট বোঝাই বালি। আমার সাধ্য কি সেগুলো সরিয়ে ভিতর থেকে ঠেলা মারি। শেষে হতাশ অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। থাক পড়ে যেমন আছে তেমন। আমার এতে আর দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, এতে করে পরপারের যাবার ইচ্ছেটা একদম কমে নি। সেটা বরং বলতে গেলে আগের তুলনায় আরো বেড়েছে।

তখন হঠাৎ মাথায় খেলে গেল নতুন একটা চিন্তা। আচ্ছা, ছোট একটা ডিঙ্গি যদি নিজের হাতে তৈরি করে নেই। শালতি বলে যাকে। গাছের গুঁড়ি কেটে তার মাঝখানটা খুঁড়ে দিলেই হলো। অনেকে একে বলে ডোঙা। মোটমাট আমার যা বর্তমান অবস্থা—যন্ত্রপাতি নেই, সাহায্য করার একটা লোক নেই—আমার পক্ষে অন্য কিছু বানানো ঝকমারি। তা ভাবতে যে পেরেছি তাতেও ভারি খুশি খুশি লাগল।

কিন্তু সমস্যার কি আর অন্ত আছে। ডোঙা নয় শেষ অব্দি বানালাম, কিন্তু জলে টেনে নিয়ে যাব কীভাবে। ধরা যাক মস্ত একটা গাছ বাছলাম, কাটলাম সেটাকে, পেটটা খুঁড়ে বা প্রয়োজনবোধে পুড়িয়ে বানালাম দুর্ধর্ষ সুন্দর একখানি ডোঙা। কিন্তু সেটাকে জল অব্দি টেনে নিয়ে যাব কীভাবে! সে কি একটা হাতে সম্ভব। তবে তো সব প্রচেষ্টা আমার বিফল যাবে। সে অবস্থায় করণীয় কী।

করণীয় কি হবে কি না হবে সেটা পরে বিচার্য। সব কিছু অত হিসেব কষে আগে ঠিক করা যায় না। নিজের মনকেই নিজে দিলাম প্রচণ্ড ধমক।—এখন কাজটা মানে মানে শুরু কর তো বাছাধন!

তখন খুঁজে পেতে বের করলাম মস্ত এক সেগুন গাছ। কুলেরই খানিকটা কাছাকাছি। তার গুঁড়ির পরিধি নিচের দিকে পাঁচফুট দশ ইঞ্চি আর উপর দিকে চার ফুট এগারো ইঞ্চি প্রায়। দৈর্ঘ্যে বাইশ ফুট। শুরু হলো কাটার কাজ। একদিনের তো আর কাজ নয়। লাগল

মোট বানাতে বাইশ দিন। তবে গাছ মাটিতে শয্যা নিল। তখন ডালপালা ছাঁটা। সে-ও প্রায় চৌদ্দ দিনের টানা পরিশ্রম। তারপর শুরু হলো ভিতরের কাঠ খুঁড়ে ফেলা। কী অসীম কষ্ট আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। হাত তো মোটে দুখানা। তার উপর দৈনন্দিন নিয়মমাফিক অন্যান্য কাজও করতে হয়। সব মিলিয়ে সময় লাগল পাক্কা তিনটি মাস। নৌকো বলেই মনে হচ্ছে। বরং ডোঙা বা শালতির চেয়ে দেখতে অনেক চমৎকার। ভিতরে যা জায়গা তাতে ছাব্বিশ জন লোক অনায়াসে বসতে পারে। তাতেও ফাঁকা থাকে বেশ অনেকখানি। আর এক আমি হলে তো চিন্তাই নেই। আমার যাবতীয় মালপত্র সমেত আমি স্বচ্ছন্দে ডোঙায় চেপে পাড়ি জমাতে পারব।

খুব আনন্দ তখন আমার। কাজ মোটামুটি নিখুঁতই বলা চলে। আগুনের সাহায্য নেবার দরকার হয় নি। যা করেছি সব নিজের হাতে। কুড়ুল আর করাত দিয়ে। আর যা শক্ত কাঠ! কত যে ক্লান্তি জমা হয়ে আছে এর পরতে পরতে! তবু হাল ছাড়ি নি। এটাই সান্ত্বনা যে শেষ করে তবে ইস্তফা দিয়েছি কাজে।

তবে ঐটুকুই। পারলাম না হাজার চেষ্টা করে তাকে জলে নিয়ে যেতে। অসীম কষ্ট করলাম আর নানান চেষ্টা। মাত্র জলের থেকে শ'খানেক গজ দূর। কিন্তু পারব কীভাবে, এদিকে যে পাহাড়ি এলাকা। কূল অনেকটা উঁচুতে। ডোঙা পড়ে আছে নিচের দিকে। সেখান থেকে টেনে উপরে তুলে ফের জলে নামানো একেবারেই অসম্ভব। তখন ভাবলাম, এক কাজ করি বরং—মাটি খুঁড়ে ফেলি—শুরু করলাম কাজ। কিন্তু কিছুদিন পরে ইস্তফা দিলাম। কোনো লাভ নেই। মাটি খুঁড়লেও কিছুতে পারব না আমি একার চেষ্টায় ডোঙাটাকে একচুল গড়াতে। আমার শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে।

তখন ফের একদফা জমি মাপলাম। নতুন বুদ্ধি উদয় হলো মাথায়। আচ্ছা যদি এক কাজ করি! যদি মস্ত গভীর একটা নালা কাটি জল থেকে শুরু করে ডোঙা অব্দি। তাতে স্বাভাবিক নিয়মে জল চলাচল করবে। সেক্ষেত্রে ডোঙা নিজেই জলের নাগাল পাবে। আমার খুব একটা ঠেলাঠেলির দরকার হবে না।

শুরু করব কাজ, তার আগে বসলাম একদফা হিসেব নিয়ে। পাহাড়ি এলাকা। নালা কাটা মানে আগাগোড়া পাহাড় কাটা, তার পাথর ভাঙা। তাতে সময় লাগবে আমার মোট বারো বছর। কেননা মুখের দিক থেকে ডোঙ্গার কাছ বরাবর অব্দি খুঁড়তে হবে প্রায় বিশ ফুটের মতো গভীর করে। আমার মতো একলা মানুষের পক্ষে সেটা বারো বছরেরই পরিশ্রম। দরকার কী অহেতুক পরিশ্রমে। বরং ডোঙার ব্যাপারটাকেই পুরো বাতিল করি।

ভারি দুঃখ পেয়েছিলাম সেবার। এতদিনের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে। আসলে নিরুপায় যে আমি। এ অবস্থায় একা মানুষের পক্ষে নতুন কী-ই বা করার থাকতে পারে।

এই সব কাজের মাঝে একদিন চার বছর পূর্ণ হলো। দ্বীপে আসার এই আমার চতুর্থ বার্ষিকী। সেই ৩০ সেপ্টেম্বর। দিনটি যথারীতি উদ্‌যাপিত হলো। সারাদিন থাকলাম অভুক্ত অবস্থায়। ঈশ্বরকে ডাকলাম। তবে একটা কথা, মনে কিন্তু আমার কোনো দুঃখ, কি তাপ, কি শোক বলতে কিছু নেই। ঈশ্বরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ আমি এবং কৃতার্থ। আমাকে তিনি এই চার বছরের যথেষ্ট জ্ঞানী করে তুলেছেন। আগে বুঝতাম না এখন সব কিছুই বুঝি। আগে যা যেমন ভাবে দেখতাম এখন অন্য চোখ দিয়ে দেখি। সব কিছু সম্পর্কে ধারণা এখন আগের তুলনায় অন্যরকম। পৃথিবীকে আমি মনে করি এখন দূর গ্রহের মতো কোনো একট গ্রহ। তার কাছে আমার আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো চাহিদা নেই। বাস্তবিক চাইলে লাভই বা কি। আমি তো আর কোনোদিন সভ্য জগতে ফিরে যাব না। এখানেই

থাকতে হবে চিরকাল। সভ্য জগতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বাইবেলের ভাষায় এখন শুধু বলতে ইচ্ছে করে—তোমার আর আমার মাঝে এখন দুস্তর ব্যবধান।

ব্যবধান সব দিক থেকেই। এই যে এখানে আছি আমি—পৃথিবীর নানারকম ছল চাতুরী থেকে আমি মুক্ত। আমার মোহ বলতে কিছু নেই, না আছে চোখে দেখার মোহ, না আছে জীবন নিয়ে কোনো রকম অহংকার। ঈর্ষা করার মতোও কিছু নেই। আর সত্যি—ঈর্ষা করার আমার দরকারই বা কী! কীসের অভাব আমার! আমি তো নিজেই এই গোটা ভূখণ্ডের মালিক। সে অর্থে আমি রাজা, বা আরেকটু বড় করে বললে, আমি সম্রাট। আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই কোনো প্রতিযোগী। এমনকি আমার সার্বভৌমত্ব নিয়ে অব্দি কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগার কারণ নেই। ইচ্ছে হলে আমি জাহাজে জাহাজে মাল বিদেশে পাঠাতে পারি। কী হবে আমার এত জিনিসপত্র দিয়ে! আমি তো আর অত ধানচাল, অত যব একলা খেয়ে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে পারব না। সেক্ষেত্রে বাকি সব চালান দেওয়াই উচিত। শুধু ধান চাল যব নয়, কাঠ চালান দিতে পারি আমি। কাছিম আঙুর আরো কত কি! কিন্তু দেব কীসে! আমার কি কোনো জাহাজ আছে। আছে সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ?

কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে নিজেই আমি এসবের ভোগ দখলের অধিকারী। ব্যয় করি পরিমিত। অহেতুক অপব্যয় আমার একদম পছন্দ হয় না। ধরুন যদি মারি মস্ত একটা ছাগল—কী হবে অত মাংস দিয়ে আমার? আমি তো আর একলা সব একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারব না। সেক্ষেত্রে ফেলা যাবে। কুকুরটা খেয়ে নেবে, নয়ত নষ্ট হতে পারে। তখন পোকা ধরবে। পোকা খাবে পেট পুরে। তাতে আমার কী লাভ! বা ধরুন প্রচুর ফসল ফলালাম। আমার লাগবে যতটা তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। নয় কিছুটা রেখে দিলাম বীজ করবার জন্যে। কিন্তু বাকিটা? সেটা তো নষ্টই হলো। কিংবা হয়তো কেটে আনলাম মস্ত বিশাল একটা গাছ। অত কাঠের আমার তো দরকার নেই। তখন মাটিতে পড়ে পড়ে জলে কাদায় পচবে। নষ্ট হবে। নয় রোদের তাপ খেয়ে খটখটে শুকনোই হলো। কিন্তু কী হবে অত শুকনো কাঠ দিয়ে আমার। অত আগুন কি আমার জ্বালাবার দরকার হয়!

অর্থাৎ বোধ জন্মেছে আমার মনে। এটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। শিখিয়েছে সব আমাকে এই প্রকৃতি। এই নিঃশব্দ নির্জন পরিবেশ। অনেক সত্য আমি এই একক একাকীত্বের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছি। যেমন প্রাচুর্য এবং স্বল্পের মধ্যে সম্পর্ক। প্রাচুর্যের কোনো দরকার নেই। ঠিক যতটুকুর দরকার সেটুকু হলেই দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন মিটে যায়। যা বাড়তি তাই আমরা দিয়ে দিই অপরকে। নিজেরটুকু ভুলেও কখনো হাতছাড়া করি না। ঈর্ষা মানুষের একটা ব্যাধি বিশেষ। আমার খুব ইচ্ছে হয়, পৃথিবীর জঘন্যতম ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিটি এই নির্জন বিজনে এসে কটা বছর কাটিয়ে যাক। তবে আর ঈর্ষা বলে তার মনে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এখানে সে ঈর্ষা করার লোক পাবে কোথায়! চারদিকে তো অনন্ত প্রাচুর্য। নিক না তার যতখানি দরকার লাগে ততখানি। দুহাত ভরে নিক। শেষে নিতে নিতে তারও নির্ঘাৎ আমার মতো বিতৃষ্ণা হবে। তখন মিতব্যয়ী হতে শিখবে। সঞ্চয়ও করতে শিখবে মিতভাবে। সব রকম আকাঙ্ক্ষা তার মন থেকে বিদায় নেবে। যেমন আমার এখন আর নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা। আমার সঙ্গে টাকা পয়সাও তো বিস্তর রয়েছে। আছে সোনা অনেকখানি আর রুপো। সত্যি বলতে কি, সেগুলো যে আছে আমার কাছে, তা-ও মাঝে মাঝে বিস্মরণ হয়ে যায়। এখানে কী তার মূল্য বলুন দেখি! কী কাজে লাগবে আমার ঐ সোনা রুপো বা টাকা! সব নিরর্থক। সব মূল্যহীন। আমাকে যদি কেউ এসে বলে, তোমাকে আমি তামাক দেব খানিকটা, তুমি

বিনিময়ে আমাকে সব সম্পদ দিয়ে দাও, আমি একটুও ইতস্তত না করে সম্পূর্ণ থলিটা এনে তার হাতে তুলে দেব। এক বোতল কালি দিলেও দিয়ে দেব সব। কালিটা আপাতত খুব দরকার। ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। এখন মাত্র তলানি। বিনিময়ে নিয়ে যাক না আমার সব সম্পদ। আমার তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

মোটামাট মনের দিক থেকে এখন আমি যথেষ্ট মুক্ত। খুব স্বাভাবিক বলতে যা বোঝায়। জীবনটাকে এই স্বাভাবিকত্বের ছাঁচেই ঢেলে নিয়েছি। দৈনন্দিন সংগৃহীত মাংস নিয়ে যখন দুপুরের আহারে বসি, তখন মনে করি এই যে মাংস আমি পেয়েছি, এটা যথেষ্ট স্বাভাবিক। ঈশ্বরের অপরূপ করুণার ফলেই আমি আজ এই জীবটিকে বধ করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোটাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। জানাই তাই হৃদয়ে অসীম তৃপ্তি অনুভব করি। জীবনের ভালোটুকুর দিকেই এখন আমার সবচেয়ে আগে চোখ যায়। অর্থাৎ এক অর্থে আমি আশাবাদী। আগে দেখতাম শুধু কষ্টের দিক, দুঃখের দিক। এখন দুঃখ কষ্টের কথা তেমন আর বিরাট ভাবে মনে পড়ে না। যা পাই তা তো অঢেল। সে অর্থে বলতে গেলে আমি রাজসুখে আছি। খোশ মেজাজে কাটছে আমার একটির পর একটি দিন। আমার তো কোনো কিছুর অভাব নেই। পারবে এভাবে সভ্য দুনিয়ার কোনো মানুষ ভাবতে? অসম্ভব। যা দেন ঈশ্বর তাতে কিছুতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনের মধ্যে কেবলই জমা করে অসন্তোষের কালো ধোঁয়া। তা থেকে জন্ম নেয় ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা। আমার সৌভাগ্য আমি সে সব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

আর ঘুরে ফিরে কেবলই আসে ঈশ্বরের করুণার কথা। মনকে বলতে গেলে আচ্ছন্ন করে রাখে। কী বিপদেই না পড়েছিলাম প্রথম দিকে ভাবুন দেখি! নির্জন নিরিবিলি একটা জায়গা, সেখানে এসে উঠলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। ভেবে দেখুন সহায় সম্বলহীন একটা মানুষ। জুটিয়ে দিয়েছে সব কিছুই ঈশ্বর। ভাঙা জাহাজটা ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেললেন কূলের কাছে। দূরে থাকলে জানি না সে জাহাজে আমি যেতে পারতাম কিনা। কূলের কাছে বলে স্বাচ্ছন্দ্যে তাতে গেলাম, প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস একটি একটি করে নিয়ে এলাম। আনলাম কাজ করবার মতো যন্ত্রপাতি, সঙ্গে আত্মরক্ষার অস্ত্র, তার রসদ হিসেবে বারুদ আরো কত কী!

অবাক বিস্ময়ে সে কথাই ভাবি সব সময়। তবে দেখুন, যদি না পেতাম বন্দুক কি গোলা বারুদ। কী হতো তবে আমার অবস্থা! পারতাম আমি এইভাবে বেঁচে থাকতে। খাদ্য হিসেবে জুটত আমার তখন শুধু কাছিম আর মাছ। তাও জোটাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। শুধু তো হাত দুখানা সম্বল। তা-ও পারতাম না রান্না করে খেতে। কোথায় পেতাম এখানে আগুন! কাঁচা খেতে হতো সব চিবিয়ে। বর্বর আদিম মানুষেরা যেভাবে খেয়ে বেঁচে থাকে। হয়তো ঢিল বা পাথর ছুড়ে দুটো একটা ছাগল মারতাম। কিন্তু ছাড়াতে পারতাম কি তাদের ছাল? সেক্ষেত্রে সামনে খাদ্য নিয়ে অনাহারে বসে থাকতে হতো আমায় আর তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগোনো ছাড়া উপায় থাকত না।

সবই করুণা। ঈশ্বরের অনন্ত অসীম করুণার ফল। আমি স্পষ্ট সে কথা উপলব্ধি করি। যাদের উপর এই করুণা বর্ষায় না তাদের জীবন দুঃখের এবং পৃথিবীতে এই জাতীয় দুঃখী মানুষের সংখ্যা কম নয়।

আমার সৌভাগ্য ঈশ্বরকে আমি এই বিজন নিরালায় এসে চিনতে পারলাম। এ আমার জীবনের পরম সুখ। এখানে আমি আগে কখনোতো ভাবি নি এমন করে তাঁর কথা, কখনোতো চিনি নি তাঁকে এমন করে। বাবা চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ধর্মপ্রাণ করে

তুলতে, পারেন নি। বাড়ির সব নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পরে বেছে নিয়েছিলাম আমি নাবিকের জীবন। সেখানে ধর্মের কোনো চল নেই। নাবিকেরা ধর্মকে পরোয়া করে না। তাদের কাছে সমুদ্র একমাত্র বাস্তব। এছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না বুঝতে চায় না। ধর্ম নিয়ে কারুকে বাড়াবাড়ি কিছু করতে দেখলে উপহাস করে, যা-তা গালাগালি দেয়। সেক্ষেত্রে ঐ পেশায় নিযুক্ত থাকলে কোনোদিন যে ঈশ্বরে আমার আসক্তি জন্মাত এখনো মনে হয় না। আমার সৌভাগ্য আমি সে জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে মনের দিক থেকে ঈশ্বরের একান্ত কাছাকাছি হতে পেরেছি।

কত না নির্বোধ ছিলাম আগে। ভাবি এখন, আর অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে হৃদয়। কত সৌভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছি কতবার। দস্যুদলের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। পর্তুগিজ জাহাজের কাপ্তেন আমাকে উদ্ধার করেছেন অনিশ্চিতের কবল থেকে, ব্রাজিলে গিয়ে আমার ভাগ্য পরিবর্তন—বারে বারে পেয়েছি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তবু অন্ধ আমি। নির্বোধ—একবারও মুখ ফুটে উচ্চারণ করি নি—হে ঈশ্বর, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি আমাকে কত দুঃখের হাত থেকে বারবার রক্ষা করেছ! সে সব আমার পাপের দিন। আমি পাপী! তাই বারেকের জন্যে মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারি নি ঈশ্বরের করুণার কথা। আজ পারি। আজ বুক ভরা আমার অনুতাপের জ্বালা বলি তাই—প্রভু আমার অপরাধ নিও না। আমি অন্ধ ছিলাম তখন। আমাকে দয়া কর।

সেদিন আর আজ। আমি অবাক হয়ে ভাবি সেই কথা। না বুঝে পেয়েছি তখন ঈশ্বরের করুণা, আজ বুঝতে পারি অক্ষরে অক্ষরে। আমার জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়। দুহাত ভরে ঢেলেছেন প্রভু তাঁর করুণা এই নির্জন নিরালায়। আমার জীবন ধন্য।

তা বলে পূর্ণ হয়েছে কি পাপের ভার? হয়তো না। এখনো বাকি আছে অনেক কিছু। এখনো অনেক দুর্ভোগে আমাকে ভুগতে হবে। অনেক ক্ষমা অনেক অনুগ্রহ চাইতে হবে এখনো দীর্ঘদিন। আরো কত অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে হবে আমার জানা নেই। অলৌকিকই বলব একে। কেননা কী যে ঘটতে পারে আমার ভাগ্যে তা তো এই মুহূর্তে বলতে পারা যায় না। যেমন অলৌকিক এখানে আমার অস্তিত্ব। এই বিজনে তো কত কিছু হতে পারত আমার! থাকতে পারত হয়তো কত নরখাদক। আসা মাত্র আমি তাদের কবলে পড়তাম। থাকত হয়তো অসংখ্য বাঘ কি সিংহ কি অন্য কোনো শ্বাপদ। মুহূর্তে এক গ্রাসে তাদের উদরস্থ হতে পারতাম। কিংবা হয়তো থাকত কোনো বিষাক্ত জীব। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের মাংস ভক্ষণ করে আমার জীবন দীপ নির্বাপিত হতো। কিন্তু তার কোনোটাই হয় নি। আমি এখনো সুস্থ স্বাভাবিক এবং জীবিত। এটা কি সত্যিই অলৌকিক নয়!

মোটমাট জীবনে দুঃখ যে আমার একেবারে নেই, একথা বলব না। কিন্তু দুঃখের চেয়ে দয়ার ভাগই বেশি। দয়া এবং করুণা। তাতে দুঃখ ম্লান হয়ে যায়। ব্যথা কমে। জীবন লাভ করে এক স্বর্গীয় তৃপ্তি। আমি আপাতত সেই তৃপ্তি নিয়েই বেঁচে আছি।

যদিও বহু জিনিসেই টান পড়তে শুরু করেছে।

কালি এনেছিলাম জাহাজ থেকে। সেটা এখন শেষ। জল মিশিয়ে বাড়াতে শুরু করেছিলাম আধাআধি সময় থেকে। ফের জল, চলেছিল এইভাবেই। ইদানীং এমনই দাঁড়িয়েছে তার রং তাতে সাদা কাগজে লিখলে কোনো কিছু আর বোঝা যায় না। সব সাদা। ফলে লেখা বন্ধ করতে হয়েছে। সেটা আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। লিখে প্রকাশ করতে পারতাম এযাবৎ মনের নানান অবস্থার কথা। এখন শুধু ভাবনা। আর নিজের সঙ্গে অনবরত কথা বলা। এইভাবেই নিজেকে এখন প্রকাশ করতে শুরু করেছি।

ভাবতে ভাবতে নানান কথাই মনে পড়ে। মিল পাই অনেক কিছুর। যেমন বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমার সেই হুল-এ পলায়ন। তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে। একই তারিখে জলদস্যুদের হাতে আমি পড়েছিলাম। দুয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল।

প্রথম জাহাজডুবির পর যেদিন ইয়ারমাউথে গিয়ে উঠলাম, সেটাও সেই একই তারিখ। অবাক কাণ্ড, যেদিন পালালাম জলদস্যুদের কবল থেকে হিসেব করে দেখেছি সেটাও সেই একই তারিখ।

আমার জন্মও ঐ দিন অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বার ঝড় ঝাপটার তাড়নায় সঙ্গী সাথীদের হারিয়ে যেদিন এই দ্বীপে এসে উঠলাম, সেটাও ঐ ৩০ তারিখ। অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য আছে এই ঘটনাগুলোর মধ্যে। একথা এতদিন আমার মনে উদয় হয় নি। আজই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম। বিস্কুটও সব ফুরিয়ে গেছে। বলব কি সে যেন আমার জীবনের এক চরম সংকটের মুহূর্ত। শেষ হবার অনেক আগে থেকেই আমি হিসেবে নিকেশ করে খরচ করতে শুরু করেছি। একটা মাত্র বিস্কুট সারাদিনে একবার। তা-ও কি থাকে! একবছর এইভাবে চালাতে চালাতে দেখি সঞ্চয় শেষ। এদিকে চাষবাসেও তখন তেমন সুবিধে করে উঠতে পারি নি। চলল সেইভাবে আরো একটা বছর। তারপর ফসল ঘরে তুললাম। সে যা আনন্দ আমার! এই একটা বছর তো বলতে গেলে শুধু মাংসের উপরই চালাতে হলো।

পোশাকেরও চরম দুরবস্থা। কটা চেক কাটা জামা শুধু আছে—জাহাজে একটা বাক্সের মধ্যে পেয়েছিলাম। আর সব ছিন্ন ভিন্ন। এগুলো আর ভয়ে পরি না। খালি গায়েই থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয়, কী আর দরকার আমার পোশাকের, একলা তো মানুষ! যদি নগ্ন অবস্থায় ঘোরাফেরা করি কে আর আমাকে দেখতে আসছে! সেইভাবে কদিন চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু পারি নি। রোদের যা তাপ! পিঠ যেন একটু পরে পুড়তে শুরু করে।

পিঠের চামড়া দু চার জায়গায় ঝলসেও গেছে। তখন ঠিক করেছি, খালি গায়ে আর থাকব না, যেমন তেমন হোক, একটা জামা গায়ে রাখতেই হবে। তাতে রোদের তাপ থেকে অব্যহতি তো পাবই উপরন্তু হাওয়া চলাচল করে শরীর জুড়িয়ে রাখবে। একটা টুপিরও দরকার। খালি মাথায় থাকলে দেখি একটু পরেই মাথা ধরে যায়। এটা কদিন ধরে খুব টের পাচ্ছি। কিন্তু করব কী—টুপি যে আমার নেই।

তখন শুরু হলো ভাবনা। ছিল যে ছেঁড়া খোড়া কাপড় চোপড়, বসলাম তাই নিয়ে। জ্যাকেটও একটা বানাতে হবে। তাতে জামাটা রক্ষা পাবে। তা সে যা সেলাইয়ের হাত আমার! শেষাবধি যা তৈরি হলো তাকে বাস্তব অর্থে জ্যাকেট কিছুতেই বলা যায় না। কিম্ভুতকিমাকার একটা জিনিস। হোক গে। আমার তাতে কী যায় আসে! দেখতে তো আর কেউ আসছে না। কাজ চললেই হলো।

টুপির প্রয়োজনটা মেটালাম একটু অন্যভাবে। জীবজন্তু এযাবৎ যত মেরেছি চামড়া তো ফেলি নি একটারও, শুকিয়ে রেখেছি রোদে। সে একেবারে খটখটে শুকনো যাকে বলে। ভাঁজ করতে গেলে মড়মড় করে আওয়াজ হয়। তো তাই দিয়েই বানাতে বসলাম টুপি। হলো কিন্তু ভারি চমৎকার। মস্ত বিশাল তার আকৃতি। লোমের দিকটা উপরে। তাতে বৃষ্টি ভিজলে কোনোক্রমে জল দাঁড়াবার উপায় নেই, পিছলে পড়ে যেতে সময় লাগবে না। মোটমাট খুশি আমি আমার নিজের কাজে। শেষে আত্মবিশ্বাস এমনই বাড়ল, চামড়া দিয়েই বানিয়ে ফেললাম একটা ছোট মাপের কোট আর পরনের একজোড়া সরু পা

প্যান্ট। গোড়ায় ভেবেছিলাম খুব গরম হবে। পরার কিছুক্ষণের মধ্যেই না খুলে পারব না। পরে দেখি রোদের তাপে শরীর এতে ঠাণ্ডাই থাকে। সে ভারি আরাম। রোদ বৃষ্টি দুয়ের হাত থেকেই যাকে বলে পরিপূর্ণ অব্যাহতি।

এবার বসলাম একটা ছাতি বানাতে। ছাতির খুব দরকার। টুপি পরলে মাথায় রোদ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সে হাঁটাচলা করার সময়। এক জায়গায় বসে কাজ করতে করতে তাপে মাথা গরম হয়ে যায়। তাছাড়া বৃষ্টির হাত থেকে শরীর সম্পূর্ণ বাঁচাতে ছাতি একটা অত্যন্ত দরকার। এটার কিছু কিছু কাজ আমি জানি। দেখেছি তো ব্রাজিলে। রোদের তাপ সেখানেও কিছু কম নয়। ছাতি সেখানে প্রায় সকলেরই সঙ্গেই থাকে। এখানে গরম আরো বেশি। তা দু দুটো বরবাদ করে তিন নম্বরটা মোটামুটি প্রয়োজনমাফিক তৈরি হলো। তা-ও আবার ঝঞ্ঝাট—তাকে পারা যায় না বন্ধ করতে। এমন ছাতি নিয়ে কি আর যত্রতত্র যাওয়া যায়! শেষে অনেক হিসেব নিকেশ করে অনেক কারিগরি বিদ্যে খাটিয়ে সেরকমও একটা বানাতে পারলাম। ছাউনিতে সেই জন্তুর ছাল। তার উপরটায় লোম, ফলে বৃষ্টি এলে চালের উপর থেকে জল পড়ার মতো সব জলই পড়ে যায়। তখন ভারি খুশি আমার। যেখানে যেতাম ভাঁজ করে ছাতিটা নিয়ে যেতাম বগলের নিচে। বলতে গেলে কালে দিনে আমার বাহন হয়ে দাঁড়াল।

এবং এইভাবেই এই দ্বীপে আমি বেঁচে বর্তে আছি। পাঠক বুঝতে পারছেন কত সুখী আমি, কত তৃপ্ত। এর পিছনে আগাগোড়াই তো ঈশ্বরের দয়া। শুধু কথা বলার লোক পাই না এই যা দুঃখ। তাও জয় করি ভাবনা দিয়ে। নেই তো কী, আমি নিজেই তো আছি। এই তো মন আমার। এর সঙ্গেই নয় কথা বলি।

তখন সেইভাবে নিজেই প্রশ্ন করি নিজেকে। নিজেই দিই জবাব। কথায় কথায় এসে পড়ে ঈশ্বরের কথা। অমনি মন আমার প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। একাগ্রচিত্তে তাঁকে স্মরণ করতে শুরু করি।

এর পর পাঁচটা বছর বলতে গেলে নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন দিনযাপন। অদ্ভুত অপ্রাকৃত আর কিছু ঘটে নি বা ঘটবার সুযোগও হয় নি। অর্থাৎ নৈমিত্তিক যে সব কাজ আমি করি তাই নিয়েই নিজেকে রাখি ব্যস্ত। যেমন ধরুন সকালে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়া, কি অবসর সময়ে চাষবাসের কাজ—সেখানে জমি তৈরি থেকে শুরু করে বীজ বোনা, ফসল ফলানো, ফসল কাটা, ফসল ঝাড়া বাছা—সব কিছুই আছে মোটের উপর গতানুগতিক যাকে বলে। ব্যতিক্রম হিসেবে সেই ডোঙা তৈরি আর তাকে জলে ভাসাবার অনন্ত প্রচেষ্টা। ডোঙা যে তৈরি করেছি সে কথা তো আগেই আপনাদের জানিয়েছি। জল অব্দি নিয়ে যাওয়ার তাবৎ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন মরিয়া হয়ে খাল কাটতেই শুরু করলাম। ঠিক খাল বলা যায় না, নালা আর কি। ছ ফুটের মতো প্রশস্ত, চার ফুট গভীর। দৈর্ঘ্যে ধরুন প্রায় আট মাইল। একে বোধহয় অসাধ্য সাধনই বলা উচিত। গোড়ায় ডোঙা তৈরির পর নানারকম কসরৎ করেও যখন পারলাম না তাকে জলের কাছে নিয়ে যেতে, তখন হতাশ হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু হাল ছাড়ি নি। জেদ চেপে গিয়েছিল। তাই দুটি বছর একটানা খাটুনির পর নালার জল ঢুকিয়ে যখন তাকে সত্যি সত্যি ভাসাতে ভাসাতে জলে এনে নামালাম—সে কী আনন্দ আমার, কী খুশি।

আর অবাকও। এত ছোট আমার নাও! এত ক্ষুদ্র! বুঝি নি তো এতদিন! জলের বিশালতার মধ্যে পড়ে তার ক্ষুদ্রত্ব নজরে পড়েছে। একে নিয়ে কীভাবে বের হব আমি

সমুদ্র যাত্রায়! আগে ভাগেই তো আর নদী পার হয়ে ওপাশের জমিতে উঠছি না, আগে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে চারপাশ। কী আছে না আছে সেটা বাইরে থেকে আগে জরিপ করার প্রশ্ন। তারপর তো গিয়ে ওঠা। কিন্তু প্রায় চল্লিশ মাইলের মতো পথ টহল দেওয়া এইটুকু ডিঙিতে কি সম্ভব!

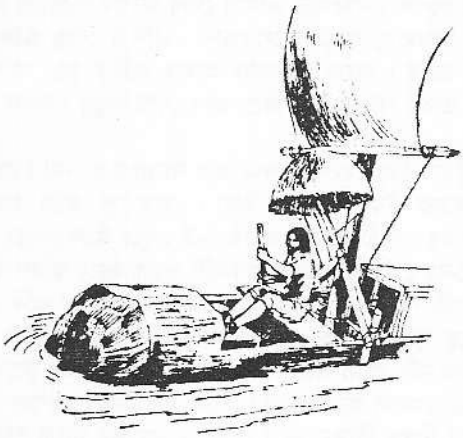

ভেসে পড়লাম একদিন ঈশ্বরের নাম করে

তখন ছোট্ট একটা মাস্তুল খাটালাম। তাতে জুড়ে দিলাম পাল। এখানে আছে তো মজুত আমার কাছে। জাহাজ থেকে আনার পর থেকে তাঁবু তৈরি ছাড়া তো অন্য কোনো কাজে লাগে নি। পাল খাটিয়ে তবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কটা ছোট খাটো বাক্সও বানালাম। দেরাজের মতো। তাতে থাকবে আমার প্রয়োজনীয় নানান সামগ্রী। খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে বন্দুক, গোলা বারুদ—সব। এগুলোকে জলের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে শুকনো রাখাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। বন্দুক রাখার জন্যে অবশ্য আলাদা একটা জায়গা করলাম। খোলের খানিকটা চেরা মতো। ঠিক বন্দুকের মাপে মাপে তৈরি। সেখানে ঢুকিয়ে সামনে কাঠের ফালি দরজাটা আটকে দিলে সাধ্য কি জল ঢোকে!

ছাতাটাকেও খুলে মাস্তুলের সঙ্গে আটকে দিলাম। ভালোই হলো। ছায়া পাব সর্বদা। রোদের তাপ যে ইদানীং একদম সহ্য করতে পারি না। মোটমাট সব রকম ভাবেই আমি এখন প্রস্তুত। এবার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। ভেসে পড়লাম একদিন ঈশ্বরের নাম করে। কিন্তু সে এমন দূরে নয়। কাছেই। আসলে আমার দরকার ডোঙা কেমন চলে সেটা একটু খতিয়ে দেখা। ফিরে এলাম কূলের কাছে। তারপর থেকে রোজই একটু একটু করে এগোই। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এই নতুন কাজটাও ঢুকে গেছে। কদিন পরে মনে হলো—তাইত, ঘুরে দেখে আসি না একদিন নিজের সাম্রাজ্যটা। কখনো তো একনাগাড়ে পুরোটা দেখা হয় নি। তখন দু ডজন মতো রুটি নিলাম সাথে—আমারই নিজের হাতে তৈরি, এক কলসি চাল ভাজা নিলাম,—এটা খাই খুব, আমার খুব ভালো লাগে। আর এক বোতল পানীয়, আধখানা ছাগলের প্রমাণ মাংস, কিছু বারুদ, দুটো বাড়তি চামড়ার

কোট—রাত্রে গায়ে দিয়ে ঘুমোবার জন্যে দরকার হবে! ব্যস। আর কী এবার রওনা হলেই হয়।

নভেম্বর মাসের সেটা ছয় তারিখ। দ্বীপে আসার ছয় বছর পর। এই ছয় বছর সময়কে আপনারা বলতে পারেন নির্বাসন বা বন্দিত্ব। আমি বলি আমার রাজ্য শাসনের ছয় বছর। সে যাই হোক, ভেসে পড়লাম। দ্বীপ তো বড় নয় তেমন, ঘুরে দেখতে বেশি দিন লাগল না। পুব প্রান্ত ধরেই চলেছি। খানিকটা এগিয়ে দেখি দ্বীপের পাহাড়টা সিধে নেমে এসেছে সমুদ্রে, কিছুটা অংশ ভাসমান, কিছুটা জলে ডোবা। এগিয়ে গেছে অনেকটা দূর। তা প্রায় ক্রোশ খানেক তো বটেই। মাঝে খানিকটা আবার বালির চড়া মতো। তারপর ফের পাহাড়। বেশ উঁচু। তারই পায়ের নিচ দিয়ে চলে গেছে সমুদ্র। তখন সেই বালির চড়ায় নোঙর ফেললাম।

নোঙর অর্থে সত্যি সত্যি যেমনটি দেখা যায় সচরাচর তা নয়। লোহার একটা চাই। তার সঙ্গে ভারী কয়েক টুকরো পাথর বাঁধা। লোহাটুকু আমি জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আর পাথর তো দ্বীপে কিছু কমতি নেই। দুয়ে মিলে নোঙর।

তারপর বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অঞ্চলটা ভালো ভাবে জরিপ করে দেখতে।

উঠলাম গিয়ে সেই পাহাড়ের মাথায়। দেখা যায় অনেক দূর অব্দি। পাহাড়ের এদিকে স্রোত প্রবল। চলেছে পুবের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে স্রোতের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলাম। কেননা ফিরে যদি আসি এই পথ ধরে তবে এই স্রোতের টানে আমাকেও পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে ডোঙা বেতাল হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যাবার আশঙ্কা। দ্বীপে ফিরে আসা তখন মুশকিল। তবে বিস্তর হিসেব করে দেখলাম সমুদ্রের দিকে যাবার সম্ভাবনা কম। প্রথম স্রোতের ধাক্কায় যদিওবা খানিকটা চলে যাই। বাতাসে ঘূর্ণির টান আছে। তাতে ডোঙা আমার ফের কূলের দিকেই ফিরে আসবে।

তবু দুদিন সেখানেই নোঙর করে অপেক্ষা করতে হলো। বাতাস উঠেছে। দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে। এ অবস্থায় ভেসে পড়ার ঝঞ্ঝাট অনেক। পারব না বাতাস কাটিয়ে পার হয়ে যেতে এবং একটু বেচাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ডোঙা উল্টে যাবারই সম্ভাবনা।

তিন দিনের দিন দেখি শান্ত ভাব। সমুদ্র প্রায় স্থির। নোঙর তুলে রওনা দিলাম। বলব কি, দাঁড় বাইতে না বাইতে দেখি এক দমকে ডোঙা চলে গেল অনেকটা দূর। জল সেখানে রীতিমতো গভীর। আমি তো থ। নির্ঘাৎ কোনো চোরা স্রোতের মুখে পড়েছি, তাকে এড়ানো আমার সাধ্যের বাইরে। হায় হায়, এখন উপায়! যত বাই দাঁড়, যত কূলের দিকে ফিরে আসার চেষ্টা করি—সব ব্যর্থ। পারি না এতটুকু এগোতে। বরং সরতে সরতে গভীর সমুদ্রের দিকেই এগিয়ে চলেছি। সে অবস্থায় আমার তো মৃত্যু অনিবার্য। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী সমুদ্র। জানি না কোথায় পাব কূলের রেখা। ডুবে মরার ভয় নেই। কেননা সমুদ্র দর্পণের মতো শান্ত। ভয় অনাহারে মরার। কি আছে আমার সঙ্গে খাদ্য! মাত্র কয়েকটা রুটি, চাল ভাজা, এক কলসি জল আর একটা কাছিম। এটা সাম্প্রতিক সংযোজন। নোঙর করে থাকাকালীন হাতের গোড়ায় পেয়ে তুলে নিয়েছি নৌকোয়। এমন একটা বড় নয়। এই সামান্য রসদ নিয়ে যদি ভেসে পড়ি তবে তাতে কদিন চলবে আমার।

তখন কী আক্ষেপ আমার! নিজের প্রতি নিজেরই কী প্রচণ্ড ক্রোধ! হায় হায় কত অবিবেচক আমি! ঈশ্বরের দেওয়া সুখের আশ্রয়—আমি অবহেলা করে খুঁজতে চলেছিলাম নতুন দেশ। দেশই তো বলব, না কি দ্বীপ! সব রইল পিছনে পড়ে। আমার ঘর, বাড়ি, আমার চাষের জমি, গুহা, গৃহপালিত পশু—এখন সামনে শুধু অনিশ্চিত আর অজানা।

দ্বীপটাকে আমি যে ভালোবেসে ফেলে ছিলাম। ছ ছটা বছর যে কাটিয়েছি ওখানে। ঐ তো এখন আমার স্বদেশ। সব ফেলে কেন যে বেরিয়ে ছিলাম রাজ্য জয়ের আশায়। ঈশ্বরের দানে অর্থাৎ আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। ভিতরে ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল অসন্তোষ। আমি পাপী। আমার তো শাস্তিই প্রাপ্য।

মোটমাট তখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর কী লাভ চেষ্টা করে! পাল তখন গোটানো। খোলা থাকলে হয়তো আরো কত দূরে চলে যেতাম তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তখন আমি হাত গুটিয়ে বসে আছি। বেলা তখন প্রায় দুপুর। মধ্য গগনে সূর্য। একটু একটু করে পশ্চিমের দিকে হেলতে শুরু করেছে। হঠাৎ বলব কী, যেন দক্ষিণ পুব দিক থেকে এক দমকা বাতাস এসে আমার মুখে চোখে ঝাপটা মারল। আমি তো থ! একি ঈশ্বরেরই অরেক করুণা! নাকি আমার মনের ভুল। তখন উঠে দাঁড়ালাম দেখি সত্যি সত্যিই হাওয়া। রীতিমতো জোরে জোরে বইতে শুরু করেছে। অমনি পাল খাটালাম। হাতে নিলাম দাঁড়। শেষ চেষ্টা এবার করতে হবে। যেমন করে পারি কূলে পৌঁছতেই হবে।

চলেছি পুব মুখো। স্রোত তেমন নেই, হাওয়াই টেনে নিয়ে চলেছে আমায়। খানিক দূর এগিয়ে দেখি পাহাড়ের একটা অংশ জলে প্রায় ডোবা। তার উপর দিয়ে তর তরিয়ে চলেছে জলরাশি। বলতে গেলে প্রচণ্ড বেগ সেই জলের। দুমুখে ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ছে দুদিকে। একটা চলেছে দক্ষিণের দিকে। আরেকটা উত্তর মুখে। আর সেখানে ভীষণ ঘূর্ণি। ঘুরতে ঘুরতে প্রবল তোড়ে জল চলেছে এগিয়ে।

আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। মই বেয়ে উঠছিল একটা মানুষ। সরে গেছে মইটা পায়ের নিচ থেকে, অনিবার্য তার পতন এবং মৃত্যু—এহেন অবস্থায় সে আকস্মিক ভাবে রক্ষা পেল। কিংবা ধরুন ডাকাতের হাতে পড়েছে একজন। খুন করবে তাকে তারা—সে যেকোনো কারণেই হোক, নিস্তার পেল আমি যেন সেই রকমই একজন। কোন অজানা অনিশ্চিতের পানে একটু আগে চলেছিলাম ভাসতে ভাসতে, এখন ফিরে এলাম। আমার আর দুশ্চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। কী যে আনন্দ সেই মুহূর্তে! পাল তুলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে ডোঙা। মৃদু মন্দ বাতাস। আর তর তরিয়ে এগিয়ে যাওয়া স্রোত। আমি কূলের দিকেই ফিরে চলেছি।

তবে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঠিক সেই দিকে নয়। সেটা পুব। চলেছি কোনাকুনি। প্রায় সেখান থেকে মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে। উত্তরমুখো। কূল এখনো অনেক দূর।

তবু চেষ্টার তো কামাই নেই। লক্ষ্য কিন্তু সেই পাহাড়ে ফিরে যাবার দিকে। দাঁড় বাইছি সমানে। একটু পরে দেখি সব নিরর্থক। সাধ্যের বাইরে আমার। কূল থেকে এখন প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে। অবাক কাণ্ড। দুদিকে বয়ে চলেছে দুই ভিন্নমুখী স্রোত। একটা দক্ষিণে একটা উত্তরে। মাঝখানে খানিকটা অঞ্চল স্রোতহীন। নিস্তরঙ্গ স্থির দর্পণের মতো। বইছে মৃদুমন্দ বায়ু। পালে লাগছে তার ঝাপট। দুহাতে টেনে চলেছি দাঁড়। ডোঙা সেই তরঙ্গহীন জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বেলা তখন প্রায় চারটে। দেখি মাইলখানেক দূর যদিও তখন কূল, সেই পাহাড়ের একটা অংশ জলের নিচে ডোবা অবস্থায় এদিকেও এগিয়ে এসেছে। তার ধারে ধারে অসংখ্য ঘূর্ণি প্রবাহ। আর স্রোত। একটু এগিয়ে জলের উপর মাথা তোলা পাহাড়। হাঁটতে হাঁটতে সেখান থেকে স্বচ্ছন্দে ডাঙায় গিয়ে ওঠা যায়। ডোঙা এনে তারই গায়ে ভেড়ালাম। তারপর নেমে পড়লাম এক লাফে।

অমনি হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা। এটা আমার প্রথম কাজ। তাঁরই দয়ায় আমি জীবন ফিরে পেলাম। আমি ঘোর পাপী।—প্রভু আর কোনোদিন আমি এমন অপরাধ করব না। তোমার পবিত্র দান অগ্রাহ্য করে হাত বাড়াব না অনিশ্চিতের পানে। দয়া কর প্রভু, দয়া কর।

তারপর ডোঙাটাকে বেঁধে ফেললাম মস্ত একখণ্ড পাথরের সাথে। শরীর আর যেন বয় না। অসীম ক্লান্তি গেছে সারাদিন। এবার চাই বিশ্রাম। আর ঘুম। ডোঙার মধ্যেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

উঠে দেখি সকাল। ঝকমক করছে রোদ। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। শুধু মনের গভীরে বাড়ি ফিরে যাবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ। বাড়ি অর্থে আমার সেই আস্তানা। কিন্তু যাব কীভাবে? আবার যে স্রোতের মুখে ভেসে পড়ব তাতে ভয়। ফের যদি যাই অজানার দিকে ভেসে! যদি স্রোত ফের আমাকে টেনে নিয়ে যায়! আমাকে যেতে হবে। সেটা একমাত্র পশ্চিম কূল ধরেই সম্ভব। কূলের ধারে ধারে বেয়ে যাব ডোঙা, তাতে জলের তোড়ে ভেসে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। যেতে হবে অবিশ্যি বেশ খানিকটা দূর। তা হোক। তবু নিরাপদ তো।

এগোলাম সেই ভাবেই। পথে পড়ল একটা ছোট্ট নদীর মুখ। সেখানে গবগবিয়ে জল ঢুকছে ভিতর দিকে। পেরিয়ে গেলাম। দেখি ভারি চমৎকার একটা খাঁজ মতো। সেখানে ঢেউ মোটে নেই। ডোঙা স্বচ্ছন্দে রাখা যেতে পারে। যেন ছোটখাটো একটা পোতাশ্রয়। সেখানে ডোঙা ঢুকিয়ে বেঁধে রাখলাম। উঠলাম ডাঙায়। নিশ্চিন্ত এখন। হাঁটতে হাঁটতে চললাম বাড়ির দিকে।

রোদ ততক্ষণে চড়েছে। ভীষণ তাপ। ছাতি আর বন্দুক তো আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। খুলে ফেললাম ছাতি। আর খানিকটা এগিয়ে সামনে পড়ল সেই টঙ। আমার নিরালা বিশ্রামের কুঞ্জ। যেমনটি ফেলে রেখে গিয়েছিলাম সেইরকমই আছে। আর এমনই কাণ্ড, দেখামাত্র এমন ক্লান্তি এসে ভিড় করল শরীরে, এমনই ঘুম ঘুম ভাব! সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গা ঢেলে দিলাম বিছানায়। তারপর ঘুম।

আচমকাই ভেঙে গেল ঘুম। বলব কী সে যা বিস্ময় আমার, যা চমক! আমার অবস্থায় পড়লে জানি না আপনারাও কতটা অবাক হতেন। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কে যেন ডাকছে আমার নাম ধরে—রবিন, রবিন ক্রুশো, তুমি কোথায়? কোথায় ছিলে এতদিন? রবিন ...

ঘুমের যেটুকু চটক ছিল শরীরে মুহূর্তে তো সবই উধাও। আমি থ। কে ডাকে এমন করে আমাকে এখানে!—রবিন, রবিন ক্রুশো, তুমি কোথায়? কোথায় ছিলে এতদিন? ... সমানে ডেকে চলেছে আর একটু একটু করে জন্ম নিচ্ছে আমার মধ্যে ভয়। এ আবার কী ধরনের বিপদরে বাপু! কে আবার এল আমার সুখের ঘরে আগুন জ্বালাতে। মোটমাট হতবিহ্বল আমি। সেই অবস্থাতেই ঘাড় তুলে চুপি চুপি উঁকি দিলাম। দেখি পোল। আমার সেই কাকাতুয়া। আমার বিছানার সামনে পায়ের কাছে বসে ঘাড় তুলে সমানে বলে যাচ্ছে একই কথা। আমারই শেখানো বুলি সব। আর গলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আড় চোখে আমাকে দেখছে।

তবু ধাতস্থ হতে অনেকখানি সময় লাগল। মানুষ নয় এ যে আমারই কাকাতুয়া এটা আমার কাছে বিরাট সান্ত্বনার ব্যাপার। কিন্তু এল কী করে এতখানি পথ? ওর তো থাকার কথা গুহারই আশে পাশে। কেমন করে খুঁজতে খুঁজতে এতদূর এল! পোল্‌ই তো না অন্য কোনো কাকাতুয়া? তখন ডাকলাম নাম ধরে। কাছে এল। গুটি গুটি উঠে বসল আমার

হাতের উপর। তখন ফের সেই ডাক—রবিন, রবিন ক্রুশো, তুমি কোথায়? কোথায় ছিলে এতদিন?

তখন বুকে জড়িয়ে ধরে খুব একচোট আদর করলাম।

ফিরে এলাম বাড়িতে। কদিন ধরে কোনো কাজেই মন বসাতে পারি না। ঘুরে ফিরে কেবল মনে পড়ে সমুদ্রযাত্রার কথা। তার বিপদ, তার আতঙ্ক। তোলপাড় করে বেড়ায় তাই সর্বদা। আর এমন কাজ ভুলেও নয়। ভাবতেও শরীর আমার হিম হয়ে আসে। হাত পা যেন সেঁধিয়ে যায় পেটের ভিতর। এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঈশ্বরের দেওয়া এই এত কিছু—সব ছেড়ে ছুড়ে আমি অবোধ ভেসে পড়েছিলাম কিনা অজানার টানে। ডোঙাটা পড়ে আছে এখনো একই অবস্থায়। থাক ডোঙাটা আনার কথা ভাবতে পারছি না। ফের যদি সেইভাবে ভেসে যাই। দরকার কী আমার আর ডোঙায়। এইতো বেশ আছি।

একটা বছর বলতে গেলে ঠায় বসা। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যেভাবে মানুষ কাটায় দিন। দৈনন্দিন খাদ্য অন্বেষণে টহলদারী, ফসল ফলাবার প্রয়োজনীয় কাজ, রান্নাবান্না—এই শুধু আমার কাজ। এর বাইরে বলতে গেলে কোনো পরিশ্রমের কাজই করি না।

বসে বসেই কাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে খুটখাট করি। এটা ওটা বানাবার চেষ্টা করি। দেখি কদিনের মধ্যেই দুটো ব্যাপারে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছি। এক হলো কাঠের জিনিস তৈরির কাজ, আরেকটা মাটির বাসন বানাবার কৌশল।

মাটি দিয়ে এখন আমি সবই প্রায় বানাতে পারি। কুমোরের চাকা বানিয়ে নিয়েছি একটা। কাঠ দিয়ে। তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করি যাবতীয় জিনিস। অনেক সোজা এখন কলসি কি হাঁড়ি কি অন্য কিছু তৈরি করা। তামাক খাওয়ার একটা হুঁকোও বানিয়েছি। পাইপ যাকে বলে। তৈরি করতে সে যা নাকাল। কিছুতে পারি না গোছ করে আনতে। শেষে তৈরি যখন হলো সে যা আনন্দ! পুড়িয়ে নিলাম আগুনে। আর চিন্তা কীসের। দিব্যি তামাক পুরে খোশ মেজাজে টানি। তা এরকম পাইপ জাহাজেও ছিল অনেকগুলো। ইচ্ছে করেই আনি নি। তখন তো জানতাম না দ্বীপে এত অজস্র তামাক গাছ আছে। মোটমাট এতদিন পরে নেশা করারও একটা উপায় হলো।

ঝুড়ি বোনার কাজেও বেশ পারদর্শিতা অর্জন করলাম। ঝুড়ি তো নিজের গরজেই বুনতে হয়। লাগে যে কাজে। এটা রাখা ওটা রাখা—দিনে দিনে জিনিস যে ক্রমশই বাড়ছে। বুনিও নানার আকৃতির। তাতে হাতল লাগাই। বয়ে নিয়ে যাবার তাতে সুবিধা হয়। ছাতি আর বন্দুক বাদে দৈনন্দিন টহলে আমার বেরোবার সময় এরকম একটা ঝুড়িও থাকে এখন আমার সঙ্গে। হয়তো ছাগল মারলাম একটা। তাকে অমনি ঝুলিয়ে ফেললাম কোনো গাছের ডালে। ছাল ছাড়ালাম। মাংস কেটে ঝুড়িতে রাখলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। তাতে অতবড় গোটা ছাগলটা বয়ে নিয়ে আসার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি। কাছিম ধরলে আরো সুবিধে। গোটা কাছিমটা আর বাড়ি অব্দি বয়ে আনতে হয় না। কেটেকুটে ডিম কটা বের করে নিই, সঙ্গে দু-এক টুকরো মাংস। বাকিটা দিই ফেলে। ঝুড়িতে করে নিয়ে আসি। মোটামুটি খাটুনি আগের চেয়ে অনেক কম।

বারুদ কিন্তু কমতে শুরু করেছে। কতদিন আর চলে। সব জিনিসেরই শেষ বলে একটা কথা আছে। আর এ এমনই এক পদার্থ। যা আমি দ্বীপে মাথা খুঁড়ে মরলেও পাব না। তখন উপায়! যদি বারুদ না থাকে তবে কী করে মারব ছাগল? কী করে খাদ্য সংগ্রহ করব? অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থা আমাকে ঠিক করে নিতে হচ্ছে। যদি এখন থেকেই শুরু করি

পশুপালন। পশু খামার বলতে যা বোঝায় আর কি। একটা দুটো নয়, চাই আমার অগণিত। অর্থাৎ ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে এইভাবে ক্রমশ বংশবৃদ্ধি হবে। আমারো চিরদিনের মতো সমস্যা মিটবে।

এখানে আসার বছর তিনেকের মাথায় এরকম একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। একটা মাদী বাচ্চা এনে পুষেছিলাম। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই বেশ বড় সড় হয়ে উঠল। তা একটা মদ্দা যে চাই। নইলে বংশবৃদ্ধি যে হবে না। কিন্তু সে আর জোটানো সম্ভব হলো না। আমারই চোখের সামনে সে বুড়ি হলো। কতবার ভেবেছি লাভ কী একে বাঁচিয়ে রেখে, মেরে ফেললেই তো সব চুকে যায়। পারি নি মারতে। হাত আমার ওঠে নি। শত হলেও মায়া যে। শেষে এই গত বছর মরল নিজে থেকেই।

অর্থাৎ ওভাবে হবে না। নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। দেখতে দেখতে দশটা বছর পার হলো। এগারো বছর চলেছে এখন। বারুদ বলতে গেলে তলানিতে এসে ঠেকেছে। নতুন পথ আবিষ্কার না করলে আমার সমূহ বিপদ। শেষে ভেবেচিন্তে ফাঁদ পাতব বলে ঠিক করলাম।

ফাঁদে ধরা পড়লে সুবিধে এই জ্যান্তই পাব শিকার। হাতে পায়ে একটু হয়তো চোট খাবে। সেটা এমন কিছু নয়। মোটমাট চাই আমার মাদী মদ্দা দুরকমই ছাগল। তখন গর্ত খোঁড়া শুরু করলাম।

সে মস্ত বড় বড় গর্ত। ওরা যেখানে ঘাস টাস খেতে আসে তারই আশেপাশে। উপরে লতাপাতা দিয়ে বুজিয়ে দিলাম। যব গাছের ডগা ওদের খুবই প্রিয় খাদ্য। দিলাম তার কিছু বিছিয়ে। তা কদিনে দেখি গাছ টাছ সব উধাও। কখন এসে কায়দা করে খেয়ে গেছে। কিন্তু গর্তে পড়ে নি। তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে! শেষে ফল পাওয়া গেল। দেখি দুটো গর্তে ধরা পড়েছে মোট চারটে ছাগল। একটা রাম পাঁঠা। সেটা পড়েছে একটা গর্তে। আরেকটায় সর্বমোট তিনটে বাচ্চা। তার মধ্যে দুটো মাদী আর একটা মদ্দা।

বাপরে বাপ, পাঁঠামশায়ের সে কী তেজ! উঠতে তো পারে না, আমাকে উঁকি মারতে দেখে সে যা তর্জন গর্জন। শিং উঁচিয়ে পারলে যেন তখনি গুঁতিয়ে পেট ফুটো করে দেয়। তা সব জারিজুরি পারি আমি এক নিমেষে বন্ধ করে দিতে। একটি মাত্র গুলিই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তা তো আমার মনোবাসনা নয়। আমি চাই জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু একে নিয়ে গিয়েই বা কী লাভ। যদি এই ভাবে আমাকে সদা সর্বদা আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কী করে একে আমি পোষ মানাব! তখন ভিতরে খানিকটা মাটি ফেলে দিলাম। সেই মাটির উপর ভর দিয়ে উঠে গর্তের বাইরে বেরিয়ে সে যা দৌড় তার! দিগ্বিদিগ জ্ঞান শূন্য অবস্থা বলতে যা বোঝায়। বেদম ভয় পেয়ে গেছে। একটু পরে দেখি জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

চোর পালালে মানুষের যেমন বুদ্ধি বাড়ে, আমারো তখন ঠিক সেই অবস্থা। সে কী হা-হুতাশ আমার! ধরা পড়ল ফাঁদে আর আমি ভালোমানুষি করে ছেড়ে দিলাম! মানত না কি পোষ! আলবাৎ মানত। সিংহকে মানায় না পোষ! সে ক্ষেত্রে চারদিন স্রেফ তাকে কুটোটুকু না খেতে দিয়ে ঐ ভাবে গর্তে ফেলে রাখ। চারদিন পরে যখন ক্ষিধেয় তেষ্টায় প্রাণ যায় যায় হাল হবে তখন দিতে হবে খাবার। তাও পেট-পোরা নয়, একটুখানি। সেই সাথে এক আঁজলা জল। এইভাবে দু চারদিন করলে, পোষ না মেনে উপায় কী!

দড়িদড়া বেঁধে তিনটে বাচ্চাকে টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে এলাম।

আমাকে উঁকি মারতে দেখে সে যা তর্জন গর্জন

প্রথম প্রথম সে তো নাজেহাল অবস্থা আমার। যা দিই খেতে কিছুই খায় না। তখন বুদ্ধি করে কয়েক মুঠো যব ছড়িয়ে দিলাম। অমনি এগিয়ে এসে খেতে শুরু করল। মিষ্টি যে খুব খেতে! পোষ মানল একটু একটু করে। আমার তো মনে সর্বদা ভয়, পাচ্ছে জংলীদের দলে গিয়ে ভেড়ে। গেল না কেউ। ছেড়ে দিলেও দেখি নিশ্চিন্তে তাঁবুর আশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে বড় সড় হলো। তারপর আর কী—একের পর এক সন্তান প্রসব! দেখতে দেখতে ছোট খাটো খামার হয়ে উঠল আমার তাঁবু।

তখন প্রমাদ গণলাম। আর তো এভাবে রাখা যায় না। এবার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। কোনোক্রমেই এদের জংলীগুলোর ধারে কাছে ভিড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আমাকে খামার বানাতে হবে। চারপাশে দেব বেড়া। তার জন্যে চাই মোটামুটি সমতল একখণ্ড জমি। সেখানে প্রচুর ঘাস থাকবে। আর ঝোপঝাড় জাতীয় বিস্তর গাছ। খাদ্য তো দিতে হবে নিয়মিত। প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর যতটা নির্ভর করা যায় ততই মঙ্গল। আর ঘর তুলে দিতে হবে একধারে। রোদ বাড়লে সেই ঘরে গিয়ে থাকবে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এ আর এমন কী। সারা দ্বীপটি তো আমারই দখলে। যেকোনো একটা জায়গায় ওদের খামার করে দিলেই হলো। কিন্তু সে যে কী ঝকমারি আমি বলে বোঝাতে পারব না। জমি বিস্তর অস্বীকার করি না। তাতে ঘাসও অঢেল, আর আছে ঝোপ আর প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্যে ছোট নালা। কিন্তু ঘর যে আমাকে বানাতে হবে। চারপাশে তুলতে হবে পাঁচিল। হাত তো মোটে দুখানা। যে হারে এদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে শুরু করেছে তাতে দুই মাইল কেন, দশ মাইল এলাকা নিলেও আমার মনে হয় ভবিষ্যতে জায়গা কম পড়বে এবং এর চারদিকে মাটি গেঁথে পাঁচিল তোলা—এ কি এক দু দিনের কাজ!

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম বেশি বড় না করে দেড়শ গজ লম্বা একশ গজ চওড়া এক ফালি জমি আপাতত ঘিরে নেই। তাতে সবাই এঁটে যাবে। পরে যেমন যেমন বাড়ছে আমিও দেয়াল গাঁথতে গাঁথতে এগিয়ে যাব।

সময় লাগল মোট তিন মাস। তবু বলব কাজ আমার নিপুণ। স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়ায় সবাই। ঘাসপাতা খায়। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দিই দু দশ মুঠো যব বা ধান। গলার দড়ি সবার খুলে দিয়েছি। সে যা অপূর্ব লাগে দেখতে! আমি যখন যবের ঝুড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকি ঝাঁক বেঁধে আমার চতুর্দিকে এসে ভিড় করে। অবোধ শিশুর মতো ব্যা ব্যা করে ডেকে আমাকে খাবার দেবার আবেদন জানায়।

তা দুবছরে তিন জন থেকে বেড়ে হলো তেতাল্লিশ জন। অর্থাৎ জীবিত এখন এরাই। মাঝে যে কত মেরে খেয়েছি তার তো সীমা সংখ্যা নেই। সব মিলে ষাট পঁয়ষট্টি তো হবেই।

আরেক কাণ্ডও শুরু করেছি ইদানীং। এটা বলতে পারা যায় আমার খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নবতম সংযোজন। দুধ দোয়াই। সব মিলিয়ে গ্যালন দুই তো হয়ই। আমার একার তুলনায় বলা যায় অঢেল। এত দুধ তো আর খাওয়া যায় না। তাই পনীর বানাই আর মাখন। সে মহা ঝকমারি প্রথম প্রথম। কিছুতে পারি না সঠিক জিনিসটি তৈরি করতে। নষ্ট হয়ে যায় সব। শেষে পারলাম। কাজ করতে করতেই যে শেখে মানুষ। আমার আর চিন্তা কীসের!

আর ঘুরে ফিরে মনে পড়ে ঈশ্বরের করুণার কথা। দুহাতে ঢেলে দিয়েছেন তিনি সব কিছু। এই বিশাল পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব তাঁর। চতুর্দিকে তাঁর নজর। চরম দুঃখকে তিনি করে তোলেন অনন্ত সুখ। নির্জনতার মধ্যে যুগিয়ে দেন বহু আনন্দ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন ক্ষুধার্ত মানুষকে। এর কি কোনো তুলনা আছে!

খেতে যখন বসি, পরিবার পরিজন সমেত সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। রাজা আমি, আমি সম্রাট। এই বিশাল সাম্রাজ্য আমার পদতলে। এখানকার যাবতীয় জীবের জন্ম মৃত্যু আমার করায়ত্ত। তা বলে কাউকে আমি অসুখী বা অতৃপ্ত করে রাখি নি। মুক্তভাবে বিচরণের অধিকার দিয়েছি। আমার রাজ্যে সর্বদা শান্তি বিরাজমান। প্রজায় প্রজায় কখনো কোনো বৈরিতার খবর আমার কানে আসে নি।

খাবার সময় সেটা বলতে গেলে চোখের গোড়াতেই প্রত্যক্ষ করি। পোল আমার সবচেয়ে প্রিয়। সে আমার টেবিলের একধারে বসে থাকে। বেশির ভাগ দিনই আমার ডান দিকে। যেন প্রভুর খাদ্যাখাদ্য তদারকের দায়িত্ব তারই। পায়ের কাছে বসে থাকে আমার কুকুর। বুড়ো হয়েছে ইদানীং, গায়ের লোম প্রায় সবই উঠে গেছে। ওর বংশ বৃদ্ধি হয় এমন কোনো জীব আমি সারা দ্বীপে খুঁজে পাই নি। আর থাকে দুটো বিড়াল। টেবিলের দু ধারে দু'জন। সবাইকে কিছু না কিছু খেতে দিই। এটা তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার বাইরে উপরি পাওনা। সকলেই যথেষ্ট সন্তোষ বোধ করে।

বিড়াল দুটোর ব্যাপারে কিছু বলে নিই এই ফাঁকে। জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম যাদের তারা এই দু'জন নয়। তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাঁবুর অনতিদূরে আমি নিজের হাতে তাদের সমাধিস্থ করেছি। এরা তাদেরই বংশধর। দ্বীপে বিড়াল আছে সেকথা আগেই বলেছি। প্রথম দিকে অবস্থা এমনই দাঁড়াল, পিলপিল করে পঙ্গপালের মতো বাড়তে লাগল বিড়ালের সংখ্যা। আমি তো ঝালাপালা প্রায়। শেষে কটাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। যায় কি আর তাতে! দেখি রাত্রে এসে এটা ওটা খাবার চুরি করে নিয়ে যায়। শেষে মারলাম কটাকে গুলি করে। তাতে ভয় পেয়ে বাকিরা পালিয়ে গেল। পরে দেখি এই দুটো এসে ফের ঠাঁই নিয়েছে। তা এদের আমি আর তাড়াবার চেষ্টা করি নি।

বলতে গেলে আছি বেশ, তবু ঐ যে বলে এক ছটফটানি আমার। ভিতরে ভিতরে অশান্তি ভাব। মন যে কিছুতেই থিতু হতে চায় না। ডোঙাটার কথা বারবার মনে পড়ে।

তাইত, অত কষ্ট করে অত খেটেখুটে বানালাম—সে কি অমনি ফেলে রাখার জন্যে! তা-ও অত দূরে! ইচ্ছে হয় যাই একবার পাহাড়ের মাথায়। দেখি কেমন চলছে স্রোত, কী তার গতি প্রকৃতি। স্রোত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে ডোঙা স্বচ্ছন্দে ধারে কাছে এনে বেঁধে রাখা যাবে। তাতে কোথাও যাই কি না যাই এই মুহূর্তে সেটা বড় কথা নয়, অন্তত চোখের গোড়ায় তো রইল জিনিসটা। পরে সময় সুযোগ বুঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেও পারব।

অনেক দিন ধরে যাব কি যাব না, যাব কি যাব না করতে করতে শেষে একদিন মরিয়ার মতো বেরিয়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য পদব্রজে। যাব অনেকটা পথ পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায়। সে যা সাজ পোশাক আমার! পোশাকের যা বাহার! মাঝে মাঝে নিজেই তো নিজেকে আমি জরিপ করি আয়নায় বা নদীর স্বচ্ছ জলে। হাসি পায়। মনে মনে ভাবি, যদি এই চেহারায় এই পোশাকে ইয়র্কশায়ারের রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটতাম তবে কী দৃশ্যই না হতো! ভিড় জমে যেত আমার পিছনে। সব মিলিয়ে বর্ণনাটা এই রকম।

মাথায় আমার পেল্লাই এক টুপি। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। তার অদ্ভুত চেহারা। পিছনে আবার ঝুল জুল করে মস্ত এক ফালি চামড়া। সেটা দিয়ে আমি পিঠ ঢেকে রাখি। রোদ তো খুব। তাছাড়া বৃষ্টিরও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। যখন তখন ঝরঝর করে খানিকটা ঝরিয়ে দিলেই হলো। আমার আবার বৃষ্টি একদম সহ্য হয় না। শরীর খারাপ হয়।

গায়েও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেট। তার প্রায় হাঁটু অব্দি ঝুল। আর পরনে ঘোড়সওয়ারের যেমন চুস্ত পাৎলুন থাকে, আমারো ঠিক তাই। সেটাও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। উপরে তার লোম। লোমশ পাৎলুন। সে এক বিস্ময় বটে। মোজাটোজার বালাই নেই। জুতোও নেই। অর্থাৎ জুতো অর্থে আপনারা যা বোঝেন সেরকম কিছু নয়। চামড়া দিয়ে তৈরি একটা আচ্ছাদনী মতো। তাতে দুটো পা-ই ঢাকা পড়ে। মোটমাট আমার টুপি বা জ্যাকেট বা পাৎলুন—সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জুতো জোড়া তৈরী।

কোমরে বেল্টও আছে। ভাববেন না সেটা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। একটু চওড়া। তাকে কটি-বন্ধনী হিসেবেই আমি ব্যবহার করি। পুরনো দিনের রাজা রাজড়া বা যোদ্ধারা যেমন করত। তবে হ্যাঁ, তাদের কটি-বন্ধনীতে ঝোলানো থাকত তলোয়ার, আমারটায় থাকে কুড়ুল আর একখানা করাত। দুটো দুদিকে। আরো একটা বেল্ট আছে। সেটা কম চওড়া। গলায় পরা থাকে। তাতে ঝোলানো থাকে আমার পাইপ আমার তামাক এবং আর এক ধারে একটা খাপে বারুদ। পিঠে থাকে ছোট্ট একটা ঝুড়ি। সেটাও এই বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। তাতে থাকে আমার বন্দুক। ছাতিটা বাঁধা থাকে আর একদিকে। তার এমনই কায়দা, হাওয়া বাতাস তেমন জোরদার না থাকলে সাধারণ ভাবে তাকে খুলে রাখা যায়। আমার আলাদা করে হাত দিয়ে ধরবার প্রয়োজন পড়ে না। নতুন করে ছাতির বর্ণনা এখানে আর দিলাম না। আগেই বলেছি একবার। গায়ের রঙের কথা একটু বলি। বিশেষ করে মুখের রঙ। সে ভারি বিচিত্র। মা কালো আর বাপ ফর্সা হলে তার ছেলেমেয়ের সচরাচর যে রঙ হয়, না কালো না সাদা—দুয়ের অদ্ভুত সমন্বয়। আর হবে না কেন, নয় ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত আমার রাজ্য। রোদ তো এখানে কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর তেমনই দাড়ির ঘটা। বাড়তে বাড়তে একবার প্রায় ফুট খানেক হয়েছিল। প্রথম দিকে খেয়াল করি নি। পরে খেয়াল হতে আমি তো থ। অমনি কাঁচি আর ক্ষুর নিয়ে বসে গেলাম। জাহাজ থেকে এনেছিলাম সাথে করে। তা তেমন তো অভ্যেস নেই। হলো আধ খ্যাচড়া কিম্ভূতকিমাকার ক্ষেরী। চিবুকের কাছে

খানিকটা রইল, আর মোছটা আমি ইচ্ছে করেই কামালাম না, কিছুটা ছেঁটে রেখে দিলাম। অনেকটা তুর্কিদের মতো। চিবুকের কাছের অংশটা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ুক, তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই। আরো খানিকটা বাড়লে নয় ওতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব আমার টুপি। আর সেই অবস্থায় যদি গিয়ে পড়ি ইংল্যান্ডের কোনো অঞ্চলে তবে ঘটনাটা কী দাঁড়াবে আমি ভেবেও কোনো কুল পাই না।

তবে এখানে বেপরোয়া। কীসের চিন্তা আমার! কে-ই বা আসবে দেখতে! আমার যেমন ইচ্ছে তেমন করব, যেমন ইচ্ছে নিজেকে সাজাব। আমি কি কারুর ধার ধারি না কি কেউ কিছু বলবে তাই নিয়ে এতটুকু লজ্জা পাই! এ তো আমারই সাম্রাজ্য। একপাল জীবজন্তু পাখি আমার প্রজা। কোনো প্রজারই এমন সাহস নেই যে রাজাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, মজা করে।

চলেছি এই পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। অনেক দূরের পথ। পাঁচ ছয় দিন তো এরই মধ্যে বলতে গেলে পার হয়ে গেল। গোড়ায় সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটেছি। লক্ষ্য সেই যেখানে ডোঙা বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা। কাছেই সেই জলে ডোবা পাহাড়। এক অংশ তার উঁচু। তা পৌঁছে দেখি, জল ডিঙিয়ে সেই পাহাড়ের টঙে গিয়ে চড়বার আর দরকার নেই। কাছে পিঠে জমি বেশ উঁচু। বলতে গেলে পাহাড়ের মাথারই প্রায় সমান সমান। উঠলাম সেখানে। সবই নজরে পড়ছে। ঐ তো আমার ডোঙা। আর ঐ সেই বিপজ্জনক এলাকা। সেই মহামারী স্রোত সেখানে কেবল ঘুরপাক খায় আর নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নৌকো পাঠিয়ে দেয় দূর সমুদ্রের পানে। এখন সবই শান্ত। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। নেই কোনো স্রোত, কি ঘূর্ণি, কি হাওয়া। যেন শান্ত একফালি দর্পণ। এখনি গিয়ে ডোঙায় উঠে বসতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

দমিয়ে রাখলাম ইচ্ছে। আরো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। এখানে দু একদিন থাকতে হবে। দেখতে হবে সবকিছু। সেই ভাবেই মন ঠিক করলাম। দেখি চমকদার সব ব্যাপার। স্রোত যা আসে সব পশ্চিম দিক থেকে। গিয়ে মেশে এক নদীর সঙ্গে। নদীটা বিশাল। হাওয়ার গতিও পশ্চিম থেকে উত্তরমুখী। সব মিলে ধাক্কা খায় সেই পাহাড়ের গায়ে। তখন ওঠে বিপরীতমুখী স্রোত। তারই দমকে নৌকো যায় দূর সাগরের দিকে ভেসে। সন্ধ্যে অব্দি বসে বসে এই সবই দেখলাম। বাতাস আর স্রোতের মরণ খেলা শুরু হয় বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সন্ধ্যে লাগতে সব আবার শান্ত। তখন বাতাসের তাড়না নেই। স্রোতহীন নির্মল নিস্তরঙ্গ জল এবং এটাই আমার পক্ষে ডোঙা নিয়ে ভেসে পড়ার উপযুক্ত সময়।

পরের দিনও একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলাম। নিপুণ মাঝি হতে গেলে স্রোততো চিনতেই হবে। মনের দিক থেকে আমি এবার আমার সিদ্ধান্তে স্থির নিশ্চিত। কিন্তু ভয় যে খুব! যখনই ভাবি যাই, এবার গিয়ে ডোঙায় উঠে বসি—অমনি ভয়ে সারা শরীর সিঁটিয়ে আসে। সেই বিপদের কথা মনে হয়। কাঁটা দেয় প্রতিটি লোম কূপে। কিছুতে আর পা উঠতে চায় না। যদি ফের হয় সেই একই অবস্থা! তখন অনেক ভেবেচিন্তে নতুন এক সিদ্ধান্ত নিলাম। থাক এটা এখানে যেমন আছে। আমি বরং আরেকটা ডোঙা বানিয়ে নেব।

কিন্তু বানাব বললেই তো আর হয় না, তার জন্যে সময় দরকার। অত সময় আমি পাই কোথায়! আমার যে এখন অগাধ কাজ। যেমন ধরুন, দু দুটো ক্ষেত আমার। একটা গুহার কাছে। গায়ে গায়ে লাগানো বলা যায়। গুহাও তো আর সে গুহা নেই। তাকে বড় করেছি। একটার পর একটা ঘর এখন গুহার ভিতর। ঢুকবার বের হবার দু দুটো দরজা। একটা ঘর তার মধ্যে সবচেয়ে শুকনো। সেখানে আমি দরকারী সব জিনিস রাখি। যেমন

বীজ এবং শস্য। অগুণতি ঝুড়িতে থরে থরে সাজানো শুধু ধান আর যবের দানা। এগুলো নষ্ট হবার বা পচে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন খাদ্য শস্য আমি ঐ ঘর থেকেই নিয়ে আসি।

তো চলেছি এই পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে

ক্ষেতের ব্যাপারে যা বলছিলাম। সে ভারি চমৎকার এখন। সব কিছুই সুশৃঙ্খল। বেড়া দিয়েছিলাম চারপাশে গাছের ডাল দিয়ে। কিছু কিছু তার মধ্যে গুল্ম জাতীয় গাছ। সেগুলো এখন বেশ বড় বড় হয়েছে। সে আবরণ ভেদ করে বাইরের কোনো জীবের ভিতরে ঢোকার সম্ভাবনা নেই। নিজের ইচ্ছেমতো জমিতে চাষ করি। যে বছর কম শস্য পাই, তার পরের বছর প্রয়োজন মতো খানিকটা জমি বাড়িয়ে নিই। তাতে আগের বছরের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।

আর একটা ক্ষেত একটু দূরে। আমার সেই টঙের কাছে। এটাকে আমি বলি বাগানবাড়ি। ক্ষেত এখানে প্রধানত ফলের। আঙুরই বেশি। প্রয়োজন মতো শস্যের চাষও হয়। তবে সে কদাচিৎ। গাছ গাছালিতে ঘেরা সে এক অপরূপ শান্তির পীঠস্থান। সব গাছই এখন বেশ বিশাল বিশাল হয়ে উঠেছে। ডালপাতায় মাচার ঘর এখন চারধারে ঢাকা। আর যা মিষ্টি ছায়া! সিঁড়ি বেয়ে উঠে বিছানায় গা ঢেলে দিতে পারলে সে এক স্বর্গীয় শান্তি। একটা আরাম কেদারাও বানিয়েছি। ছাগলের চামড়া আর লোম দিয়ে। বসলে শরীর প্রায় আধখানা ডুবে যায়। মাঝে মাঝে সেখানে বসে দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে বড় অপূর্ব লাগে।

এরই লাগোয়া আমার পশু খামার। হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হলো, কেননা অত বিচিত্র ধরনের পশু আমার নেই। না গরু না মোষ। থাকার মধ্যে শুধু একপাল ছাগল। চারধারে মাটির দেয়াল তুলতে আমাকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছে। বাইরে থেকে দু একটা ঢুকলে বরং আমার লাভ, কিন্তু বেরিয়ে গেলে যে ক্ষতি। কেমন করে সে ক্ষতি আমি পূরণ করব! তাই তো দেয়াল। তাই তো অক্লান্ত পরিশ্রম। দেয়ালের বাইরে আবার গুল্ম জাতীয় গাছের টানা বেড়া। তাতে সুরক্ষার ব্যাপারটা জোরদারই হয়েছে বলা যায়।

আরেকটা বৃষ্টির মাত্র অপেক্ষা। ঝোপগুলো বেড়ে এমন হবে যে আমি চির নিশ্চিন্ত হতে পারব।

অর্থাৎ আপনি যে বলবেন আমি কুড়ে, আমি শুয়ে বসে দিন কাটাই, মোটেও তা নয়। রীতিমতো খাটতে হয় আমাকে। যাকে বলে গাধার খাটুনি! পশুপালন থেকে শুরু করে তাদের দুধ দোওয়া, সেই দুধে ছানা, পনীর, মাখন তৈরি, তারা যাতে বেঁচে বর্তে সুস্থ শরীরে বহাল থাকে সেদিকে নজর রাখা—এ কি চাট্টিখানি কাজ!

কতদিন থাকতে হবে এখানে তার তো কোনো ঠিক নেই। সে বিশ বছর হতে পারে, চল্লিশ বছরও হতে পারে। চল্লিশ এই কারণে বলছি—কেননা মোটামুটি ধরে নিয়েছি আমার আয়ু খুব বেশি হলে আর চল্লিশ বছর। সেই সময় সীমার জন্যে প্রয়োজনীয় রসদের সরবরাহ আমাকে তো অব্যাহত রাখতেই হবে। এছাড়া আর উপায় কী।

আঙুরের চাষটাও উল্লেখের দাবি রাখে। বলতে দ্বিধা নেই আমি অন্য সব চাষের চেয়ে এদিকে একটু বেশিই নজর দিয়ে থাকি। কিসমিস আমার অতি প্রিয় খাদ্য। মুখরোচক তো বটেই, শরীরে বল সঞ্চয়ের প্রয়োজনেও এর অবদান কম নয়। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার মধ্যে কিসমিস আমার বিলাসের পর্যায়ে পড়ে।

এই সব কাজের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে নতুন আরেকটি কাজ। প্রায়ই একবার করে ডোঙাটা গিয়ে দেখে আসা। আছে যে সেই অবস্থায় এটাই আমার কাছে সান্ত্বনা, এমন নয় যে সব মালপত্র আমি ডোঙা থেকে নিয়ে এসেছি বা নিয়ে আসার কোনোরকম ইচ্ছে আমার আছে। ডোঙা নিয়ে ফের ভেসে পড়ার সঙ্কল্প বর্তমানে ত্যাগই করেছি। অবশ্য ভয়টাও একটু একটু করে মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে। দ্বীপের কোনো ব্যাপারেই ইদানীং আমি আর ভয় পাই না। এমনকি ভূমিকম্প হলে ফের যে পাথর পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নামতে পারে তা নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা ভীত আমি নই। এখন জীবনের ধারা আমার সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এটা আমি নিজেও স্পষ্ট টের পাই।

জানি না হয়তো এই গতিতেই চলত আমার জীবন। এই যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলা, হয়তো এই নিয়েই আমি বেঁচে থাকতাম। কোনো ব্যতয় হতো না কোনোখানে। এতটুকু বিভ্রান্তি বা অস্বস্তি বোধ করতাম না। যদি না ভারি অদ্ভুত ভারি অবাক একটা ঘটনা ঘটত।

ঘটনাটা তবে গোড়া থেকেই বলি।

একদিন দুপুরবেলা। আমি চলেছি ডোঙা দেখতে। যেমন মাঝে মাঝে যাই। হঠাৎ দেখি কূলের কাছে বালিয়াড়ির উপর মানুষের পায়ের ছাপ। একটা নয়, অনেকগুলো। আমি তো থ। হঠাৎ সামনে বাজ পড়লে মানুষ যেরকম চমকে যায়, অবাক হয়, আমি ঠিক তাই। মানুষ! তার পায়ের ছাপ! আমি ভুল দেখছি না তো চোখে! চকিতে চারদিকে চোখ বোলালাম। কই কেউতো নেই আশে পাশে! এগিয়ে গেলাম। মানুষের অবস্থিতির অন্য কোনো নজিরও নেই। আবার দেখলাম ছাপগুলো। না, অন্য কারো নয়, মানুষেরই। গোড়ালি, পায়ের চেটো, আঙুল সব নিপুণভাবে কেটে বসেছে বালির উপর। কিন্তু এখানে এ ছাপ কেমন করে এল! বুকে তখন রীতিমতো ঝড় বইতে শুরু করেছে। ঢিপ-ঢিপুনির শব্দ বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি। ত্রস্ত, শঙ্কিত, ভয়ার্ত আমার চোখমুখ। কত কিই না ভাবলাম! যেন ছবির মতো এক একটা চিন্তা। মনে উদয় দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যায় আবার শূন্যে বিলীন হয়ে। তবু ভয় মোটে কমে না। সে যা অবস্থা! এক পা দু পা করে আমি আতঙ্কে অমনি পিছু হটতে শুরু করেছি। তারপর তো ছুট। সব অগ্রাহ্য করে জঙ্গল গাছপালা ভেদ করে শুধু দৌড় আর দৌড়। আর মাঝে মধ্যেই থমকে পড়ি। পিছন দিকে দেখি। কেউ তাড়া করছে না তো! যেতে যেতে প্রতিটি ঝোপঝাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজি।

আমার জন্যে কেউ ওত পেতে নেই তো! ভয় আর আতঙ্ক। আর ত্রাস। আমি বলতে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য।

বাড়িতে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কীভাবে ঢুকেছিলাম ভিতরে সে আর এখন মনে নেই। মই বেয়ে উঠেছিলাম না কি এক লাফে দেয়াল ডিঙিয়ে পড়েছিলাম এধারে—কিছুই এখন আর স্মরণ করতে পারি না। শুধু এটুকু মনে আছে ভীষণ ভয় আমার আষ্টেপৃষ্ঠে। তাড়া খাওয়া হরিণের মতো অবস্থা। কিংবা ভীতু খরগোশের মতো। যেকোনো ভাবে চাইছি নিজেকে আড়াল করতে। সেই ভয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে।

তবুও কি ভয় কাটে! ভয়ের ধর্মই যে এই। ঢুকল একবার মনে তো সহসা যাবে না। সারারাত আমি নির্ঘুম। চোখের পাতা মোটে পারি না এক করতে। কেবলই ঘুরে ফিরে পায়ের ছাপ কটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আর নানারকম কল্পনা করতে শুরু করি। আচ্ছা, কে ঐ পায়ের অধিকারী? কী করে সে এখানে এল? কেনইবা এল? সে কি নরখাদক? জানতে পেরেছে কোনোভাবে আমি এখানে আছি? এখনো কি লুকিয়ে আছে এই দ্বীপে? কোথায়? আমি দেখা পেলাম না কেন? তবে কি মানুষ নয় সে, আত্মা? কোনো পিশাচ বা ঐ জাতীয় কিছু? পিশাচেরা শুনি যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো রকম আকার ধারণ করতে পারে। তবে কি আমাকে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যেই রেখে গেল পায়ের ছাপ? জানে আমি ঐখান দিয়ে ডোঙা দেখতে যাই। তাই কি বিশেষ করে ওখানকার বালিতেই ছাপ রেখে যাওয়া! কিন্তু জল বাড়লে ঐ ছাপ তো মুছে যেতেও পারত। কিংবা হাওয়া উঠলে বালি যেত উড়ে। ছাপ তছনছ হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে এটা শয়তানের অভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা বলে ভাবতে অসুবিধে হয়। তবে কার ছাপ! সত্যি সত্যি কি কোনো মানুষের?

এরকম রাশি রাশি অগুণতি চিন্তা। অনর্গল ভাবতে তো আর কোনো বাধা হয় না। শুরু করলে স্রোতের মতো একের পর এক ভাবনা আসতে শুরু করে। শেষ হয় অজ্ঞাত অপরিচিত কোনো মানুষে। সেই বর্বর মানুষ। নরখাদক। থাকে ঐ ওধারের দ্বীপে। আমি যেখানে যাব বলে ডোঙায় চেপে রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু অতখানি পথ পার হয়ে এখানে এসে ওঠা তো চাট্টিখানি কথা নয়। পারল কীভাবে! নিশ্চয়ই বাতাসের গতি-প্রকৃতি আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে। সমুদ্রও চেনে আমার চেয়ে ভালো। তাই পেরেছে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে। আমি পারি নি।

তবে পারি নি যে সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। এখন বুঝতে পারি। সে-ও ঈশ্বরেরই দয়া। গেলে ওদের হাতে পড়ে আর কি রক্ষা থাকত! সে সম্ভাবনা এখনো কম। কেননা ওরা যদি আমার হদিশ পেয়ে থাকে, তবে ফের আসবে। ডোঙাটা হয়তো দেখতে পেয়েছে। সেক্ষেত্রে এর পর আর একলা একজন আসবে না, আসবে দলবল সমেত। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর বলি। আমার জীবন শেষ। আমার ক্ষেত দেবে ধ্বংস করে। আমার ছাগল নিয়ে যাবে। যদি সে অবস্থায় কোনোভাবে আমি আত্মরক্ষা করতেও পারি, তবে তাও মরারই দাখিল। থাকবে না ফসল, থাকবে না ছাগলের পাল—আমি কি খেয়ে কীভাবে বেঁচে থাকব!

অবাক কাণ্ড, ভয়ের তাড়ায় মন থেকে মুছে গেল আমার ধর্মচিন্তা। ঈশ্বরে আর কোনো আস্থাই যেন নেই। এই যে, এত কিছু দিয়েছেন তিনি আমায়—জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্যে নানানভাবে সাহায্য করেছেন—কেবলই মনে হয়, আর বোধহয় এসব রক্ষা করতে পারব না। আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়ই, হয়তো ঈশ্বরের পক্ষেও না। আর ধিক্কার জন্মায় মনে অনবরত। নিজের উপর। জীবনটাকে এতদিন সহজ সরলভাবেই নিয়েছি।

তার মধ্যে যে জটিলতা আসতে পারে, আসতে পারে নানান দুঃখ, কখনো বারেকের জন্যে ভুল করেও ভাবি নি। তবে কি আর যেটুকু দরকার শুধু সেটুকু শস্য চাষ করতাম! জমিয়ে রাখতাম গোলা ভরা ধান, বসে তাই খেতাম। আমাকে আর এই ভয়ের মধ্যে তাহলে অন্নচিন্তায় বাইরে বের হতে হতো না কিংবা না খেয়ে মরতেও হতো না।

অদ্ভুত ব্যাপার—মানুষের জীবনের এই আশ্চর্য গতিপ্রকৃতি। দেখি আর বারে বারে নতুন করে অবাক হই। আজ যা মানুষ ভালোবাসে কাল তাকেই দেয় দু'পায়ে ঠেলে। আজ যা চায় কাল তাকেও করে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান। নিজেকে দিয়েই তো সব মিলিয়ে নিতে পারছি। সভ্য জগৎকে এখন আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই। অর্থাৎ এই আমি—যখন প্রথম এলাম এই দ্বীপে, চারপাশে অগাধ জলরাশি আর ঘন অরণ্য—আমি ভীষণ একা—কী বিশ্রীই না লাগত! নির্জনতা কী প্রচণ্ডভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরত আমায় আর এতদিন পর—মানুষের পায়ের ছাপ দেখে আমি চমকে উঠি। ভয়ে আতঙ্কে হাত পা সেঁধিয়ে যায় বুকের ভিতর। জ্যান্ত মানুষ তো দূরের কথা, জানি না হয়তো তার ছায়া দেখলেও আমি সন্ত্রাসে স্থবির হয়ে যাব।

সে যে কত চিন্তা মনের গভীরে, কত জল্পনা-কল্পনা! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা ততদিন সামলে উঠতে পেরেছি। তবু ঈশ্বরে বিশ্বাস আর কোনোভাবেই আসে না। আসবে কী করে, আমি যে শেষের প্রহর গুণতে শুরু করেছি ততক্ষণে। আর কি নিস্তার আছে আমার! এইতো শেষ। এও এক ধরনের শাস্তি। ঈশ্বরের দেওয়া দানে পারি নি সন্তুষ্ট হতে। অপরাধ করেছি আগ বাড়িয়ে দেখতে গিয়েছিলাম নতুন সাম্রাজ্য। এ তারই প্রতিফল। যিনি দেন, তারই তো আছে শাস্তি দানের অধিকার। এ শাস্তি আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

পরক্ষণেই নতুন এক চিন্তা উদয় হলো মনে। তাইত, শাস্তি পাব নয় ধরেই নিলাম, নয় মৃত্যুই হবে তার শেষ পরিণতি। কিন্তু তাই বলে এখন থেকে জীবনের সব আশা ভরসা ত্যাগ করব, এতো হয় না। তাহলে তো জীবন যাবে স্থবির হয়ে। আশাহীনভাবে কি বেঁচে থাকা যায়। আমার কাজ হবে দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করা। ঈশ্বরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। তারই মধ্য দিয়ে আগামীতে যে পরিণতি আসে তিলে তিলে সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এই চিন্তাই তোলপাড় করে তুলল মন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার এই একই চিন্তা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একদিন সকাল বেলা—বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে ভেসে উঠল বাইবেলের সেই অনবদ্য নির্দেশ—বিপদের দিনে আমায় স্মরণ করো, আমি তোমার ত্রাতা, তুমি গৌরবান্বিত করবে আমাকে।

বলব কী, যেন এক ঝলক মিঠে বাতাস, অপরূপ তার আমেজ, অনবদ্য তার স্নিগ্ধতা। হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে দিল আমার। আমি বিছানা ছেড়ে এক লাফে উঠে বসলাম। আহ, শান্তি! শরীরে যেন অদ্ভুত এক ক্ষমতা পাচ্ছি। অমনি তড়িঘড়ি প্রার্থনায় বসলাম।—হে বিধাতা, আমায় ক্ষমা কর। আমি পাপী। আমি অপরাধী। বাইবেল খুললাম। চোখে পড়ল সেই আশ্চর্য নির্দেশ : ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন কর। হৃদয় প্রফুল্ল কর। তোমার মনে তিনিই যোগাবেন শক্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। ... সে যে কী শান্তি কী সান্ত্বনা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সব প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গেছি। আমার মনে আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। বই নামিয়ে রাখলাম। হৃদয় যেন আনন্দে ভরে উঠেছে।

পাঠক, বুঝতে পারছেন, নতুন উদ্যমে নতুন উৎসাহে আমি আবার শুরু করেছি আমার জীবনযাত্রা। সব আবার আগের মতো। পায়ের ছাপের একটা যুক্তিও নিজের মনে খাড়া করেছি। হয়তো আমারই পায়ের ছাপ। সেই যেদিন ডোঙায় চেপে গিয়েছিলাম সেদিনই

হয়তো পড়েছে বালির উপর। বাকিগুলো গেছে জলের ঝাপটে মুছে। কোনোভাবে কয়েকটা হয়তো রক্ষা পেয়েছে। ভেবে অব্দি সে কী আনন্দ আমার! কোনো পাল্টা যুক্তিই আর মনে স্থান পায় না। নিজেকে নিজেই করি উপহাস। নিজেকে বোকা ঠাওরাই। বোকা ছাড়া আর কী! নইলে এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত জল ঘোলা করি।

মোটমাট সাহস আমার একটু একটু করে ফিরে আসছে। একটু একটু করে আমি আবার বাড়ির সীমানা ছেড়ে বের হতে শুরু করেছি। তিন দিন তিন রাততো বলতে গেলে বিছানা ছেড়ে না ওঠা। এদিকে ঘরে খাবারের টান। থাকার মধ্যে আছে শুধু একটু জল আর কটা যবের মণ্ড বিশেষ। দুধ নেই। তিনদিন ধরে দোয়াই না এক ফোঁটা, থাকবে কীভাবে! আর সে বেচারিদেরও তো কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। নির্ঘাৎ প্রচণ্ড বেদনা হচ্ছে বাঁটে। বলা যায় না, হয়তো কারো কারো দুধ এর মধ্যে শুকিয়েও গেছে।

তখন বের হলাম চৌহদ্দি ছেড়ে। দেয়াল ডিঙিয়ে ফের নামলাম এধারে। নতুন লাগছে সব কিছু। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে আমার বাগান বাড়িতে। তারই পাশে কিনা ছাগলের খোঁয়াড়। দুধ দোয়ালাম। ভয় কিন্তু একেবারে কাটে নি। হাঁটি কয়েক পা, বারবার পিছন ফিরে তাকাই। আসছে না তো কেউ পিছন পিছন! কোথাও নেই তো লুকিয়ে চুকিয়ে! পাতা পড়ার শব্দ হলে অব্দি চমকে উঠি। দু একবার তো দুধের বালতি ফেলে পালাব কি পালাব না সে চিন্তাও এল। মোটমাট আতঙ্কের ভাবটা এখনো পুরোপুরি যায় নি।

তবে দু চার দিন চলাফেরা করতে করতে সাহস আরো খানিকটা বাড়ল। কোনো কিছুই যে চোখে পড়ে না। আমার তাবৎ জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন সাহস করে একদিন সেই ছাপটা যেখানে দেখেছিলাম সেখানে গেলাম। নিজের পা ফেলে মাপলাম সেই ছাপ। মিলল না। আমার চেয়ে বেশ বড় সেই পা। দ্বিতীয়ত অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও আমি যে ডোঙা নিয়ে ঐখানে গিয়েছিলাম, এটা কিছুতেই যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মেলাতে পারলাম না। তাহলে! বুকটা অমনি থর থর করে কেঁপে উঠল। মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে গেল একটা শীতল স্রোত। সে যে কী ভয় কী আতঙ্ক! দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটালাম আমি মরিয়ার মতো। ছুটি আর বারবার পিছন ফিরে তাকাই। আসছে না তো কেউ পিছন পিছন। আমাকে ধরবে না তো!

জীবনের এও এক বিচিত্র রূপ। ভয় যখন আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে চারদিক থেকে কী অদ্ভুত যে হয়ে যায় মানুষ! নিজের কাছে নিজেই তখন সে হাস্যাস্পদ। কোনো যুক্তিবুদ্ধির তখন আর স্থান নেই। আর আত্মরক্ষার সে কী অদম্য চেষ্টা! সব ছাপিয়ে জন্ম নেয় এক নিদারুণ হতাশা। তাই তো, কী লাভ আমার এই ঘরদোর আগলে রেখে! কী প্রয়োজন! সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলেই বা অসুবিধে কী। দেব সব ছাগল ছেড়ে। দেয়াল ভেঙে ফেলব। শস্যক্ষেত নিজের হাতে দেব লণ্ডভণ্ড করে। যাতে এ দ্বীপে আমার অবস্থিতি ওরা কোনোভাবে না টের পায়। বাগান বাড়ির ঐ মাচান—ওটাও ফেলব ভেঙে। মোটমাট এখানে মনুষ্য বসতির যে সব লক্ষণ আমি তিল তিল করে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি তার আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখব না।

এসব অবশ্য প্রথম রাতের ভাবনা। রাত বলব না, বলতে গেলে সারাদিন সারারাত। ঘুম কি আর আসে! পারি কি দুদণ্ড থিতু হয়ে বসতে! ভয়ের এটাই তো বৈশিষ্ট্য। ঘটনার চেয়ে হাজারগুণ বড় হয়ে মনের আনাচে কানাচে বাসা বাঁধে। আতঙ্কে থম করে রাখে প্রতিটি স্নায়ু। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। হায়রে, পেতাম যদি একজন অন্তত সঙ্গী! যদি তার সাথে আলোচনা করতে পারতাম। কিংবা স্থির হয়ে বসে

কাঁদতে পারতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পারতাম—তবে হয়তো লাঘব হতো আমার ভয়ের বোঝা। হয়তো কিছুটা সান্ত্বনাও পেতাম। কিন্তু কোথায় কে! চারদিকে শুধু ভয় আর ভয়। তবে কি আমি পাগল হয়ে যাব!

ভোরের দিকে নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। ক্লান্ত তো ভীষণ। তদুপরি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। উঠলাম যখন ঘুম ভেঙে, তখন বেশ বেলা। ভালো লাগছে বেশ। শরীর মন বেশ ঝর ঝরে। ভয়ের সেই প্রথম ধাক্কাটা নেই। এখন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা নিজের মনেই বিশ্লেষণ করতে পারছি। ভাবতে বসলাম ফের আগাগোড়া। একটা কথা ঠিক যে যারই পায়ের ছাপ পড়ুক না কেন, সে দ্বীপের অধিবাসী নয়। কেননা দ্বীপ আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, মনুষ্যবসতির কোনো নিদর্শন আমার নজরে পড়ে নি। তবে সে নির্ঘাৎ আগন্তুক। ডোঙায় চেপে বা ভেলায় করে এসেছিল এই দ্বীপে। হয়তো স্বেচ্ছায়, নয়ত বাতাসের তাড়নায়। বাতাস পড়তে ফের নিজের বাসস্থানের দিকে ফিরে গেছে।

মোটমাট একটা কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষ এই দ্বীপে থাকে না। এই দীর্ঘ পনেরো বছরে একটি দিনের তরেও কোনো মানুষকে আমি এই দ্বীপমুখো হতে দেখি নি।

বর্বর বা নরখাদকের কথা যদি মন থেকে মুহূর্তের জন্যে মুছে ফেলি, তবে দ্বিতীয় সম্ভাবনা বলতে প্রথমেই মনে পড়ে সভ্য কোনো মানুষের কথা। ধরে নিতে পারি আমারই মতো হয়তো তারা পড়েছিল কোনো দুর্ভাগ্যের কবলে। তবে রক্ষা পেয়েছে এটা স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়। স্রোতের তাড়নায় হয়তো তরী ভেড়াতে বাধ্য হয়েছিল এই দ্বীপে। ছিল খানিকটা সময়। রাত্রে ভাটার টানে আবার যাত্রা করেছে গন্তব্যের দিকে।

এটা নিছকই কষ্ট কল্পনার পর্যায়ে পড়ে। জোর করে সান্ত্বনা পাবার একটা চেষ্টা। ঘুরে ফিরে বারবার মাথায় আসে বর্বর নরখাদকের কথা। আর ততোই ভয়ে বুক আমার দুরু দুরু করে ওঠে।

আর কেবল গাল পাড়ি নিজেকে। নিজের কাজ নিয়ে নিজেরই অনুতাপ হয়। কেন বানাতে গেলাম গুহার আরেকটা দরজা! কী দরকার ছিল আমার! এতে করে গুহাটা যে নিছক গুহা নয়, মনুষ্যবসতি—এটা তো যে কারুর চোখে ধরা পড়বে। তার উপর বোঝার উপর শাকের আঁটি—তুলেছি টানা একটা দেয়াল। মানুষ ছাড়া কেউ কি পারে এমন দেয়াল তুলতে?—এতো একটা শিশুও বুঝতে পারবে! তাহলে উপায়! এখন এই মুহূর্তে আত্মগোপন করার ব্যাপারটাই প্রধান। দেয়াল সমেত গুহাটাকে আড়াল করতে হবে। লোকচক্ষুর আড়ালে আনতে হবে। তার জন্যে গাছ বসাতে হবে দেয়ালের বাইরের দিকে অর্ধবৃত্তাকারে। বড় হবে সেই গাছ। ঢেকে ফেলবে চারদিক। ভিতরে দেয়াল আছে কি না বাইরে থেকে সেটা কারুর মালুম হবে না।

বসালাম গাছ। দেয়ালটাকেও সঙ্গে সঙ্গে আরো মজবুত করলাম। কাঠকুঠো যেখানে যা ছিল সব এনে গেঁথে দিলাম ভিতরের দিক থেকে দেয়ালের গায়ে। আর সাতটা ফুটো করলাম। হাত ঢোকানো যায় এরকম এক একটা ফুটো। জায়গায় জায়গায় আরো মাটি চাপালাম। হলো সব মিলিয়ে প্রায় দশ ফুটের মতো পুরু। আর সেই সাতটা ফুটো। নজর রাখা যায় চুতর্দিকে তারই ব্যবস্থা। প্রয়োজন বোধে ফুটোর মধ্যে বন্দুক ঢুকিয়ে গুলি ছুড়তে পারব। সাতটা গুলি পর পর ছুড়তে আমার সময় লাগবে মোট দুই মিনিট। মোটের উপর আপাতত আমি নিজেকে নিরাপদ বলতে পারি। আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। অন্তত ভিতরে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো নয়ই।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলাম আমি মরীয়ার মতো

দু'বছরেই গাছ হলো বেশ বড় বড়। খুব ঘন ঘন করে বসানো তো। তার ডালপালা ছড়িয়ে সে এক কুঞ্জ বিশেষ। দূর থেকে দেখলে চেনার উপায় নেই যে এরই আড়ালে আছে কোনো দেয়াল, তার ভিতরে গুহা, সেখানে কোনো মানুষ থাকে এবং তার উপর ইচ্ছে খুশি যেকোনো রকম আক্রমণ চালানো যেতে পারে। মই বানালাম আরো একটা। সেটা পাহাড়ের দিকে রাখলাম। অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে ওদিকে দিয়েও আমি বের হতে বা ভিতরে ঢুকতে পারব।

অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিতে যতখানি কুলোয়, আমার পক্ষে এই পরিবেশে যা যা করা সম্ভব—নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনে সবই করলাম। এছাড়া অন্য কিছু আর আপাতত মাথায় খেলছে না। চিন্তা এখন শুধু আমার ছাগলের পাল নিয়ে।

ছেড়ে দেবার চিন্তা বাতুলতা। ছাড়লে আমারই বিপদ। গোলা বারুদ যে পরিমাণে কমতে শুরু করেছে তাতে আগামী দিনে হাতের কাছে খাদ্য মজুত না থাকলে আমি হয়তো না খেতে পেয়েই মারা যাব। তাছাড়া দুধের যোগানটাও কিছু কম ব্যাপার নয়। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দেখলাম, দুটো মাত্র উপায় আছে ছাগলের পাল রক্ষা করার। এক, যদি আমি মাটির নিচে একটা গুহার মতো করি, সেখানে রাত্রে ঢুকিয়ে দিই পুরো দলটাকে, ভোর হলে যদি আবার বের করে এনে খোঁয়াড়ে ছেড়ে দিই—তবে ওরা নিরাপদে থাকবে। না খেয়ে মরবে না এবং সর্বোপরি রাতে কারুর চোখে ওদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না। দ্বিতীয় পন্থা হলো, যদি এক জায়গায় সবাইকে না রেখে দুটো কি তিনটে দলে ভাগ করি এবং এক একটা দলের জন্যে আলাদা আলাদা জায়গা ঠিক করি। এতে সুবিধে এই, চট করে ওরা যে গৃহপালিত জীব এটা ধরা পড়বে না এবং আমারো মাটির নিচে গোপন আস্তানা খোঁড়ার প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয়টাই প্রথমটার তুলনায় মনঃপূত হলো বেশি। তখন লেগে গেলাম জায়গা খোঁজার কাজে। একটা পাওয়া গেল। দুপাশে গাছের আড়াল, মাঝখানে খানিকটা চত্বর মতো। তাতে সবুজ কচি ঘাস। প্রায় তিন একর পরিমাণ বিচরণের জমি। আমার কাজের পক্ষেও এটা যথেষ্ট সুবিধাজনক। বেড়া দিতে বা ঘিরতে বিশেষ একটা পরিশ্রম লাগবে না। বলতে গেলে সব দিক থেকেই আমার মনের মতো।

কাজে লেগে গেলাম পরদিনই। মোট সময় লাগল একমাস। চারধারে বেড়া বাঁধা শেষ। বেড়ার ধারে ধারে বসিয়ে দিয়েছি গুল্ম জাতীয় গাছ। তারপর কটা মাদী আর দুটো মর্দাকে এনে ছেড়ে দিলাম চত্বরে। আগের মতো তেজ তো আর নেই। অনেকটা পোষ মানা গোছের ভাব এখন। জোর জবরদস্তি তেমন আর ফলাতে চায় না। দেখি মূল দল থেকে আলাদা হয়েও বেশ স্বচ্ছন্দেই আছে। ব্যস, আমারো স্বস্তি।

জানি না আপনারা ব্যাপারটাকে কী চোখে দেখছেন। এই যে এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা—সব কিছুর মূলে কিন্তু বালির উপর সেই পায়ের ছাপ। না দেখলে এত খাটাখাটুনির কোনো প্রয়োজনই হতো না। এ যেন অজানা অলীকের পানে মোহগ্রস্তের মতো ছুটে যাওয়া। শুধু ছাপ, মালিককে এই দুবছরের মধ্যে বারেকের তরেও দেখতে পেলাম না। জানি না কেমন তার আকৃতি প্রকৃতি। তবে সে যে মনুষ্য, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সভ্য হতে পারে, কিংবা অসভ্য। দুটোই আমার কাছে সমান ত্রাসের ব্যাপার। মোটমাট মানুষের সান্নিধ্য এখন আমি এড়াতে চাই। তাদের ছায়া দেখলেও জানি না হয়তো আৎকে উঠব। ঈশ্বরের কাছে দিবানিশি এই প্রার্থনা জানাই—প্রভু, আর যাকেই হাজির কর তুমি এই দ্বীপে, সে যেন মানুষ না হয়। অসভ্য বর্বর তো নয়ই, এমন কি সভ্য মানুষও। এই আমার জীবনের সর্বশেষ কামনা। তবে এই শান্তির আলয়ে অশান্তির ছায়া ঘনাবে। তোমাকে নিভৃতে ডাকার কাজে ছেদ পড়বে। আমি চাই না সে কাজে কেউ বিঘ্ন ঘটাক। চাই না কেউ আমার এই সাম্রাজ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসুক।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক। কাজের কথা বলি। আমার ছাগলের পালের মধ্যে এক দলকে করেছি নিরাপদ, আরো একদলের নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। তারই খোঁজে কদিন সারা দ্বীপ তোলপাড় করে বেড়ালাম। মোটমাট থাকতে পারে ওরা নিরাপদে, এমন একটা চমৎকার জায়গা আমার চাই। একদিন, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছেছি পশ্চিম প্রান্তে, আনমনে তাকিয়েছি সমুদ্রের দিকে—ওমা, দেখি একটা নৌকা! খুব দূরে ঠিকই, তবু চোখ যেন মুহূর্তের জন্যে ধরা পড়ল। নাকি আমার দেখারই ভুল! দুরবিন তো আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াই না, গুহায় বাক্সের মধ্যে সযত্নে মজুত আছে। মোট দুটো। সেই নিয়ে এসেছিলাম জাহাজ থেকে। এত আফসোস হলো! ইস, যদি থাকত এখন একটা সাথে! ভাবলাম, যাই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু সে কি আর একটু দূর। ফিরে আসতে আসতে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যের ঘোর নামবে। তখন তাড়াতাড়ি কাছের একটা টিলার মাথায় চড়লাম। কই, কিছুতো নেই! সুনসান চারধার! তবে কি আমার মনের ভুল! ভারি দুশ্চিন্তা নিয়ে নেমে এলাম উপর থেকে। ঠিক করলাম, এবার থেকে দুরবিন সঙ্গে না নিয়ে আমি এক কদমও বাড়াব না।

মোটামুটি এতদিন পরে আমি পায়ের ছাপের একটা যুক্তি খাড়া করতে পারছি। দৃষ্টি বিভ্রমের ব্যাপার নয়, বারেকের জন্যে হলেও আমি যা দেখেছি সেটা নৌকো। স্বভাবতই

নৌকোর চালক নরখাদক বর্বর। সঙ্গে নির্ঘাৎ কোনো বন্দি। অর্থাৎ আমারই মতো কোনো হতভাগ্য, ভুল করে বা অন্য কোনো কারণে হয়তোবা ওদিকের দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়েছিল। নেমেছে ডাঙ্গায়। অমনি ধরা পড়েছে ওদের হাতে। নৌকোয় করে বন্দিকে নিয়ে মহা খুশিতে ওরা রওনা দিয়েছে এই দ্বীপের দিকে। জানে তো এখানে মানুষজন থাকে না। তারপর আর কি? বন্দিকে হত্যা। তারপর মহানন্দে হইচই করে নরমাংসের ভোজ!

এটা যে অলীক কল্পনা নয়, তার প্রমাণ একটু পরেই পেলাম। এই অংশে আগে আমি কখনো আসি নি। পাহাড় থেকে নেমে কূলের দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ দেখি, এক গাদা নরখুলি, হাত পা আর ধড়ের কঙ্কাল, পাশে একটা জায়গায় আগুন জ্বালাবার চিহ্ন, বালি খুঁড়ে সেখানটায় ছোট একটা উনুন মতো করা হয়েছে। অর্থাৎ রান্নাবান্না হয়েছে এখানে বসেই। কঙ্কাল কটা ফেলে রেখে গেছে।

দেখে আমার তো প্রথম অবস্থায় ভিরমি খাবার যোগাড়! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। এই বিপদের হাতে আমিও যে পড়তে পারি যেকোনো মুহূর্তে, আমারো যে একই দশা হতে পারে—এ চিন্তাটুকুও তখন আর মাথায় নেই। কী নৃশংস এই নরখাদকের দল! পারে এইভাবে রক্তমাংসের একটা জ্যান্ত মানুষকে কেটে কুটে খেতে! শুনেছি এদের সম্বন্ধে বিস্তর, কিন্তু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা বলতে গেলে এই প্রথম হলো। সংবিৎ ফিরে আসতে সে কী ঘেন্না আমার শরীরে, কী গা গুলানো ভাব! বমি পাচ্ছে। এখুনি যেন কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। গায়ে পায়ে এতটুকু যেন জোর নেই। নিজের অজান্তেই সকালের খাওয়া যাবতীয় খাবার হড়হড়িয়ে উঠে এল গলা দিয়ে। উঃ, সে যা অবস্থা! বেশ কয়েকবার ওয়াক উঠল। শেষে শুধু জল বের হয় মুখ দিয়ে। পেটে আর তো কিছু নেই। তখন স্বস্তি বোধ করলাম অনেকটা। সুস্থ লাগছে। হাত পায়ের কাঁপুনিও কমেছে। কিন্তু আর না এবার পালাতে হবে এখান থেকে। পারছি না সহ্য করতে এই দৃশ্য। তখন প্রাণপণে চোখ সরিয়ে নিয়ে পিছু ফিরলাম এবং কোনোদিকে দৃকপাত না করে বনবাদাড় ভেঙে দে ছুট!

বেশ খানিকটা এসে দাঁড়ালাম এক চমক। তখনো কেমন যেন নেশালাগা ঘোর ঘোর ভাব। দেখি কড়কড় করছে চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। অর্থাৎ কান্না। নিজের অজান্তেই কখন যেন কাঁদতে শুরু করেছি। আকাশের দিকে মুখ তুললাম, ঈশ্বরকে ডাকলাম—প্রভু, আমায় রক্ষা কর, আমি পাপী। বুঝতে পারি না তোমার মহিমা। তাই তোমাকে বারে বারে দোষ দিই। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। এ আমার পরম আশীর্বাদ। আমি ধন্য। আমায় ক্ষমা কর।

আহ, অনেকটা হালকা লাগছে। চোখের জল মুছলাম। ফিরে গেলাম নিজের বাড়িতে। ভয়ের বোধটা এখন বলতে গেলে নেই। আসলে এই যে দ্বীপে আসে ওরা কখনো সখনো, সেটা দ্বীপে কি পাওয়া যায় তার খোঁজে নয়, লোকচক্ষুর আড়ালে এই নীরব নির্জনে বসে ওদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে। যতদূর অনুমান কূল ছেড়ে ওরা ডাঙ্গায় অব্দি ওঠে না। জানে তো উঠে কোনো লাভ নেই। এখানে তো আর কিছু মিলবে না। অহেতুক তাই আর পরিশ্রম কেন। তাইতো এই দীর্ঘ আঠারো বছর ঐ কটা পায়ের ছাপ ছাড়া আর একটা ছাপও আমার নজরে পড়ল না। পড়ুক না পড়ুক আমারই বা কীসের অত মাথাব্যথা! আমি তো আর স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আগ্রহী নই। আসুক ওরা, যা খুশি তাই করুক, আমি যেমন আছি থাকব। ওদের চোখের আড়ালে, নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রেখে। অত দুর্ভাবনা করে আমার লাভ কী!

কিন্তু পারা যায় কি তবু? চিন্তা করা যত সোজা সেটাকে কার্যে পরিণত করা যে ততটাই কঠিন। ভাবি মনে আর স্থান দেব না ভয় বা আতঙ্ক, ভিতরে বোধটা স্থায়ী ভাবে থেকে যায়। তাই নিয়ে সদা সর্বদা বিশ্রী এক মনের ভাব। কিছুটা বিষণ্ন, কিছুটা বা ভয়ার্ত। দুয়ে মিলে অদ্ভুত এক থমথমে পরিবেশ। ঘুরে ফিরে বেড়াই,—সব নিজের পরিচিত সীমার মধ্যে। দূরে কোথাও যাই না। খুব বেশি হলে মাচান অব্দি আমার দৌড়। ছাগল যেখানে সে অব্দি যেতে ভয় লাগে। ডোঙা দেখতেও যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সেটাকে কখনো নিয়ে আসব যে দ্বীপের এই ধারে—সে চিন্তা ইদানীং মন থেকে বিসর্জনই দিয়েছি বলা যায়। এইভাবেই কেটে যায় দুটি বছর।

তা বলতে গেলে নির্বিঘ্নেই কাটল। আগের মতোই গতানুগতিক জীবন, শুধু একটু অধিক মাত্রায় সতর্ক এই যা। চোখ কান আগের চেয়ে একটু বেশি খোলা রাখি। সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলেই থমকে যাই। খতিয়ে দেখি জিনিসটা কী। নিশ্চিন্ত হলে তবে এগোই। নতুবা নয়। মোটমাট ধরা আমি কিছুতেই দেব না। পারবে না কেউ আমাকে অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কাবু করতে। কাঁধে আমার সর্বদা সজাগ বন্দুক। হিসেবে করে বারুদ বা টোটা ব্যবহারের দরকার তো আর এখন নেই। খাদ্য আমার যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। এক পাল ছাগল রয়েছে খামারে। তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নতুন ছাগল ধরবার প্রয়োজন হলে এখন আর গুলিগোলা ব্যবহার করি না, স্রেফ ফাঁদ পেতে একটার পর একটাকে ঘায়েল করি। তা হিসেব করে দেখলাম গত দু'বছরে একটি বারের জন্যেও আমি গুলি ছুড়ি নি বা ছুড়বার প্রয়োজন বোধ করি নি। তবু বের হলে সঙ্গে কিন্তু বন্দুক আমার নিত্য সহচর। তিনটে পিস্তলও থাকে। দুটো তো বটেই। কোমরের বেল্টের সঙ্গে গাঁথা বলতে গেলে। তলোয়ারও আছে। সেটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু ঐ এক ঝামেলা—খাপ নেই তরবারির। সেক্ষেত্রে খোলাই থাকে। সেই অবস্থাতেই আমি ড্যাঙডেঙিয়ে ঘুরে বেড়াই।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে এই আমার বর্তমান জীবন। এর সঙ্গে পুরানো অবস্থাটাকে মেলাতে বসলে মাঝে মাঝে একটু দুঃখ হয়। পুরানো দিনগুলোতে ছিল অপূর্ব এক শান্তির ভাব, যাকে বলে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন। সেই শান্তি ইদানীং বিপর্যস্ত হয়েছে। তার বদলে ভয়। তুলনামূলকভাবে এখন আমি বরং খানিকটা দুঃখের মধ্যেই আছি। তুলনা এইভাবেই হয় কিনা। একের সঙ্গে অপরকে মানুষ তুলনা করে। নিজের অবস্থার সঙ্গে আরেক জনের অবস্থাকে খতিয়ে দেখে। তবেই না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ টের পায়। আমিই বা এর ব্যতিক্রম হই কীভাবে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখি ইদানীং—আগের মতা অতটা অভাববোধ আর আমার নেই। আগে সেই যেমন দরকার লাগত এটা ওটা নানান জিনিস—সেই দরকার থেকে জন্ম নিত নানান উদ্ভাবনী কৌশল—সব গেছে বর্তমানে স্তব্ধ হয়ে। এটা ভালো এটা মন্দ—এই নিয়ে বাছাবাছিও দেখি ইদানীং বন্ধ হয়ে গেছে। অল্পেতেই এখন যথেষ্ট সন্তুষ্ট বোধ করে থাকি। যেমন মাঝখানে ভেবেছিলাম যব থেকে হালকা এক ধরনের পানীয় মদ বানাব। আগের অবস্থায় থাকলে হয়তো এতদিন বানিয়েও ফেলতাম। কিন্তু এখন আর ঐ সব ঝঞ্ঝাটে মাথা গলাতে ইচ্ছে করে না। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—কীসের অত সখ রে বাপু! তার চেয়ে করব না ভাবলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

দেখে আমার তো প্রথম অবস্থায় ভিরমি খাবার অবস্থা

এই হলো বর্তমানে আমার মনের অবস্থা। ঘুরে ফিরে একটাই চিন্তা কেবল এখন। কী করে কী কৌশলে যদি আসে দুর্বৃত্ত শয়তানের দল, তাদের মোকাবিলা করব। আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তবে এই দ্বীপে নিয়ে আসে তারা বন্দিকে। কেটেকুটে খায়। আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কীভাবে রক্ষা করব সেই বন্দি জীবন। তাঁকে বাঁচাব। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদেরও ঘায়েল করার ব্যাপার আছে। হত্যা করব তাদের। কিংবা এমন ভয় ধরিয়ে দেব যাতে আর এই দ্বীপে আসার সাহস না পায়। কিন্তু সে কি আমার একলার পক্ষে সম্ভব? আমি একা মানুষ—আর ওরা যদি সংখ্যা হয় বিশ-বাইশ জন! তিরিশও হতে পারে। সঙ্গে নির্ঘাৎ থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। তীর ধনুক বা বল্লম কি বর্শা। সেক্ষেত্রে আমি কি পারব বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে?

আচ্ছা যদি গর্ত খুঁড়ি একটা—কেমন হয়? সেই যেখানটায় আগুন জ্বেলেছিল। তার মধ্যে বারুদ রেখে দেব অনেকটা। প্রায় পাঁচ ছ পাউন্ড ওজনের। ওরা যেই ফের এসে আগুন জ্বালবে অমনি বারুদে ধরে যাবে আগুন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ—ফলে কেউ আর বাঁচবে না।

আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পনা হিসেবে চমৎকার, কিন্তু দু একটি অসুবিধের জায়গাও আছে। প্রথমত অতটা বারুদ নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে নেই, মনের দিক থেকে তেমন সায় পাই না। সঞ্চয় বলতে আছে আর মাত্র এক পিপে। ফুরোতে কতক্ষণ? দ্বিতীয়ত আগুনের কাছাকাছি যে বসবেই ওরা তার কোনো স্থিরতা নেই। দূরেও বসতে পারে। সেক্ষেত্রে বিস্ফোরণের আঁচ তাদের লাগবে না। হয়তো শব্দ হবে, কানের পাশ দিয়ে দুমদাম করে বেরিয়ে যাবে কটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ, তাতে ভয় পাবে তারা, কিন্তু প্রাণে মরবে না।

এবং সে অবস্থায় আমাকে পাল্টা কোনো রাস্তা ভাবতেই হচ্ছে। আচ্ছা যদি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের উপর! তিনটে বন্দুক তো আমার আছে। তিনটেতেই থাকবে দুটো করে টোটা ভরা, ওরা হই হুল্লোড়ে মেতে উঠবে, অমনি রৈ রৈ চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের মাঝখানে। তারপর আর কি—দেদার গুলি। এক এক গুলিতে জোড়ায় জোড়ায় তো

পারবই ঘায়েল করতে। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। বন্দুক ছাড়াও সঙ্গে থাকবে পিস্তল, আর তরবারি। যদি মোট থাকে কুড়ি জন,—কুড়িটাকেই আমি খতম করব। করবই। সে মনোবল আমার আছে। তবে আর কি, সেইভাবেই নিজের মনকে প্রস্তুত করি।

কয় সপ্তাহ ধরে এই নিয়ে চলল ভাবনার খেয়া। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। কীভাবে মহড়া নেব, কীভাবে বন্দুক চালাব, পিস্তলটা থাকবে কোথায়—এই সব নিয়ে কেবলই নানান ফন্দি আঁটি। শেষে এমনই অবস্থা ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম মারপিটের।

জায়গাটাও দেখে এলাম অনেক বার। কোথায় লুকিয়ে থাকব আমি, কোথায় বসলে ওরা আমাকে দেখতে পাবে না কিন্তু আমি নজর রাখতে পারব ওদের প্রতিটি গতিবিধির উপর, সব ঠিক করে ফেললাম। এতে লাভ হলো এই—মন থেকে ভয়টা ক্রমশ মুছে যেতে শুরু করেছে। বদলে জন্ম নিচ্ছে ঘৃণা আর বিদ্বেষ। অদেখা অজানা সেই বিশ-ত্রিশ জন বর্বর শয়তান নরখাদকের উপর বিদ্বেষ।

যেখানে লুকোব সেটা পাহাড়ের ঢালে একটা মস্ত গাছের কোটর। প্রতিটি কার্যবিধি আমি নিখুঁতভাবে ঠিক কর ফেলেছি। বসে থাকব সেই কোটরে, ওরা নৌকোয় চেপে আসবে, নামবে তীরে—আমি সব দেখতে পাব। তারপর হয়তো বন্দিকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেবে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার লুক্কায়িত জায়গা থেকে ছুড়ব গুলি। পর পর কয়েকবার। একের পর এক শয়তান পড়বে মাটিতে লুটিয়ে। ব্যস আমার উদ্দেশ্য সার্থক।

কিন্তু হ্যাঁ, যদি কোনোক্রমে নিশানা ব্যর্থ হয়।

সেটাও ভেবে রেখেছি একই সঙ্গে। কী করব তখন সেটাও ঠিক। যাতে না হয় সেজন্যে বন্দুকে ভরা থাকবে অতিরিক্ত টোটা। ছররা যাকে বলে। একবার ঘোড়া টিপলে একসাথে ছুটে যাবে অনেকগুলো গুলি। একটা না একটা লাগবেই নির্ঘাৎ। মুরগি মারার সময় আমি যে ছররা ব্যবহার করে থাকি। তদুপরি পিস্তল তো সঙ্গে রয়েছেই। তাতে থাকবে চারটে করে টোটা। বন্দুকে কাজ না হলে পিস্তল চালাব।

এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা। রণকৌশল আমি ঠিক করে ফেলেছি, বলতে গেলে প্রতিটি ইঞ্চি মেপে নির্ভুল। তত্ত্বের দিক থেকে এতটুকু ত্রুটি কোথাও নেই। এখন শুধু তাদের আসার অপেক্ষা। আসে কিনা দেখার জন্যে রোজ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠি। আমারই বাড়ির গা ঘেঁষে যে পাহাড়টা। দুরবিন দিয়ে চতুর্দিকে নজর বোলাই। কই, পড়ে না তো কিছু চোখে। নৌকো তো দূরের কথা, একটা ভেলা অব্দি দূর থেকে এদিকে ভেসে আসতে দেখি না। অথচ তিন তিনটে মাস প্রতিদিন আমার পর্যবেক্ষণের কামাই নেই। তিন মাইল চড়াই ভেঙে পাহাড়ের মাথায় ওঠা। ফের খানিকক্ষণ কাটিয়ে ড্যাঙডেঙিয়ে নেমে আসা। ফল প্রতিদিনই শূন্য। দেখা পাই না জনমনিষ্যির।

তবে সে জন্যে আমার কোনো হতাশা নেই। ক্ষিপ্ত যে এখন আমি। আর ভিতরে ভিতরে দারুণ রাগ। বিশ হোক আর ত্রিশ হোক যত জন খুশি আসুক—আমি খুন করবই করব। এটা আমার সংকল্প। নরহত্যার বদলা আমি নেবই। একদিন এই মনোভাব নিয়ে পাহাড়ে উঠছি চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখার জন্য, হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মনে উদয় হলো। আচ্ছা, এই আমি যা করব বলে ঠিক করেছি—এটা ঠিক তো, না ভুল? ঈশ্বর যদি নিয়ন্তা হন এই বিশ্বপৃথিবীর, তবে এই যে নরহত্যা ওরা করে, এই যে পাপ—এর বিরুদ্ধে তিনি কোনো পন্থা গ্রহণ করেন না কেন? পাপীকে শাস্তি দেওয়াই তো ঈশ্বরের কাজ। ওরা কি শাস্তি পায় এই অন্যায়ের জন্যে?

এ যে অদ্ভুত এক আত্মদর্শন। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সমস্ত প্রচেষ্টা আমার, সমস্ত চিন্তা সমস্ত উদ্যোগ—সব যেন অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। আশ্চর্য, এ প্রশ্ন আমি এতদিন খতিয়ে দেখি নি কেন! এই যে হত্যা ওরা করে—এমনো তো হতে পারে, পাপ বা অন্যায় ভেবে ওরা করে না। এটা ওদের প্রথা। বন্দিকে হত্যা করতে হয় এটা রেওয়াজ, তাই হত্যা করে। একে তো পাপ বলতে পারি না। কোনো দিক থেকেই এটা অন্যায় নয়। তবে কেন অনর্থক আমি ওদের বিরুদ্ধে রাগে বিদ্বেষে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছি?

পাহাড়ের মাথা অব্দি ওঠা আর হলো না, মাঝপথে দাঁড়িয়েই এই সব নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এই যে দীর্ঘ তিনমাস ধরে একের পর এক চিন্তা আমি করেছি, বিদ্বেষ বিরোধে পূর্ণ করেছি আমার হৃদয়ের পাত্র—সেটা এখন মনে হচ্ছে সর্বৈব ভুল। ভাবছি ওদের আমি হত্যাকারী, আসলে ওরা তা নয়। বন্দি হত্যা যদি অপরাধ বলে ধরি, তবে ইংরেজরা তো অনেক বেশি অপরাধী। যুদ্ধে বন্দিদের তারা ধরে জেলে ভরে, আজীবন রাখে কারাবাসে, সেখানেই মৃত্যু হয়। এছাড়া যুদ্ধে যে অগণিত হত্যা হয়, মৃত্যু হয়—তারও মূলে তো তারাই। সেটাই বা কি কম অপরাধ।

একটু ঘুরিয়ে চিন্তা করলে যা ওরা করছে—সে যত নৃশংসই হোক না কেন, তাতে আমার কী-ই বা আসে যায়? এরকম কত ঘটনাই তো ঘটে পৃথিবীতে। নানান দেশে। স্পেনীয়রা শুনি দেবদেবীর নামে বন্দি জীবন উৎসর্গ করে। নিষ্ঠুরভাবে তাদের প্রাণ বলি দেয়। কত অত্যাচারই তো করল তারা। আমেরিকায় কত হত্যাই না করল। লক্ষ লক্ষ আমেরিকার আদিবাসীকে প্রাণ দিতে হলো। এ ব্যাপারে নিয়ে যখন কোনো বিবৃতি শুনি, তাতে তো অপরাধ বা অন্যায়ের লেশমাত্র থাকে না। এটাকে প্রচার করা হয় জীবনের এক স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে। সারা ইউরোপের মানুষ একে ন্যায় এবং সত্য বলেই মনে করে। এমনকি দেবদেবীর নামে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে উৎসর্গ করাকেও। কই, তার জন্যে তো আমি কখনো রুখে যাই না। নৃশংস, নিষ্ঠুর, বর্বর আচরণ বলে কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ি না। তবে এই ঘটনা নিয়েই বা আমার এত মাথাব্যথা কীসের?

মোটমাট আমার এতদিনের যাবতীয় প্রস্তুতি, যাবতীয় উদ্যম সব স্তব্ধ করে দিল এই চিন্তা। বলতে গেলে বিরাট একটা যতিচিহ্ন। থমকে গেলাম। নেমে এলাম পাহাড়ের উপর থেকে। আর ভাবব না এসব। অনর্থক কারুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে মুখিয়ে যাব না। কী দরকার জবরদস্তি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ার? যদি ওরা আমাকে আক্রমণ করে তখন নয় অন্য কথা। কিন্তু যতক্ষণ করছে না, আমার করণীয় কী থাকতে পারে।

সে যেন এক নতুন উপলব্ধি আমার। নতুন ভাবে আগাগোড়া সব কিছু বুঝবার ভাববার চেষ্টা করা। কত ত্রুটি যে ছিল আমার পরিকল্পনায়! এতদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম, তাই বুঝতে পারি নি। যেমন, হুড়মুড় করে হয়তো গিয়ে পড়লাম ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে বন্দুক চালালাম। মরল অনেকে। হয়তো একজন কোনোভাবে ত্রাণ পেল। নৌকো বেয়ে অসীম ক্ষিপ্রতায় ফিরে গেল নিজের দেশে। সেখানে গিয়ে সব কথা বলল, নিয়ে এল হাজার হাজার মানুষ আমার উপর বদলা তুলবার জন্যে। তখন কি আর তিনটে বন্দুক আর তিনটে পিস্তল নিয়ে পারব আমি ওদের সাথে মহড়া দিতে। সেক্ষেত্রে নিজের ধ্বংস অনিবার্য।

অর্থাৎ কৌশলের দিক থেকে হোক কি নীতির দিক থেকে হোক কোনো ভাবেই ওদের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার ঠিক না। তাতে নিজেরই ক্ষতি। আমার একমাত্র কাজ হবে এখন নিজেকে ওদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। সেই সাথে আমি যে এখানে আছি সেটা ওদের কোনো ভাবে বুঝতে না দেওয়া।

এর বাইরে অন্য কিছু করার অধিকার আমার নেই। এটা আমি ধর্মের নিরিখ থেকে বলছি। খোদার উপর খোদকারী করা কি মানুষের সাজে! এই তো ঈশ্বরের সাজানো বাগান। এই বিশ্ব দুনিয়া। সেখানে যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে সে নিজের নিজের নিয়মে। ঈশ্বরের সমর্থন আছে বলেই না সেভাবে সাজাতে পারি। আমি কে এমন ক্ষমতাধর যে সব নিয়ম তছনছ করে নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমি নিজের হাতে তুলে নেব?

এত শান্তি পেলাম মনে, এত নিশ্চিন্ত—সে আর বলার নয়। বুক যে হালকা আমার। হৃদয় যেন পবিত্র। কী পাপই না করতে চলেছিলাম আমি! নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছিলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই না এবারও ত্রাণ পেলাম!—হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে আর কীভাবে ধন্যবাদ জানাব! আমি অবোধ, আমি দুর্মতি। তুমি বারেবারে আমাকে আলোর দিশা দাও। আমি অজ্ঞান, তাই আমি বারবার ভুল করি।

পরের একটা বছর এইভাবেই কাটালাম। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন। কোনো তাপ নেই উত্তাপ নেই। শুধু সতর্কতা ভীষণ। অহেতুক নিজেকে জড়াব না কোনো ঝামেলায় এটাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। আমি যে এই দ্বীপের বাসিন্দা এটা কোনো ভাবে কাউকে বুঝতে বা জানতে দেব না। যত্রতত্র সেই কারণে আর যাই না। উঠি না পাহাড়ের মাথায়। ডোঙাটা যেখানে নোঙর করা ছিল সেখান থেকে দড়ি বেঁধে গুণ টেনে নিয়ে এলাম পুবের কূলে। তোলা ছিল পাল, সেটা নামিয়ে দিলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। ডোঙায় বাকি যে সব জিনিস রেখেছিলাম সব একে একে বাড়িতে এনে তুললাম। ডোঙাটা রাখলাম পাহাড়ের ঘেরা এক খাঁড়ির মধ্যে। মোটমাট কেউ যদি দেখে ভুলেও বুঝতে পারবে না এটা এই দ্বীপেরই কারুর হাতে তৈরি। ধরে নেবে ভাসতে ভাসতে এসেছে হয়তো সমুদ্রের স্রোতে, কোনো রকমে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ব্যস এছাড়া অন্য কিছু বুঝবার বা ভাববার কোনো উপকরণ তাদের চোখে পড়বে না।

নিজের গতিবিধিও এখন যারপরনাই নিয়ন্ত্রিত। বাইরে বড় একটা যাই না। নিজের সীমানার মধ্যেই থাকি। কাজের মধ্যে প্রধান এখন দুধ দোয়ানো। তিনটে তো খোঁয়াড় মোট আমার। তাতে অগুণতি ছাগল। নিয়ে আসি দুধ। নিজের রান্নাবান্না করি। আর ভাবি এটা ওটা আকাশ পাতাল। ঈশ্বরের অসীম দয়া তাই না আমি বেঁচে আছি। যদি আমার অনুমান নির্ভুল হয় তবে এই দীর্ঘ বিশ বছরে ওরা অজস্রবার এসেছে এই দ্বীপে। সেই বর্বর নরখাদকের দল। সংখ্যা কখনো বিশ কখনো ত্রিশ। এতদিন তো চলাফেরার আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেখানে খুশি যেতাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম দ্বীপের প্রতিটি অংশ। সম্বল বলতে হাতে শুধু একটা বন্দুক। তাতে আবার পাখি মারার টোটা ভরা। যদি সেই অবস্থায় দেখে ফেলত ওরা। যদি উন্মাদের মতো আমাকে ধরবে বলে পিছনে ধেয়ে আসত! পারতাম আমি নিজেকে রক্ষা করতে! ওদের চেয়ে কি জোরে আমি ছুটতে পারি!

শিউরে উঠি নিজের মনেই। মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল হিমস্রোত বয়ে যায়। প্রত্যক্ষ করি কল্পনার দৃষ্টিতে তার পরের ঘটনাবলি। নিষ্ঠুর নির্দয় ভাবে ওরা আমাকে হত্যা করছে, তারপর পরম উল্লাসে কেটে কেটে খাচ্ছে আমার গায়ের মাংস। সে যে কী বীভৎস, ভাবতে বসলে আর বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। কত একলা আমি এই দ্বীপে, কত অসহায়। এমন কেউ নেই যে আমাকে এই সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তখন কান্না পায়। তখন দুঃখে বুক ভেঙে যাবার দাখিল হয়। ঈশ্বরের নাম তখন জপ করি মনে মনে। হে ঈশ্বর, এই নিঃসঙ্গতায় তুমিই আমার একমাত্র পরিত্রাতা। তখন মনে একটু জোর আসে।

এ এক অদ্ভুত নিয়ম। আশ্চর্য আমাদের এই জীবন, ততধিক আশ্চর্য জীবনের এইসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। যেন অমোঘ কোনো নির্দেশ। মানুষ পড়ে বিপদের মুখে, হয়তো এমনই সে বিপদ তার করবার মতো কোনো কিছুই আর নেই। জানে না কোন দিকে কোন পথে এগোবে বা কীভাবে ত্রাণ পাবে। সেক্ষেত্রে অন্ধকারে আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখায় তাকে এই অদৃশ্য নির্দেশ। সেই পথে এগিয়ে সে বিপদ থেকে ত্রাণ পায়। আমারো জীবন জুড়ে এই অলৌকিক নির্দেশের ছলাকলা। বারে বারে পথ যায় ভুল হয়ে, বারে বারে বেঠিক হয়ে যায় লক্ষ্য, কী করব হাজার চেষ্টা করেও ঠিক করে উঠতে পারি না, তখন অলৌকিক অদৃশ্য নির্দেশ আমাকে পথ দেখায়। সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেয়ে আমি নতুন জীবন নতুন উপলব্ধি লাভ করি।

পরেও বহুবার জীবনের নানান ক্ষেত্রে আমি এই সত্য যাচাই করে দেখেছি। একভাবে এগোতে এগোতে পেয়েছে এই নির্দেশের হাতছানি, অমনি থমকে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা নতুন করে ভেবেছি, পেয়েছি নতুন পথের দিশা। পুরানো পথ ত্যাগ করে আমি সেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি।

এর অসংখ্য উদাহরণ আমার এই দ্বীপবাসের জীবনে মজুত আছে। পাঠক ইতোমধ্যেই কিছু কিছু নজির পেয়েছেন। আরো পাবেন। সময়ে সব উদাহরণই আমি হাজির করব।

মোটামাট অদ্ভুত এক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে চলছে আমার জীবন। আমার সব হিসেব বদলে গেছে। কত কী বের করতাম মাথা খাটিয়ে, সে সব এখন বন্ধ। উদ্বেগে ছেয়ে থাকে সারাক্ষণ আমার মন। কত কিছু যে বাদ দিয়েছি! নিরাপত্তার প্রশ্নটা যে এখন সর্বপ্রধান। সেই ভয়ে আগুন জ্বালি না। তৈরি করি না আর বাসন। যদি গলগলিয়ে ওঠে ধোঁয়া! ধোঁয়ার কুণ্ডলি অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তাতে আমি যে আছি এখানে সেটা অনেকেই অনুমান করতে পারবে। বিশেষ করে যদি নরখাদকদের চোখে পড়ে! তাই গুলিও ছুড়ি না। শব্দ সহজেই জানান দেয় মানুষের অস্তিত্ব। কাটি না গাছ। তাতে কুড়ুলে গাছের গায়ে ঘা লেগে শব্দ উঠবে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বাতাসে ছড়িয়ে যাবে সেই শব্দ। যদি শুনতে পায় ওরা।

একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

আগুন না জ্বেলে তো আর উপায় নেই। রান্নার প্রয়োজনে জ্বালতেই হবে। তাই নিরিবিলি একটা জায়গা দেখে অনেক ভেবেচিন্তে কাটতে গেছি কাঠ, সামনে পাহাড়ে ছোট একটা গুহা, কাঠ ইদানীং আমি আর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি না, পুড়িয়ে কাঠকয়লা বানাই, তাই দিয়ে রান্নার কাজ করি। গুহাটা মোটের উপর আমার পক্ষে আদর্শ। কাঠ পোড়াব এই গুহার মধ্যে, সেক্ষেত্রে গলগলিয়ে ধোঁয়া ওঠার ব্যাপার নেই। কাঠ কেটে জড় করে ভাবলাম যাই একবার, সর্বপ্রথম গুহাটা সরেজমিনে পরীক্ষা করে আসি।

ঢুকে দেখি বেশ বড়সড় মাপের। মুখটা উঁচু প্রায় সাত ফুট, আমার মতো দু'জন মানুষ পাশাপাশি হেঁটে স্বচ্ছন্দে গুহায় প্রবেশ করতে পারে। দৈর্ঘ্যে খুব একটা মস্ত নয়। ঠিক কতটা এই মুহূর্তে বলা যায় না। আর ভারি অন্ধকার ভিতরে। চোখে কিছুই ঠাওর হয় না।

আরো কয়েক পা এগোলাম।

ওমা, দেখি অদ্ভুত এক ব্যাপার—দুটো চোখ, এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না, হঠাৎ যেন অন্ধকারের বুক চিরে আমার দিকে কটমট করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বুক তো আমার শুকিয়ে কাঠ। পা আর চলে না। শ্বাস প্রায় বন্ধ। না পারি এগোতে না পারি পিছোতে। এ আবার কী ধরনের জন্তুরে বাপু! হিংস্র কি? ঝাঁপ দেবে এখুনি

আমাকে লক্ষ্য করে? অন্ধকারে চোখের অধিকারী যে কে—মানুষ না কোনো জন্তু নাকি অপদেবতা—কিছুই তো মালুম হয় না।

আরো খানিকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সংবিত ফিরে পেলাম। ধাতস্থ হলাম খানিকটা। আর নিজেকে নিজেই সে কী গালমন্দ! কী কটু কথার চোট! বিশটা বছর না রয়েছি আমি এই দ্বীপে? আমি এমনই আহাম্মক এটাকে হিংস্র কোনো জন্তু ভেবে ভয় পাচ্ছি? কিন্তু নড়ে না কেন এতটুকু? আসলে কী এর পরিচয়?

অমনি এক ছুটে বাইরে গেলাম, জ্বালালাম একখণ্ড কাঠ, নিয়ে ঢুকলাম ভিতরে, ভীষণ উত্তেজনা তখন আমার, তিন কদমও এগোই নি, হঠাৎ শুনি মানুষের গলায় গভীর এক শ্বাস ফেলার শব্দ। তারপর ককানি। যেন ভীষণ দুর্বল কেউ ককিয়ে ককিয়ে নিজের শরীরের কষ্ট প্রকাশ করছে। পাঠক, ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। একটু আগের মনের জোর আমার মুহূর্তে চুপসে গেল বেলুনের মতো। ভীষণ ঘাবড়ে গেছি আমি। মাথায় টুপি পরা, নয়ত হাত দিলে টের পেতাম চুল আমার দাঁড়িয়ে গেছে। কুলকুল করে ঘাম ঝরছে সারা শরীর বেয়ে। আমার বুদ্ধি বলতে তখন আর কিছু নেই। মূক স্তব্ধ নিশ্চল আমি। কী করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

তখন ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—এগোও! অমনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আলো পড়েছে গুহার চতুর্দিকে। দেখি পায়ের কাছে শোয়া এক বিশালাকৃতি—পাঁঠা। ধুতনিতে মস্ত লম্বা দাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। মুমূর্ষু। হয়তো শোয়াই ছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে প্রাণভয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বারেকের জন্যে, আমি বের হতে ফের শুয়ে পড়েছে।

পা দিয়ে ঠেলা দিলাম, নড়ল না। আমার ইচ্ছে যেভাবে হোক একে বাইরে বের করে দেওয়া। মরতে হলে বাইরে কোথাও গিয়ে মরুক। কিন্তু শক্তি আর নেই শরীরে। তুলবার চেষ্টা করলাম। অন্তত তুলে যদি বাইরে কোথায়ও রেখে আসা যায়। অসম্ভব ভারী। অগত্যা সে চেষ্টা ত্যাগ করতে হলো। থাকুক না এখানে, মন্দ কী! মরব বললেই তো আর কেউ মরে না। সেক্ষেত্রে মরতে এখনো কয়েকটা দিন লাগবে। ইতোমধ্যে আমারই মতো হঠাৎ ঢোকে যদি কোনো নরখাদক এই গুহায় কোনো কিছুর সন্ধানে, আমারই মতো নির্ঘাৎ সে-ও চোখ দেখে ভয় পাবে।

বিস্ময় পর্ব আপাতত খতম, এবার গুহা দেখার পালা। দেখছি তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ছোট্ট পরিসর। বারো ফুটের মতো চওড়া ভিতরটা, তবে আকৃতি যে সবদিকে সমান তা নয়। এবড়ো থেবড়ো ভাব। অবিশ্যি সমতল। শেষ মাথায় এগিয়ে দেখি সরু একটা সুড়ঙ্গ মতো সেই সুড়ঙ্গ ধরেও বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মাথা তুলে হাঁটা অসম্ভব। সুড়ঙ্গ পথে যেতে গেলে হামাগুড়ি দিতে হবে। ভয় কী আমার, হাতে তো রয়েছে জ্বলন্ত মশালরূপী কাঠ। হামাগুড়ি দিয়ে চললাম এগিয়ে। দেখি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তখন ক্ষান্ত হলাম। থাক আজ আর নয়। কাল আবার এসে বাকিটা দেখে যাব। তখন সঙ্গে আনব মোমবাতি। যা কিছু নতুন আবিষ্কার কালকেই হবে।

পরদিন যথারীতি এলাম ছটা মোমবাতি নিয়ে। এ আমার নিজেরই হাতে তৈরি। ছাগলের চর্বি দিয়ে আজকাল আমি ভারি চমৎকার মোমবাতি বানানো রপ্ত করেছি।

একটা পাত্রে রেখে ছটা জ্বালিয়ে দিলাম একসাথে। ঢুকলাম গুহায়। সেই সুড়ঙ্গ। চলেছি হামাগুড়ি দিয়ে। একপা দুপা করে একটানা প্রায় দশগজ। সে যে কী সাহস তখন আমার! ভয়ডর সব তুচ্ছ। দেখি একটু একটু করে মাথার উপরে ছাদটা উঁচু হচ্ছে। আরো খানিকটা এগিয়ে দেখি ছাদটা পুরোপুরি উচু। দাঁড়ানো যায় সোজা হয়ে। আর কি বাহার

সেই গুহার! আলো হাতে ঢোকা মাত্র আলোয় আলোয় দশদিক আলোময়। ছাদ থেকে দেয়াল থেকে চতুর্দিক থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো। সে প্রায় কুড়ি ফুটের মতো চওড়া আর লম্বা একটা অংশ। কাচের মতো ঝিকমিক করছে তাতে অসংখ্য পাথর। জানি না হীরে কি সোনা কিনা। তবে মূল্যবান যেকোনো ধাতু, এটুকু বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

আমি তো আনন্দে আত্মহারা। মূল্যবান ধাতু দেখে নয়, এমন একটা অদ্ভুত গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরে। সব দিক থেকে নিরাপদ। আত্মরক্ষার আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। এতটুকু স্যাঁতসেঁতে কি ভেজা ভাব নেই। মেঝে সমতল। কোনো বিছে বা ঐ জাতীয় বিষধর কোনো প্রাণীও নেই। এরকমই তো একটা জায়গা খুঁজছিলাম আমি মনে প্রাণে। দরকারী জিনিসপত্র এখানে এনে জমা করে রাখতে পারব। যেমন আমার বারুদ এবং প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য শস্য। নিজেও প্রয়োজন বোধে আত্মগোপন করে থাকতে পারব। আসুক না হাজারে হাজারে নরখাদক শয়তান। আমার নাগাল পেলে তো!

শুরু হলো বারুদ এবং শস্য এনে রাখার কাজ। সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় সেই যে বারুদ বোঝাই পিপেটা পেয়েছিলাম সেটা এবার খুললাম। দেখি জল ভিতরে ঢুকেছে, তবে তাতে ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই। চারপাশে খানিকটা বারুদ জল লেগে জমে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে। যেন নারকোলের খোসা। ভিতরের বেশির ভাগটাই ব্যবহারযোগ্য। পরিমাণে প্রায় ষাট পাউন্ড ওজনের তো হবেই। সীসের পাতটাও নিয়ে রাখলাম একধারে। এটা আরো বেশি দরকারী। পিটিয়ে পিটিয়ে আমি ছোট ছোট ছররা বানাই।

এদিকে পাঁঠাটা মরেছে; টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাকে বহু কষ্টে বাইরে। মস্ত একটা গর্ত খুঁড়লাম। সমাধি দিলাম। পচন ধরেছে শরীরে। ইস, সে যা দুর্গন্ধ।

তেইশ বছর হলো এই দ্বীপে। তে-ই-শ-টা বছর। বেশ সুখেই ছিলাম। মাঝখান থেকে হিসেবে সব গোলমাল করে দিল নরখাদকের দল। তাইতো এত ঝঞ্ঝাট। সব সময় একটা ত্রাসের ভাব। মনের গভীরে আতঙ্ক। এটুকু বাদ দিলে আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর পৃথিবীতে কে আছে। পোল্‌কে শিখিয়েছি আরো কত কথা। আমার সঙ্গে দিব্যি এখন কথা বলে। সে আমার পরম সান্ত্বনা। বেশ লাগে শুনতে। জানি না কতদিন আর শুনতে পাব। জীবের জন্ম যেমন আছে মৃত্যুও আছে। কবে মরে যাবে পটাং করে তা কি জানি? তবে ব্রাজিলে, শুনেছি কাকাতুয়া নাকি একশ বছর অব্দি বাঁচে। সেক্ষেত্রে আমিই আগে মরব, ও বেঁচে থাকবে। আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবে দ্বীপে আর ডাকবে : রবিন ক্রুশো, রবিন ক্রুশো, তুমি কোথায়? এদিকে এস ...? নিষ্ফল সে ডাক। শুনবে না তো কেউ। কে মরতে আসবে এই দ্বীপে! বিশেষ করে আমাদের দেশের কেউ! তবে না বুঝবে তার ইংরেজি কথার মানে। আর কেউ শুনে মানে বুঝবে না, ভাববে হয়তো কোনো প্রেত কি পিশাচ—এখানে মরে ভূত হয়েছে, ডেকে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মতো সারাক্ষণ।

কুকুরের সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি দশ বছর আগে। ষোলো বছরের আয়ু। বুড়ো হয়েছিল, স্বাভাবিক কারণেই মারা গেছে। বিড়ালের কথা তো আগেই বলেছি। একের পর এক সে যা বাচ্চা দেবার ধুম! একপালকে তো মেরে ফেলতে বাধ্য হলাম। ভয় পেয়ে পালাল বাকি কটা। আমার সেই গোড়ার দিকের মাদী দুটো দেখি তাও আসে মাঝে মাঝে চোরের মতো। এসে খাবার দাবার সব চুরি করে খেয়ে চলে যায়। শেষে এমন ভয় দেখালাম! তারপর থেকে আর আসে না। মিশেছে জঙ্গলে গিয়ে হয়তো জাতভাইদের সঙ্গে। আমার চোখে কখনো পড়ে না।

দুটো ছাগল ছানা পুষেছি। এটা সাম্প্রতিক ঘটনা। ভারি ভালো লাগে আমার ওদের হাবভাব। গোড়ার দিকে একটু দূরত্ব ছিল। এখন ভেঙে গেছে সে প্রাচীর। আশেপাশেই সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে। হাত থেকে খাবার খায়। এরা বড় হলে ফের আমি দুটো ছানা পুষব।

বলতে ভুলে গেছি আরো দুটো কাকাতুয়া পুষেছি। কথা বলতে তারাও শিখেছে। কিন্তু পোলের মতো নয়। পোল আমার পরম প্রিয়। এদের যে শেখাব মন দিয়ে, আরো উন্নত করব—সে ইচ্ছেও এখন আর নেই।

দুটো মুরগি আছে পোষা। সামদ্রিক মুরগি। একদিন ফাঁদ পেতে ধরে এনেছিলাম। তারপর ডানা দিয়েছি ছেঁটে। দেয়ালের পাশে ঝোপ মতো একটা গাছ—সেখানেই বাসা বেঁধে থাকে। আর সারাদিন ঘুরঘুর করে বেড়ায় আমার জমির সীমানার মধ্যে। বেশ লাগে। আমি মুগ্ধ চোখে ওদের হাবভাব লক্ষ করি।

এবং এই সব নিয়ে এতদিন বেশ সুখেই ছিলাম। সুখে থাকারই যে কথা। মাঝখান থেকে নরখাদকের দল দিল সব তোলপাড় করে। আমার সুখ এখন দুঃখে পরিণত হতে চলেছে।

কী জানি, সভ্য সমাজে তো থাকি না, হয়তো সেখানকার নিয়ম-কানুন একটু অন্যরকম। তবে আমার মনে হয় সুখ আর দুঃখের ব্যাপারে চির সত্য এই একটিই। জীবনের নিয়মটাই এই মাপের। সুখ থাকবে, স্থায়ী হবে, তাকে ছাপিয়ে আসবে দুঃখ। চাকার মতো এর আবর্তন। এটা আমার জীবনে যেমন, সভ্য সমাজেও হয়তো তেমনই। দুয়ের বিশেষ একটা ফারাক নেই।

ঘটনার বিবরণীতে আবার ফিরে আসি।

এটা ডিসেম্বর। তেইশ বছর এই ক দিন আগে পূর্ণ হলো। এখন সূর্যের দক্ষিণায়ন। হিম হিম ভাব। তাকে শীত বলা চলে না। এখন চাষের সময়। মাঠে আমাকে কাজ করতে যেতেই হয়। একদিন ভোর সকালে উঠে গেছি মাঠে। দেখি দূরে কূলের কাছে জ্বলছে আগুন, গলগলিয়ে উঠছে ধোঁয়া। আমি যেখানে সেখানে থেকে মোটে মাইল দুই তফাৎ। আমি তো থ। একপাল নরখাদককে এই এতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত কাছে! এ দিকটায় তো ওরা আসে না। কিন্তু আজ যে এল!

খুব ভয় পেয়ে গেছি। ঝোপের আড়ালে আমার তো হাত পা বলতে গেলে স্থবির। নড়াচড়া করারও যেন ক্ষমতা নেই। পারছি না আড়াল থেকে বের হতে কি অন্য কোথাও যেতে। মহা মুশকিল। দু মাইল তো মোটে দূর—যদি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে কোনো কারণে চলে আসে এদিকে! আমার ক্ষেতখামার দেখতে পায়! তবে তো চিত্তির! ক্ষেত আছে মানুষ নেই তা কি হয়! নির্ঘাৎ ধরে নেবে ওরা আমার অস্তিত্বের কথা। তখন তল্লাসী চালাবে। ধরে ফেলবে আমাকে। তারপর আর কী—বন্দি এবং হত্যা!

মরিয়ার মতো তখন মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে পিছু হটতে হটতে দেয়ালের কাছ বরাবর গিয়ে মইটাকে আঁকড়ে ধরলাম। উঠলাম বেয়ে একলাফে। মই তুলে ভিতর দিকে বসিয়ে নামলাম। সরিয়ে নিলাম মই। ব্যস, আপাতত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু পুরোপুরি তো নয়। আক্রমণ ওরা যেকোনো মুহূর্তে করতে পারে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমাকে চটপট করে ফেলতে হবে। বন্দুকগুলো তাই গিয়ে নামিয়ে আনলাম। আর পিস্তল সাজালাম দেয়ালের উপর পাশাপাশি তলোয়ার রাখলাম হাতের গোড়ায়। আসুক দেখি, কার ক্ষমতা আছে আমার সঙ্গে যুঝুক!

হামাগুড়ি দিয়ে চললাম এগিয়ে

বসে আছি সেই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দেখি কেউ আর আসে না। দেয়ালের এপাশে তো আমি—কিছু যে দেখব দূরে সে সুযোগ নেই। তখন মই বেয়ে গুটি গুটি উঠে উঁকি দিলাম। চটপট শুয়ে পড়লাম দেয়ালের উপর সটান। চোখে লাগালাম দুরবিন। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার। সংখ্যায় মোট ওরা নয় জন। উদোম ন্যাংটা। বসে আছে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে। আগুন পোয়াচ্ছে কি? কেন পোয়াবে? শীত তো নেই, উল্টো গরমই বলা যায়। অর্থাৎ শিকারের হাড় মাংস এখন আলাদা করা হচ্ছে। যাকে বলে কাটাকুটি। তাই চুপচাপ। আগুনে পুড়িয়ে যখন খাবে, তখন হয়তো উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠবে।

সঙ্গে দুটো শাম্পান। টেনে তুলে নিয়েছে ডাঙ্গায়। জোয়ার তখন। তাই হয়তো এই কায়দা। হয়তো অপেক্ষায় আছে কখন ভাটা পড়বে। তখন ফিরে যাবে।

আমার কি আর নড়া-চড়ার অবকাশ আছে। ঠায় দুরবিন লাগিয়ে শুয়ে আছি একভাবে। আর মনে একের পর এক দুশ্চিন্তা। যদি হুট করে চলে আসে এদিকে! যদি আমার আস্তানা দেখতে পায়! যদি বন্দি করে। নয় এ যাত্রা এল না, যদি আমার অজ্ঞাতসারে পরের যাত্রায় এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়! মোটমাট ভয়ে আতঙ্কে আমি বলতে গেলে সিঁটিয়ে গেছি।

আরো অনেকক্ষণ পরে ভাটা পড়তে উঠল তারা, শাম্পান টেনে জলে নামাল। ফিরে গেল বাইতে বাইতে। যাত্রা শুরুর আগে ঘণ্টা খানেক ধরে আগুন ঘিরে সে কী নাচের ঘটা। কত রকম তার অঙ্গভঙ্গি। দুরবিনে যতটা ধরা পড়ল আমার মনে ত্রাস সঞ্চার করতে তাই যথেষ্ট। সবাই উদোম। তবে সবাই পুরুষ না তার মধ্যে কোনো নারী আছে—সেটা আমি এত দূর থেকে বুঝতে পারলাম না।

অমনি বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম চটপট। সঙ্গে দুটো পিস্তল আর সেই তলোয়ার। উঠলাম পাহাড়ের মাথায়। সে প্রায় দু ঘণ্টা একনাগাড়ে হাঁটা। ভিতরে ভিতরে ভীষণ

উত্তেজিত আমি। এধার থেকে আরো তিনটে শাম্পান ভেসেছে জলে। মোট পাঁচ। চলেছে সবাই অসীম বেগে কূলের দিকে।

ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। আতঙ্কে ত্রাসে ভয়ে আমি তো বলতে গেলে মূক। হতবিহ্বল অবস্থা আমার। হাঁটতে হাঁটতে তখন কূলের দিকে গেলাম। হাড়ে মাংসে রক্তে সে একেবারে ছড়াছড়ি অবস্থা। কী যে নিষ্করুণ নিষ্ঠুর সেই দৃশ্য। বমি পাচ্ছে আমার। সারা পেট তোলপাড় করে গলার কাছে এসে দলা হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। গুড়গুড় করে বেরিয়ে এল অনেকখানি। তখন একটু নিশ্চিন্ত লাগল।

মোটমাট দ্বীপে যে ওরা প্রায় আসে এটা ঘটনা। যেকোনো অংশে আসে। আমার অজ্ঞাতসারে। এতদিন দেখি নি নিজের চোখে তাই ভাবতাম শুধু পশ্চিম দিকেই আসে। এটা ওদের নিষ্ঠুর লালসা চরিতার্থ করার জায়গা। আমারো জীবন এবার থেকে ওদের হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ শান্তি আমার সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত।

এবং এ অবস্থায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অবিবেচনার কাজও বটে। ঘুরেফিরে আবার সেই পুরানো চিন্তাটা মাথায় উদয় হচ্ছে। খুন করতে হবে এবার, খুন। নিষ্ঠুরতার বদলা খুন করেই নিতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে কখন কোন মুহূর্তে আমার উপর তা তো জানি না। প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি আসে দু দল—এক এক দলে থাকে দশ জন কি এক ডজন করে নরখাদক—আমি ছাড়ব না তাদের। অন্তত একদলকে ঘায়েল করব। বাকিরা তখন যাবে পালিয়ে। ফের কখনো না কখনো আসবে। তখন মারব তাদের। তারপর ফের আরেকদল। তারাও পার পাবে না আমার হাত থেকে। এইভাবে একের পর এক ধ্বংসলীলায় আমি মেতে উঠব। অর্থাৎ আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত। কৌশলগত ভাবেও। ভারি উদ্বেগ আমার মনে। তবু বাঁচতে হবে এটা বড় কথা। আত্মরক্ষা করতে হবে। তাতে যদি একের পর এক খুনের রক্তে আমাকে হাত রাঙাতে হয়, তাও সই। মোটকথা ধরা আমি কিছুতেই সহজে দেব না। বের হব না তেমন। আমার সৌভাগ্য সময় সুযোগ বুঝে এক পাল ছাগল পুষেছিলাম। এই অসময়ে তারা যোগাবে আমার খাদ্য। কতদিন যে তাদের উপর নির্ভর করে চলাতে হবে তা তো জানি না। আগুন একবার জ্বাললে নিভতে সময় লাগে। এক দলকে মারলে বাকি যে দল ফিরে যাবে তারা হয়তো পরের বার নিয়ে আসবে দুশ' নৌকো বোঝাই নরখাদক যোদ্ধা। তখন কি আর যুদ্ধ আমি এড়াতে পারব।

এই ভাবেই কাটল আরো পনেরোটা মাস। উদ্বেগই সার, কাউকে আর একটি দিনের তরেও দ্বীপের ত্রিসীমানায় দেখতে পেলাম না। তারপর মে মাস সেটা। হঠাৎ দেখি একদিন ... কিন্তু থাক। সে কথা মুহূর্তে নয়। তার আগে আমার মনের অবস্থাটা একটু বিশদ করে ব্যক্ত করি।

এই পনেরোটা মাস বলতে গেলে একটি দিনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি নি। সে যে কী অস্বস্তি! চোখ বুঝলেই চোখের পাতায় ভেসে ওঠে যুদ্ধের দৃশ্য। হয়তো ঝিম এসেছে একটু অমনি দেখতে লাগলাম নানান স্বপ্ন। প্রতিটির মাঝেই হত্যা আর হত্যা। একের পর এক আমি বর্বর হত্যাভিযানে মেতে উঠেছি। আর কী রক্ত! তখন ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। ব্যস, ঘুমেরও অমনি ছুটি। সারা রাত আমাকে জেগেই কাটাতে হয়।

এরই মধ্যে একদিন ঘটল একটা অন্যরকম ঘটনা।

ষোলোই মে। সকাল থেকে ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি। বিশ্রী আবহাওয়া বলতে যা বোঝায়। সারা দিনে আমি আর গুহা ছেড়ে বের হই নি। দেখতে দেখতে চোখের সামনে

সন্ধ্যা হলো রাত ঘনাল। আমি প্রতিদিনকার প্রথা মতো বাইবেল খুলে রেখেছি বাতির সামনে। হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ। মেঘ ডাকা নয় এ আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এখানে কে করবে আমি ছাড়া বন্দুকের আওয়াজ!

অবাক হয়েছি নানান ভাবে নানান কারণে এই দ্বীপে আসা ইস্তক। কিন্তু এভাবে অবাক কখনো হই নি। বিচিত্র কাণ্ড তো! কে আবার এল এই বিজন বিভূঁয়ে? নাকি সমুদ্রের বুকেই আওয়াজটা হলো। দশদিক নির্জন বলে বাজল এসে আমার কানে?

তড়িঘড়ি মই বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম। ঘাবড়ে গেছি ভীষণ—নয়তো উঠতে গিয়ে দু-দুবার এমন পিছলে পড়ব কেন? তা হাকড়-পাকড় করে ছুটতে ছুটতে উঠলাম তো গিয়ে মাথায়। ওঠা মাত্র আরেকটা আওয়াজ আর সঙ্গে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো রোশনাই। তখন শব্দের উৎপত্তি কোথায় সেটা আন্দাজ করা গেল। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে এবং জাহাজ থেকে। হয়তো পড়েছে ঝড়ের মুখে মহা বিপদে, বন্দুক ছুড়ে নিজেদের অবস্থার কথা জানান দিচ্ছে। এটা প্রথা আমি জানি। কিন্তু কী করতে পারি? সাহায্য করার কি কোনো সাজ-সরঞ্জাম আমার আছে? তবে একটা কথা—আমি সাহায্য করতে না পারলেও ওরা হয়তো পারে আমাকে সাহায্য করতে। অবশ্যই নিজেরা যদি নিরাপদে থাকে। সেক্ষেত্রে আমার অস্তিত্ব ওদের জানানো উচিত। তাই তড়িঘড়ি কাঠকুঠো সংগ্রহ করে সেই পাহাড়ের মাথাতেই জ্বালালাম এক মস্ত আগুন। ভেজাকাঠ, সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলই বলা চলে। গলগলিয়ে উঠতে লাগল ধোঁয়া। আমি জানি, আগুন নজরে না পড়ুক, ধোঁয়া বহুদূর থেকে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে জাহাজ যদি সত্যি সত্যি আশে পাশে কোথাও থেকে থাকে, তবে ধোঁয়া ঠিকই ওদের নজরে পড়বে। তখন আরো একবার বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এল। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আরো কাঠকুঠো জড় করে আগুনে ফেললাম। কিন্তু সেই শেষ। তারপর থেকে সারারাত বলতে গেলে কাটল সেই পাহাড়ের মাথায় নির্ঘুম—জাহাজের টিকিরও দেখা মিলল না।

বসে রইলাম ঠায়।

ভোর হতে দেখি ঝলমলে রোদ। নীল নির্মেঘ আকাশ। কুয়াশার লেশমাত্র কোথাও নেই। তখন চারদিকে নজর ঘোরাতে গিয়ে দেখি—ওমা, ঐ যে কী একটা যেন কূলের কাছে ভাসছে! দুরবিন তুললাম চোখের গোড়ায়। কী যে ওটা কিছুতেই মালুম হয় না। পালও হতে পারে আবার অন্য কিছুও হতে পারে। তবে একটা ব্যাপার অনুমান করতে পারছি—জাহাজই হোক আর নৌকোই হোক—হয়তো নোঙর করে আছে ধারে কাছে কোথাও। দুরবিন চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি অংশ দেখতে শুরু করলাম। দেখি জলের নিচে সেই যে ডুব পাহাড়—সেখানে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে আছে একটা জাহাজ। তার প্রায় ভগ্নদশা। তোলপাড় হয়ে গেছে তার সারা শরীর। আহারে বেচারিরা! কোথায় ভাবছিলাম আমার হবে সাহায্য, এখন দেখি সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার।

হয়তো এমন হতে পারে—আমার আগুনের ধোঁয়া ওরা দেখতে পেয়েছে। অমনি তড়িঘড়ি বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে বলে জাহাজের নৌকোয় চেপে আসছিল এই দ্বীপের দিকে পথে বাতাসের তাড়নায় নৌকো সমুদ্রে উল্টে যায়। কিংবা এমনও হতে পারে—হয়তো উল্টায় নি, ওরা গিয়ে ভিড়েছে সেই নরখাদকের দেশে। ইতোমধ্যে সবাইকে বন্দি করে পিশাচের দল বোধহয় মারণোল্লাসে মেতে উঠেছে।

আরো একটা সম্ভাবনা আছে। হয়তো এ জাহাজটা বিপদে পড়েছে, কিন্তু সঙ্গী ছিল আর একটা জাহাজ। তাদের কিছু হয় নি। বিপদ থেকে তারাই হয়তো নাবিকদল সহ জাহাজের অন্যান্য সকলকে উদ্ধার করেছে। এতক্ষণে নিরাপদ কোনো দূরত্বে পৌঁছে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার নিজেকে উদ্ধার করার সম্ভাবনা দূর অস্ত।

গেলাম হাঁটতে হাঁটতে ডুবো পাহাড়ের দিকে। কূলের কাছ বরাবর হতে দেখি একটি মৃতদেহ। বয়েস কম। পরনে নীল রঙের সুতির জামা আর পাৎলুন। পায়ে জুতো মোজা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বালিতে মুখ গুঁজে। জামার পকেটে তামাক খাওয়ার একটা পাইপ, কিছু টাকা আর কিছু খুচরা পয়সা। এ থেকে কি আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়!

প্রথম দর্শনেই মনটা দুঃখে ভরে উঠল। তবে হয়তো আমার অনুমান ঠিক নয়। হয়তো বাঁচে নি কেউ জাহাজের। আমাদেরই মতো অবস্থা। জাহাজের কাছে গিয়ে যে দেখব সে সুযোগও নেই। সেই ভীষণ স্রোত আর অতি বিপজ্জনক সে অঞ্চল। বরং এই ফাঁকে ডোঙাটা ব্যবহার করি। উদ্ধার করা যদি সম্ভব হয় কাউকে করব। নয়তো যা পাই জাহাজ থেকে দরকারী জিনিস—নিয়ে আসব।

অমনি ফিরে গেলাম গুহায়। যাত্রার আয়োজন করতে হবে। নিলাম রুটি, এক কলসি পানীয় জল, কম্পাস, এক বোতল মদ, এক ঝুরি কিসমিস—ব্যস, আর কিছু নেবার দরকার নেই। ডোঙাটা অর্ধেক ডুবিয়ে রেখেছিলাম নিরাপত্তার প্রয়োজনে জলের নিচে। জল থেকে তুলে ছেঁকে ফেলতে ভেসে উঠল ফের জলের উপর। মুছে নিলাম। মালপত্র রাখলাম জড় করে। কী মনে হতে চালও নিলাম খানিকটা। ছাতি আর বন্দুক তো আছেই। আমার নিত্য সহচর। মোটমাট সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত। এবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে রওনা দিলেই হয়।

ভাসল ডোঙা জলে। কূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলে এলাম ডুবোপাহাড়ের কাছ বরাবর। এবার যেতে হবে জাহাজের কাছে। কিন্তু ভয় খুব। সেই বিপজ্জনক স্রোত। যদি ফের ভেসে যাই মাঝ দরিয়ায়। আগের সেই অবস্থার কথা স্মরণ করে বুকে ইতোমধ্যেই হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে। স্রোত তো বরং ভালো, যদি ওঠে ঝড়ো বাতাস! তবে কি আর পারব আগের বারের মতো ফিরে আসতে!

ছোট একটা খাঁড়িতে ডোঙা ঢুকিয়ে ভাবতে বসলাম। এখন শুধু প্রতীক্ষা। যে ভাবে স্রোত বইছে হু হু বেগে, তাতে স্রোত ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। এখন আবার জোয়ারের সময়, বাড়ছে জল। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। উপায় বের করতে হবেই। কিন্তু কী সেই উপায়?

তখন নামলাম। হাঁটতে হাঁটতে ডুবো পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেলাম শেষ মাথায়। দেখি স্রোত আসলে দ্বিমুখী। উত্তর থেকে আসছে জোয়ারের জল আর দক্ষিণ থেকে স্রোত। অর্থাৎ যদি আমি দক্ষিণের স্রোতে ভেসে যাই জাহাজের দিকে, ফিরে আসার সময় উত্তরের স্রোত আমাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু আজ আর নয়। বেলা প্রায় শেষ। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠলাম পরদিন ভোর সকালে। স্রোত এসময় তেমন তীব্র হয় না। ভেসে পড়লাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কসরৎ করতে হলো খানিকটা। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম জাহাজের কাছে।

কূলের কাছ বরাবর হতে দেখি একটা মৃতদেহ

সে যা অবস্থা জাহাজের! স্পেনের জাহাজ—নির্মাণ কৌশল দেখলেই সেটা অনুমান করা যায়। গোঁত্তা খেয়ে এসে পড়েছে পাহাড়ের একটা ফাটলের মাঝখানে, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে সামনের দিকটা। সে যেন লণ্ডভণ্ড ভাব। মাস্তুল নেই, হাল ভাঙা, পাটাতন পুরোপুরি জলমগ্ন—মানুষের গন্ধ পেয়েই হোক বা অন্য যেকোনো কারণে হোক, একটা কুকুর দেখি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। আমাকে দেখে সে কী হাঁকডাক! একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। আহারে বেচারা! কতদিন যে আছে অনাহারে! আমার ডোঙায় এসে উঠল। দিলাম কটা রুটি। চোখের নিমেষে শেষ। জল দিলাম এক পাত্র, খেল গপগপ করে। যেন কুকুর নয়, একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে। সেই রকমই ভাব। ওকে ডোঙায় সেই অবস্থায় রেখে আমি জাহাজে এসে উঠলাম।

জীবনের সাড়া শব্দ নেই। জল ঠেলতে ঠেলতে চলছি এগিয়ে। দেখি রান্নাঘরের সামনে দুটি মৃতদেহ। ফুলে গেছে, দু'জনের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। এরা পাচক। হয়তো জল ঢুকছে দেখে দু'জনে দিশা ঠিক করতে না পেরে বেঁধে ফেলেছিল হাত, হয়তো বন্ধু ছিল দু'জন, একসাথে মরবে সংকল্প করেছিল। একসাথেই মরেছে। এগিয়ে গেলাম। মস্ত একটা পেটি, তাতে থরে থরে মদের বোতল। ভীষণ ভারী। কটা প্যাঁটারাও নজরে পড়ল। নাবিকদের জিনিসপত্র রাখার বাক্স। দুটো দেখলাম মোটের উপর হালকা। তুলে এনে রাখলাম ডাঙ্গায়।

মনটা ভারি খারাপ লাগছে। পারলাম না এতটুকু সাহায্য করতে। বিপদে পড়েছিল এরা। পেল না ত্রাণ। আর যা ভগ্নদশা জাহাজের! সেটাও আমার মন খারাপের অন্যতম কারণ। সামনের দিকটা ঐভাবে না ভেঙে যদি অন্য কোনো রকম জখম হতো—যদি ভাঙত মাস্তুল কি হাল কিংবা পাটাতন—একবার নয় জোড়াতালি দিয়ে চেষ্টা করতাম ভেসে পড়ার। জাহাজে আসার সেটাও একটা প্রধান কারণ। চাই যে আমি এখান থেকে এবার সরে পড়তে। এটা আমার ঐকান্তিক বাসনা। যত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। নরখাদকের হাতে প্রাণ দেবার চাইতে তো ভালো। ভেসে পড়তাম সাগরে। যেখানে খুশি নিয়ে যাক হাওয়া, স্রোত তোলপাড় করুক, চাই কি ডুবে যাই অতলান্ত জলে—আমার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। আর ভালো লাগছে না এই এককী জীবন। আমি এবার মুক্তি চাই।

একটা ছোট পেটি পেলাম মদের বোতলের। সেটা নিলাম। কটা বন্দুকও রয়েছে একটা ঘরে। নিলাম বন্দুক। শুকনো বারুদ রয়েছে যৎসামান্য—চার পাউন্ড মাত্র ওজন। নিলাম। একটা বেলচা পেলাম, আর একটা চিমটে। দুটো পেতলের কেতলিও রয়েছে, ফেলে রেখে লাভ কী। জল গরম করতে বা দুধ জ্বাল দিতে আমার তো কেতলির খুব দরকার। নিলাম। আর দেখি চকোলেট বানাবার তামার একটা ডেকচি মতো। সেটাও সঙ্গে নিলাম।

মোটমাট সব মিলিয়ে এই। আর কুকুর। তার কথাতো আগেই বলেছ। আর নেবার মতো কিছু নেই জাহাজে। সন্ধ্যের ঘোর লেগেছে তখন। স্রোতের টানও কম। ভাসিয়ে দিলাম ডোঙা। দ্বীপে ফিরে এলাম যখন, প্রায় মাঝরাত। আর ভারি ক্লান্ত আমি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

সে রাতে আর গেলাম না গুহায়। ডোঙাতেই থাকব। মালপত্র পুরানো গুহাতে নিয়ে যাব না। এটা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। নতুন আবিষ্কার করেছি সেই যে অদ্ভুত গুহা—রাখব সব সেখানে ডাঁই করে। এগুলো আমার অভাবের দিনের সঞ্চয়। শুধু একটা কেটলি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর প্যাঁটরায় যদি কিছু পোশাক থাকে তার দু একটা। সেই মন নিয়েই পরদিন ভোরে ডোঙা নিয়ে এলাম নতুন গুহার কাছে। মাল তুললাম। দেখে মনে হয় না পানীয় হিসেবে খুব একটা ভালো। তবু মদ তো। সময়ে যথেষ্ট কাজ দেয়। দেখি ছোট্ট একটা কাগজের প্যাকেট, তাতে বোতলে বোতলে ভরা খনিজ জল। ভীষণ উপকারী। এতে নানান অসুখ সারে। আর একটা মোড়কে কিছু মেঠাই। এত সুন্দর করে বাঁধা যে ভিতরে এক ফোঁটা জল ঢুকতে পারে নি। খেলাম দুটো। আহ কী অপূর্ব যে খেতে!

আরো কটা মোড়ক আছে, কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয়। জল ঢুকেছে ভিতরে। ফেলে দিলাম। বেশ কয়েকটা জামাও আছে আর বিস্তর রুমাল। দুটোই আমার কাছে লোভনীয়। গরমের দিনে এমন ঘাম হয় চোখে মুখে, ন্যাকড়ার অভাবে পারি না মুছতে। এখন থেকে রুমাল ব্যবহার করব। আর পাঠক তো জানেনই, জামা পরার পাট আমার কবে চুকে গেছে। ছাগলের চামড়াই এখন আমার একমাত্র পরিধেয়। সুতরাং জামায় যে লোভ পড়বে এতে আর আশ্চর্য কি। দেখি উপরের দিকে একটা গোপন খোপ। তাতে বিস্তর নোট—প্রায় এগারো 'শর মতো আর ছটা সোনার গিনি, সোনার পাতও আছে সামান্য। সব মিলে ওজন প্রায় এক পাউন্ডের মতো!

দ্বিতীয় প্যাঁটরাতে বেশির ভাগই পোশাক আশাক। তবে খুব একটা দামী নয়। আর দেখি কিছু বারুদ। দুটো মোট প্যাকেট। এটা নির্ঘাৎ কোনো শিকারির বাক্স। এবারকার অভিযানে প্রাপ্য বলতে এই। আমার প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। আপনারা হয়তো প্রসঙ্গক্রমে সোনা বা অর্থের কথা বলবেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি সোনা আর আমার পায়ের নিচের ধুলোর মধ্যে আমি কোনো তফাৎ দেখতে পাই না। কি লাভ আমার সোনা দিয়ে! আমি কি গয়না গাঁটি গড়াব না বিক্রী করে রাজা বাদশার মতো ধনী হব? কার কাছে করব বিক্রী? তবে হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—জুতো পেয়েছি মোট চার জোড়া। এটা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যপার। দু জোড়া পেয়েছি দ্বিতীয় প্যাঁটরায়, আর দু জোড়া খুলে নিয়েছি সেই হাত বাঁধা দুই মৃতের পা থেকে। আমার খুব কাজে লাগবে। খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের যা দুরবস্থা। তবে এই যা জুতা—খুব একটা টেকসই হবে বলে মনে হয় না। রবারের তৈরি। তবু যাহোক, কিছুদিন তো পায়ের একটু আরাম হবে।

তাই বলে টাকা বা সোনা কিন্তু ফেললাম না বা অবহেলা ভরে যত্রতত্র রেখে দিলাম না। নিয়ে গেলাম সাথে করে আমি যে গুহায় থাকি সেখানে, আগেকার জাহাজ থেকে আনা টাকাকড়ি যেখানে মজুত রেখেছিলাম তারই সাথে রেখে দিলাম গোছ করে। তা সব মিলিয়ে নেহাৎ কম নয়। কাজে লাগতে পারে হয়তো কখনো। যদি ইংল্যান্ডে যাবার সুযোগ পাই, অর্থাৎ যদি পারি কোনোক্রমে কোনো জাহাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে, তবে পারানির কড়ি হিসেবেও তো কিছু দিতে লাগবে।

অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশেষ করে ছেলে ছোকড়াদের—যাদের কম বয়েস, যাদের রক্ত চঞ্চল—দেখুন, ভাই, আপনারা অসহিষ্ণু হবেন না। ঈশ্বরের দেওয়া যে দান তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করুন। তবে শান্তি পাবেন। আখেরে মেওয়া ফলবে।

এবার ঘটনায় ফিরে আসি।

মার্চ মাস সেটা। আমার দ্বীপে অবস্থানের চব্বিশ বছর। আস্তানা থেকে বিশেষ একটা বের হই না। দরকার পড়ে না তাই। মোটামুটি শরীরের দিক থেকে সুস্থই আছি। খাওয়া ঘুম বিশ্রাম কোনো কিছুরই অভাব নেই। উদ্ভট চিন্তাও আছে মাথায় প্রচুর। রাত হয়েছে। ঘুমোব বলে শুয়েছি এসে বিছানায়। সেদিন অদ্ভুত কাণ্ড—ঘুম আর কিছুতেই আসে না।

একের পর এক চিন্তায় তোলপাড় হচ্ছে মন। জানি না কেন—মনে পড়ছে নিজের জীবনের পুরানো দিনের কথা। সেই আমার ছেলেবেলা, বাবার উপদেশ অগ্রাহ্য করে ভেসে পড়া, তারপর দুর্ভোগ, ফের অভিযান—ছবির মতো একটার পর একটা ভেসে উঠছে আমার মনের পর্দায়। দ্বীপে আসা ইস্তক প্রতিটি খুটিনাটি ঘটনাও মনে পড়ছে। বেশ তো চলছিল জীবন প্রবাহ—হঠাৎ যে কেন চোখে পড়ল পায়ের ছাপ! সেই থেকে তো গোটা ছবিটাই পাল্টে গেল। তবে না নরখাদক সম্বন্ধে ধারণা জন্মাল। আগেও হয়তো এসেছে অনেকবার, আমার চোখে পড়ে নি বা কোনো নজিরও দেখতে পাই নি। হয়তো দীর্ঘকাল ধরে আসা যাওয়া চলছে। হিংস্র নিষ্ঠুর লালসা চরিতার্থ করার এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় আছে। হয়তো কখনো শয়ে শয়ে এসেছে দল বেঁধে। আমার অজ্ঞাতসারে। এলেই বা কী আসে যায়। আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করলেই হলো! আমি তো আর উপযাচক হয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না। তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। কী দরকার বাপু খাল কেটে কুমির ডেকে আনার!

প্রায় দুঘণ্টা ধরে চলল সমানে এইসব তালগোল চিন্তা। মাথা গরম হয়ে গেছে তখন আমার। সারা শরীরে রক্ত যেন উঠে এসেছে মাথায়। খুব ক্লান্ত লাগছে। ভাবনা চিন্তাতেও ক্লান্তি আসে না কি? বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ভাব তখন আমার। চোখের পাতা আপনা আপনি বুজে এল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। স্বপ্ন দেখলাম। যেন বেরিয়েছি আমি রোজকার নিয়ম মতো বন্দুক কাঁধে সকালবেলা। হঠাৎ কূলের দিকে দৃষ্টি যেতে দেখি দু দুটো নৌকা। এগারো জন মোট তাতে। নামল তারা। সঙ্গে এক বন্দি। সে-ও তাদেরই মতো একজন। তাকে এনেছে খাবে বলে। তাকেও নৌকা থেকে নামানো হলো কূলে। মুহূর্তে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে যা তাজ্জব ব্যাপার! বন্দি তো পড়ি কি মরি করে লাগিয়েছে বাঁই বাঁই ছুট। আসছে আমারই আস্তানার দিকে। এসে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি তো সবই দেখতে পাচ্ছি। তখন বের হলাম আমার গোপন জায়গা থেকে। দেখা দিলাম। হাসলাম মুচকি মুচকি। তখন আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, হাত জোড় করে আমাকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করল তার জীবন রক্ষা করতে। আমি তখন ইশারায় মইটা দেখিয়ে দিলাম। উঠে এল তরতরিয়ে। ব্যস তারপর আর কি, সে থেকে সে আমারই সাথে আমার অনুগত সহচরের মতো। আমার আনন্দ আর দেখে কে।

আর আমার কীসের চিন্তা। খুঁজছিলাম বহুদিন ধরে এরকমই একজন সহচর। এরই সাহায্যে এবার এখান থেকে পালাব। মুক্তি পাব। মুক্তির আনন্দে সে এমনই টালমাটাল অবস্থা যে এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি বিছানায় শোয়া। ঘামছি দরদর করে। কোথায় আমার সেই সহচর! তখন দুঃখে হতাশায় সে যা মনের অবস্থা আমার!

সে যাই হোক চেতনে হোক বা অবচেতনে হোক, ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক শিক্ষা লাভ হলো। এখান থেকে পালাবার জন্যে যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, সেটা আমার একলার চেষ্টায় সম্ভব হবে না। আর একটা লোক অন্তত চাই। বিশেষত বর্বর সম্প্রদায়ের। সমুদ্রের হালচাল আমার চেয়ে ওরা ঢের ঢের ভালো বোঝে। জায়গাটাও পরিচিত। কিন্তু সে না হয় পরের কথা। আগে লোকটাকে জোটাই কী করে?

ভেবে দেখলাম, একটি মাত্র উপায় আছে এবং এক্ষেত্রে নরখাদকের দল আমার ভরসা। ওরা দ্বীপে আসবে বন্দি নিয়ে। সেই সুযোগে আমি ওদের সব কটাকে মারব। শুধু বন্দিকে রাখব অক্ষত। সেই হবে আমার সহচর। কিন্তু ভাবনা যত সোজা কাজটা কি তত সোজা? যদি একচুল হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। তাছাড়া ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নটাও আছে। আমি যে ওদের মারব, ওরা তো আমার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করে নি। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের নির্দেশের বাইরে হবে সেই কাজ। হোক, তবুও মারব। এছাড়া আমার আর উপায় নেই। একটু ঘুরিয়ে চিন্তা করলে এও তো প্রয়োজনে হত্যা। আমার পালানোর দরকার তাই প্রাণ হরণ। তাতে পাপ কোথায়। বরং আমি যে একজন মৃত্যু পথযাত্রী বন্দিকে রক্ষা করছি সেটা তো আমার অশেষ পুণ্য। পুণ্যের ভাগটাই এক্ষেত্রে বেশি। সুতরাং এই নিয়ে আর দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোটামুটি মনস্থির করার পর কৌশলের প্রশ্নটা মাথায় এল। অর্থাৎ কী কৌশলে আমি ওদের হত্যা করব। বিস্তর ভেবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম যে এই মুহূর্তে সেটা ভাববার চেষ্টাও বৃথা। কেননা কখন কী অবস্থায় থাকবে ওরা সেটা তো আগে থেকে আমার জানা নেই। তাই আগে ভাগে কোনো ফন্দি বার করবারও কোনো অর্থ হয় না। বরং আসুক আগে, তখন নয় হিসেব নিকেশ করে দেখা যাবে কোন উপায়টা কার্যকরী এবং সেই মতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করব।

ডোঙা নিয়ে ফিরে এলাম সেই গোপন বন্দরে। অর্থাৎ পাহাড়ের সেই খাঁজ। লুকিয়ে ফেললাম আগের মতো। অর্ধেক জল বোঝাই অবস্থায় ডুবে রইল জলের মধ্যে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তারপর ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। দেখি সব রয়েছে আগের মতো। হাত দেয় নি কেউ বা ফেলে নি কি ছড়ায় নি। সেটা সুখের কথা। অর্থাৎ আমার আস্তানা কোনো ভিন মানুষের চোখে ধরা পড়ে নি। এদিকে মনটাও বেশ প্রফুল্ল। তবু যাহোক নতুন একজন সাথী তো পেয়েছি—সেই কুকুর। পাহারাদারীর কাজটা ওর মাধ্যমেও চলবে। বিশেষ করে নরখাদকের দল কাছাকাছি এলে হাঁকডাক করে জানান দেবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত বলা যায়।

কেটে গেল এইভাবে আরো দুটি বছর। আর এই দু বছরে কত যে পরিকল্পনা আমার! মাথাটাই যে গোলমেলে। সুযোগ পেলেই এটা ওটা ভাবতে শুরু করে। অন্তত শ' খানেক মতলব এল এই দ্বীপ থেকে পালাবার। শ' খানেকই বাতিল হলো। একবার ভাবলাম, লেগে পড়ি ঐ ভাঙা জাহাজ সারাবার কাজে। যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি অব্দি হলাম। শেষে নিরর্থক প্রচেষ্টা এই ভেবে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

বলতে পারেন এ আমার স্বভাবের অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য। কিছুতে পারি না সুস্থির হয়ে নিজের অবস্থার মধ্যে তন্ময় থাকতে। ছোটবেলা থেকে উড়ু উড়ু যে মন। তাই না জীবনে কত কষ্ট পেলাম। শুনতাম যদি বাবার আদেশ! বা ব্রাজিলে যদি সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে নিজের ক্ষেত খামার নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকবার চেষ্টা করতাম! কত টাকার মালিক হতাম এত দিনে, কত সম্মান কত যশ। সব গেল তছনছ হয়ে। আবার এই যে এখানে রয়েছি মোটের উপর সুস্থ ভাবে, এটাও আজকাল আর ভালো লাগে না। কেবল উড়ু উড়ু করে মন। তাই না যত অশান্তি!

শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা। হায়রে, কী আমার ভাগ্যের পরিহাস—দেড়টা বছর পার হতে চলল, বারেকের জন্যেও পাই না ওদের দেখা। গেল কোথায় সব! না কি মানুষের মাংস খাওয়া বন্ধ করে সন্ন্যাসী হলো। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। ঘুঁটি সাজিয়ে আমি এদিকে তৈরি, অথচ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের এখনো দেখা নেই।

তাই বলে দমি নি কিন্তু এতটুকু। আগ্রহে আমার এতটুকু ভাটা পড়ে নি। রোজ নিয়ম করে পাহাড়ের মাথায় উঠে চারদিকে নজর বোলাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি আশপাশ। আর রোজই আশা করি, আজ তো আর এল না, কাল আসবে। কিন্তু সেই কাল আর আসে না।

এমনি ভাবেই টানা দেড় বছর। মাসের হিসেবে আঠারোটা মাস। হতাশার বীজ একটু একটু করে মনে জন্ম নিচ্ছে। সেই মন নিয়েই উঠেছি একদিন ভোরবেলা। রোজকার অভ্যেস মতো কূলের দিকে তাকিয়েছি। দেখি, অবাক কাণ্ড; একটা নয় দুটো নয়, একসাথে একবারে পাঁচ পাঁচখানা নৌকো। আর প্রচুর মানুষ। সবাই দুদ্দাড় করে কূলে নামল। আমি যে ভালো করে একটু দেখব সে অবকাশটুকুও পেলাম না। চলে গেল সবাই আমার চোখের আড়ালে এক গাছের ছায়ায়।

তখন তড়িঘড়ি পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠলাম। হাতে দুরবিন। আর যতদূর সম্ভব নিজেকে রেখেছি লুকিয়ে। শুয়ে পড়লাম সটান পাথরের উপর। পায়ের কাছে বন্দুক জড় করে রাখা। সব নিয়েই এসেছি উপরে। হয় এসপার নয় ওসপার। কিন্তু সবার আগে পর্যবেক্ষণটা দরকার।

দেখি ত্রিশ জন মোট। আগুন জ্বেলে বসেছে গোল হয়ে। মাংস কাটাকুটি চলছে। রান্না কীভাবে শেষ অব্দি হলো আমি দেখতে পেলাম না। একটু পরে দেখি নাচতে শুরু করেছে সবাই। সে কী উদ্দাম উন্মাদ নাচ! কত যে তার অঙ্গভঙ্গি! দেখতে দেখতে গা আমার শিউরে উঠল।

হঠাৎ দেখি দুই বন্দিকে ওরা নৌকো থেকে টেনে নামাচ্ছে। দুরবিনে আমি স্পষ্ট তাদের দেখতে পেলাম। আহারে কী করুণ কী দুঃখী মুখ! একজনকে নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাঠের মুগুর দিয়ে মারল মাথায়। পড়ল সে বালির উপর মুখ থুবড়ে। তখন নিয়ে গেল তাকে চ্যাংদোলা করে আগুনের কাছে। কাঠের তলোয়ার দিয়ে শুরু হলো তাকে কাটাকুটির পালা। অপর বন্দিটি কিন্তু তখনো একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো দেখছে তার সঙ্গীর নিষ্ঠুর পরিণতির দৃশ্য। ভাবছে নিজের আশু অবস্থার কথা। একবার ওরই মধ্যে চোখ তুলে চারধারে কী যেন জরিপ করল। পরক্ষণেই দেখি বাঁই বাঁই করে সে যা তার ছুট! বলব কি এমন ক্ষিপ্র গতিতে যেকোনো মানুষ ছুটতে পারে আমার ধারণার বাইরে। হরিণের চেয়েও দ্রুততর সেই গতি। আসছে আমারই আস্তানার দিকে। সঙ্গীদলেরও খেয়াল গেছে ততক্ষণে। তাদের মধ্যে তিন জন তাকে ধরবে বলে পিছনে ছুটছে। কিন্তু পারে কি ধরতে। অমন গতি কি আছে তাদের পায়ে। আমি তো হতভম্ব। তবে কি সত্যি হতে চলছে আমার স্বপ্ন? কল্পনা কি বাস্তবের রূপ ধরতে চলেছে? অস্ত্রশস্ত্র আমার হাতের কাছেই মজুত। সব

সমেত পাহাড়ের গা ঘসটে ঘসটে অনেকটা নিচে নেমে এলাম। লুকিয়েছি এবার একটা মস্ত গাছের আড়ালে। ডালপালায় এমনই ঢাকা সহসা কেউ টের পাবে না আমার অস্তিত্ব। দুরবিন চোখে দেবার আর দরকার নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব। চারটি প্রাণী দিশেহারা হয়ে উন্মাদের মতো ছুটছে।

মাঝে ছোট একটা নালা। ওপাশে জমি। এপাশে একটু এগিয়ে আমার আস্তানার দেয়াল। নালা বলতে সেই নদীটারই অংশ, যার বুকে ভেলা ভাসিয়ে আমি জাহাজ থেকে আনা প্রথম মালপত্র তুলেছিলাম এই দ্বীপে। বন্দি মানুষটি ছুটতে ছুটতে এসে অসীম ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই জলে। তারপর সাঁতার কাটতে লাগল। অনুসরণকারীদের একজন এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নালার মুখে। হয়তো সাঁতার সে জানে না। বাকি দু'জন মরিয়ার মতো ঝাঁপ খেয়ে পড়ল জলে। সাঁতার কাটতে লাগল উদ্দাম বেগে। প্রথমজন আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গেল। সেটা বন্দির পক্ষে মঙ্গল। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে তিন জনকে লক্ষ করতে লাগলাম।

দু'জন তখনো সাঁতার কাটছে, বন্দি জল থেকে উঠে এসেছে ডাঙ্গায়। ছুটছে। সামনে আমার দেয়াল। থমকে দাঁড়াল। এই আমার সুযোগ। অস্ত্র আমার হাতের গোড়ায় মজুত। তবে কি ঈশ্বরই জুটিয়ে দিলেন আমার সহচর? সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তখন মুখের কাছে হাত জড়ো করে ডাকলাম। সে চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। খুব ঘাবড়ে গেছে। তখন ডাকলাম হাতের ইশারায়। দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তখন এক লাফে নিচে নামলাম। নালার একেবারে কাছে। অনুসরণকারীদের একজন তখন সবে জল থেকে উঠেছে। গুলি করলাম তার বুক লক্ষ্য করে। শব্দ হলো। কিন্তু এমন নয় যে বিরাট একটা আওয়াজ। কূলের কাছে যারা আছে তারা শুনতে পাবে না। গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে। দ্বিতীয় জন থমকে দাঁড়িয়েছে তখন। ডাঙ্গায় এক পা। কাঁধে তীর ধনুক। হয়তো আঁচ করে থাকবে ঘটনাটা। আমাকে দেখতে পেয়েছে। ধনুকে তীর যোজন করে আমার দিকে তাক করল। মারলাম বন্দুকের বাঁট দিয়ে এক ঘা। পড়ল ছিটকে। হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে গেল। ঘুরে দেখি বন্দি চোখ বড় বড় করে দেখছে আমাকে। তখন ফের তাকে ডাকলাম। কাছে আসতে বললাম। এল গুটি গুটি। খানিকদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার ডাকলাম। আবার কয়েক পা এগিয়ে এল। দেখি থরথর করে কাঁপছে। ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম ভয়ের কোনো কারণ নেই। তখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাটিতে বসল। অর্থাৎ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। আমি যে রক্ষাকর্তা ওর! হাসলাম তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। এগিয়ে আসতে বললাম। এল আরো একটু। মাথা নিচু করে মাটিতে ঠেকাল। সটান শুয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল আমার পা। একখানা পা তুলে নিয়ে মাথার উপর রাখল। এটা বর্বর সম্প্রদায়ের রীতি, আমি জানি। অর্থাৎ আমাকে প্রভু বলে মেনে নিল। তখন হাত ধরে তুললাম। বন্দুকের ঘা মেরে যাকে ঘায়েল করেছি, তাকে দেখিয়ে দিলাম, ইশারায়! আকারে ইঙ্গিতে বললাম, ও মরে নি। ওর একটা গতি কর। কী যেন বলল তখন বিড়বিড় করে। এক বর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এই শুনলাম প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর। তখন আমার কোমরের তরবারি খুলে তার হাতে দিলাম। অমনি তরবারি হাতে ছুটে গেল ক্ষিপ্র গতিতে। এক কোপে কেটে ফেলল তার মাথা। আমি তো থ। জার্মানির এমন কোনো জল্লাদ নেই যে পারবে এইভাবে এক কোপে মাথা কেটে নামাতে। আর খুব সম্ভবত নিজের কাজে নিজেও হয়ে গেছে অবাক। বারবার ঘুরিয়ে দেখতে লাগল তলোয়ারখানা। রক্ত মুছে আমার হাতে এনে দিল। আর কী হাসি তখন মুখে! ভীষণ খুশির ভাব। কত কী যে বলল তারপর। আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

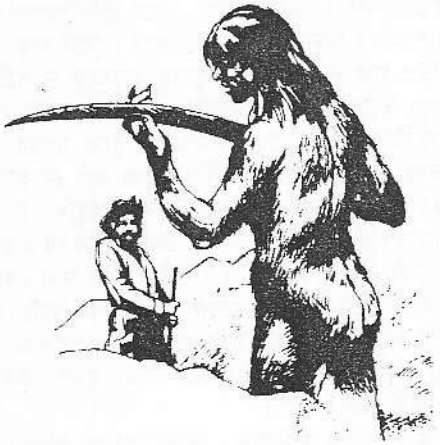

বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো তলোয়ারখানা

ভারি অবাক হয়ে গেছে আমার বন্দুকের ব্যবহার দেখে। দেখে নি তো আগে কোনোদিন। দূর থেকে কি এমন কারিকুরি করলাম যে ছুঁতে হলো না, একটা ঘা অব্দি দেবার দরকার হলো না, অথচ লোকটা পড়ে মারা গেল! আমাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করল, যাব ওর কাছে? বললাম, যাও না, গিয়ে দেখে এস। তখন গেল কাছে। চিৎ করে দিল তার দেহ। ঠিক বুকের মাঝখানে গুলির ফুটো। তা দিয়ে তখনো রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। দেখল তাই অবাক চোখে অনেকক্ষণ। আমি ডাকলাম। তখন মৃত ব্যক্তির তীর ধনুক নিয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মতো আমার পেছন পেছন আসতে লাগল।

কিন্তু না, মড়া দুটো এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক না। যদি বাকি দলবল এসে দেখে তাহলে আমার আস্তানার হদিশ পেয়ে যাবে। তাকে বোঝালাম সে কথা। তখন বলল মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখে যাবে। আমি তাই করতে বললাম। তখন দ্রুত মাটি খোঁড়ার কাজে লেগে পড়ল। কী অসীম ক্ষিপ্রতা তার হাতে! শুধু যে হাত দিয়ে অত অল্প সময়ের মধ্যে দু দুটো মস্ত গর্ত খোঁড়া যায় আমার ধারণারও বাইরে। প্রমাণ আকারে হতে দেহ দুটো নামিয়ে দিল গর্তে, মাটি চাপা দিল। সময় লাগল বড় জোর আধ ঘন্টা। তখন নিশ্চিন্ত মনে চললাম আমার বাড়ির দিকে।

মই ডিঙিয়ে দেয়ালের এধারে আনলাম। দেখে সে তো অবাক। তখন রুটি দিলাম খেতে, আর জল। খেল গোগ্রাসে। আহারে, কবে থেকে হয়তো খায় নি একফোঁটা কিছু! তার উপর মরণপণ এই দৌড়। খাওয়া দাওয়ার পর একটু সুস্থ লাগছে দেখতে। বললাম, শোও এবার, ঘুমোও। বলে পাঁজা করা একধারে ছিল খড়, তার উপর দিলাম একটা কম্বল বিছিয়ে। শুয়ে পড়ল অনুগত ভৃত্যের মতো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সে যাকে বলে গভীর ঘুম।

দেখছি আমি তখন তাকে। সুঠাম সুন্দর স্বাস্থ্য, মজবুত শরীর। পা দুখানি দীর্ঘ এবং চমৎকার গড়নের। বয়েস কত আর হবে, খুব বেশি হলে ছাব্বিশ। মুখ চোখের ভাবও ভারি মিষ্টি। উগ্রতা নেই। কোমল কমনীয় ভাব। আর হাসিটুকু খুব সুন্দর। মাথায় লম্বা কালো

কুচকুচে চুল। কোঁকড়ানো নয়। উন্নত কপাল। চোখে বুদ্ধিদীপ্ততার ছাপ। গায়ের রঙ ঠিক কালো নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায় তাই। ছোট নাক। মুখখানি গোলাকার। নিগ্রোদের মতো ঠোঁটও পুরু নয়, পাতলা। সুন্দর ঝকঝকে দু পাটি দাঁত। তা আধঘণ্টা পরেই দেখি ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে ধড়মড়িয়ে। আমি তখন দুধ দোয়াবার কাজে ব্যস্ত। অমনি শুয়ে পড়ল মাটিতে উপুড় হয়ে, আমার পা তুলে মাথার উপর নিল। আবারও একদফা হাত পা নেড়ে আমার প্রতি যে অসীম কৃতজ্ঞ তাই বোঝাবার পালা। তখন উঠে বসতে বললাম। দুধ দোয়ানো শেষ। বসলাম দু'জন মুখোমুখি। প্রথম কাজ আমার তাকে কথা শেখানো। অর্থাৎ আমার ভাষা। নইলে তো কেউ বুঝবে না কারো মনের ভাব। তারও আগে দরকার ওর একটা নাম। কিন্তু কী নাম দিই। তখন মনে এল বারটার কথা। আজ তো শুক্রবার। ইংরিজিতে বলে ফ্রাইডে। হোক না ওর নাম তাই। অর্থাৎ ফ্রাইডে। সেটা বুঝিয়ে দিলাম। দেখি ভারি খুশি। হ্যাঁ আর না বলতে শেখালাম। শিখে নিল চটপট। বুদ্ধিতে ভারি তুখোড়। দুধ দিলাম খেতে। সঙ্গে রুটি। খেল ঢকঢক করে। আরো খুশি তখন। বুঝিয়ে দিল, ভারি তৃপ্তি পেয়েছে।

রাতটা দু'জনে গুহার মধ্যে কাটালাম। দিনের আলো ফুটল। ঘুম থেকে তুললাম। উদোম ন্যাংটো একদম। একটা কিছু পরনের দরকার। দিলাম একটা প্যান্ট। আমার দ্বিতীয় জাহাজ থেকে প্রাপ্তি। বাইরে এলাম। দেখি কাল যেখানে পুঁতেছে দুটো মৃতদেহ সেইদিকেই নজর ওর। আমাকে ইশারায় বোঝাল, মাংস খাবে। অর্থাৎ নরমাংসলোভী। ওকে বোঝাতে হবে এটা আমার চরম অপছন্দ। তখন ইশারায় বললাম আমার ঘেন্না লাগছে। বমি আসছে। বলে বমির ভঙ্গি করলাম। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম। এল বাধ্য শিশুর মতো। নিয়ে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। দেখতে বললাম দূরে, কূলের দিকে। কাল যেখানে এসে ওরা নেমেছিল। ফাঁকা সব। কেউ কোথাও নেই। নৌকো বা পানসীর চিহ্নমাত্র নেই। চলে গেছে দলবল। সঙ্গী দু'জনকে ফেলে রেখেই।

তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। মনে যে উদ্বেগ। দুটো লোককে ঘায়েল করলাম, একজনকে রাখলাম নিজের কাছে, মুখের শিকার ছিনিয়ে নিলাম মুখের গোড়া থেকে—যদি বদলা নেবার কোনো রকম ফন্দি করে! যদি সত্যি সত্যি চলে না গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকে! সেটাও তো যাচাই করে দেখা দরকার। অনুসন্ধিৎসা যাকে বলে। তখন ফ্রাইডেকে বললাম, চলত দেখি আমার সঙ্গে দেখে আসি সরেজমিনে। অর্থাৎ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম। এখন মনে অন্য রকমের সাহস। একলা তো আর নেই, এখন মোট দু'জন। সঙ্গে নিলাম দু দুটো বন্দুক। আর পিস্তল তো আছেই আর সেই তরবারি। একটা বন্দুকে দিলাম ফ্রাইডের হাতে। চললাম হাঁটতে হাঁটতে কূলের দিকে। অবশ্যই সতর্ক সাবধানে। গিয়ে সে যা দৃশ্য! বীভৎস বললেও এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। সারা এলাকা জুড়ে মৃতদেহের নানান অংশ বিশেষ ছড়ানো। কোথাও মাথা, কোথাও হাত, কোথাও ধড়, কোথাও পা—ঘিনঘিন করে উঠল শরীর। তাকাতে পারছি না। ফ্রাইডে দেখি নির্বিকার। নরমাংসে ওর কেন আমার মতো ঘেন্না হবে! অর্থাৎ যেকোনো কারণেই হোক সঙ্গী দু'জন ফিরে না যেতে বা গুলির শব্দ শুনে ওরা ভয় পেয়ে গেছে রীতিমতো। সব ফেলে ছেড়ে অমনি তড়িঘড়ি পালিয়েছে। আধপোড়া অবস্থায় কত যে পড়ে আছে মাংসের টুকরো! ফ্রাইডে আমাকে ইশারায় বলল, নাকি সঙ্গে এনেছিল ওরা চার জন বন্দি। তিন জনকে মেরেছে, সে ছিল চতুর্থ, তাকে আর কায়দা করতে পারে নি। কথাটা যে ঠিক, তার প্রমাণও পেলাম। মোট তিনটে মাথা, পাঁচখানা হাত, চারটে পা আমি স্পষ্ট চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কেন এই হত্যা? ফ্রাইডে আকারে ইঙ্গিতে যা বলল তার অর্থ

দাঁড়ায় এই—ক্ষমতার লড়াই হয়েছিল তাদের রাজ্যে। তাতে রাজা হেরে যান। রাজার পক্ষের সকলকে বন্দি করা হয়। সে রাজার পক্ষেরই একজন। নানান জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। ভোজের উদ্দেশ্যেই। তার সৌভাগ্য তাকে এই দ্বীপে আনা হয়েছিল। তাই তো সে রক্ষা পেল।

বললাম, সে নয় বুঝলাম, আপাতত এগুলো সাফ করে ফেল দেখি। আমার বমি আসছে। সহ্য করতে পারছি না। বলে ওয়াক তুললাম। তখন বুঝতে পারল। জড়ো করল সব এক জায়গায়। আগুন জ্বালল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল চিতা। দেখি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে দিকে। তখন বোঝালাম, আমি কিন্তু মোটে পছন্দ করি না নরমাংস ভক্ষণ। আমার সামনে এমন আচরণ আর যেন কখনো না করে। বললাম, তবে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব আমি, প্রয়োজনবোধে রাগের মাথায় তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারি।

তখন মাথা নাড়ল। পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল। বলল, কোনোদিন আর ওসব লোভ দেখাবে না। তখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির পথ ধরলাম।

রোদের বড় তাপ। দিয়েছি ওকে শুধু পরনের একটা প্যান্ট। তাতে পিঠে তাপ লাগে। কষ্ট হয়। বসলাম ওর জন্যে ছাগলের চামড়ার একটা জ্যাকেট বানাতে। সে যে কী কসরৎ! তবু গায়ে বেশ মানানসই হলো। টুপিও তৈরি করে দিলাম। পরে সে কী ফুর্তি! কত ভাবে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বারবার। তবে অস্বস্তিও যে বোধ করছে এটা ঘটনা। এতদিনের অনভ্যাসের পর অস্বস্তি তো লাগবেই। তবু লাগছে কিন্তু বেশ। চেহারা তো ভারি চমৎকার। যা পরে তাতেই মানায়। এতক্ষণে প্রভুর উপযুক্ত সহচর বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।

পরদিন সকাল থেকে লাগলাম কাজে। সবচেয়ে আগে ওর জন্যে একটা আলাদা থাকবার জায়গা তৈরি করতে হবে। কোথায় করি? গুহা আর তাঁবুর মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। গাড়লাম সেখানে আরেকটা তাঁবু। তাতে দরজাও হলো। আমার গুহার সেই আরেকটা দরজা যেদিকে তারই একেবারে গোড়ায়। সে দরজাটা দিলাম ভিতর থেকে খিল দিয়ে আটকে। মনে আমার এখনো সন্দেহ আছে। কতক্ষণ বা দেখলাম মানুষটাকে! কী ওর মতলব, কী চায় বলা তো যায় না। তাছাড়া নরমাংস লোভের ব্যাপারটাও পুরোপুরি যায় নি। সেক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। তাইতো আলাদা ব্যবস্থা। ইচ্ছে হলেও ঢুকতে পারবে না আর গুহায়। বিশেষ করে রাত্রে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকব। ও থাকবে বাইরে। আমি মই বেয়ে গুহার দরজা টপকে ভিতরে ঢুকে মইটা নেব সরিয়ে। ব্যস ঢোকার রাস্তা বন্ধ। বাইরের উঁচু দরজাটা ছাড়াও ভিতর দিকে যে আরেকটা দরজা আছে। সেটা একেবারে গুহার মুখ ঢেকে রাখে। তার খিল ভেতরের দিকে। অধিকন্তু এমনই ব্যবস্থা, প্রথম দরজা ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে কেউ নিচে পড়লে পড়বে সটান কাঠের পাটাতনের উপর। তাতে শব্দ হবে খুব। আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

মোটমাট এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। হঠাৎ আক্রমণের আর কোনো ভয় নেই। ও থাকবে বাইরে, আমি ভিতরে। নিরাপত্তার অটুট ব্যবস্থা ছাড়াও হাতের গোড়ায় মজুত আমার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র। কীসের আর ভয়! তবে সবই যে অমূলক এটা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। ফ্রাইডেকে সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। নিপাট ভালোমানুষ

বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। তদুপরি অসম্ভব প্রভুভক্ত, কৃতজ্ঞ এবং আমার প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল। জীবন দান করেছি সেটা ওর কাছে মস্ত ব্যাপার। ভালোবাসে আমাকে হৃদয় দিয়ে। ঠিক যেমন সন্তান ভালোবাসে তার পিতা-মাতাকে। জানি না আমার বুঝতে ভুল কিনা, তবে কখনো কখনো মনে হয় আমার জন্যে জীবন দিতেও তার এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

অবাক হয়ে লক্ষ করি ওর প্রতিটি ভাবভঙ্গি। আর মুগ্ধ বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। কী বলব একে? এতো ঈশ্বরেরই করুণা। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষ। বিচিত্র তাদের আচার আচরণ, বিচিত্র তাদের অভ্যাস। তবু সবার মিল অন্তরে। একই ভালোবাসা সবার হৃদয়ে প্রবাহিত। একই সুখ একই দরদ। ভুলকে সকলে মনে করে ভুল, আবার ঠিককে ঠিক বলে শ্রদ্ধা করে। একে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই নিহিত থাকে মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। সে শক্তিও তিনিই যুগিয়ে দেন। কখন কী করতে হবে সব নির্দেশ তাঁর কাছ থেকেই আসে। তাই তো অবাক শ্রদ্ধায় বারবার মাথা নোয়াই তাঁর উদ্দেশে।

মোটের উপর ফ্রাইডেকে আমি ভীষণ ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু বাধা যে একটা দুরন্ত। ভাষা বোঝে না আমার। আমিও বুঝতে পারি না ওর ভাষা। কীভাবে বোঝার ওকে সব কিছু? তখন ঠিক করলাম, আর কিছু শেখাবার আগে ওকে ভাষাটা শেখাতে হবে। শুরু হলো তারই প্রচেষ্টা। অবাক কাণ্ড, ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী। যেকোনো জিনিস একবারেই বুঝে নেয়, মনেও রাখতে পারে সব। এ-ও যেন আমার এক নতুন আবিষ্কার। সেই মন নিয়েই একটু একটু করে শেখাতে লাগলাম।

আর একটা জিনিস আশু প্রয়োজন। নরমাংসের বদলে অন্য মাংসেও যে সমান তৃপ্তি পাওয়া যায় সেটা ওকে বোঝানো। একদিন তাই সকাল বেলা বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে ও। মারলাম একটা ছোট্ট ছাগল ছানা। বললাম, নে, এটা নিয়ে চল এবার বাড়িতে।

আসছি ফিরে, হঠাৎ দেখি পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আছে একটা ছাগল, সঙ্গে তার দুটো বাচ্চা। ফ্রাইডকে বললাম, দাঁড়া চুপচাপ। দাঁড়াল। তখন গুলি ছুড়ে মারলাম আরেকটা ছানা। সে অবাক। বিস্ময়ে হতভম্ব। কী যে আশ্চর্য ক্ষমতা আমার হয়তো সেটাই মনে মনে ভাবছে। দেখেছে তো একবার। ধারে গেলাম না শরীরে স্পর্শমাত্র করলাম না, শব্দ হলো গুড়ুম করে, সটান মরে পড়ে গেল একটা মানুষ। এখন আবার পর পর এই দুটো ছাগল ছানা। দেখি কাঁপছে থরথর করে। আর চোখে মুখে মূক বিহ্বল সেই ভাব। সেই অবস্থাতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। মাথা নুইয়ে দিল। পা তুলে নিল মাথার উপর। অর্থাৎ বলতে চায়, প্রভু, তোমার অসীম ক্ষমতা। তুমি ইচ্ছে করলে যাকে খুশি বধ করতে পার। আমি তোমার অনুগত সেবক। দোহাই, আমার জীবন নাশ করো না।

তখন হাত ধরে তুললাম, হাসলাম, মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম। বললাম, নিয়ে আয় ওটাকে। ঐ ছাগল ছানা। তারপর বাড়ি চল। তোকে আজ নতুন মাংস খাওয়াব।

বলেই খেয়াল হলো, বন্দুকের ব্যবহার সম্বন্ধে ওকে খানিকটা সচেতন করে দেওয়া দরকার। দেখি দূরে বসে আছে মস্ত এক বনমোরগ। ঈগলের মতো দেখতে। বললাম, দেখ এবার, ঐ পাখিটাকে আমি মাটিতে ফেলব।

বলে টিপ করে ঘোড়া টিপলাম। পড়ল মোরগ মাটিতে। সে তো হতবাক। এত শক্তি এই যন্ত্রের! দূরের কাছের যেকোনো জিনিসই এর শিকার! আগুন উগড়ে দেয় মুহুর্মুহু! অসীম শ্রদ্ধা তখন সেই বন্দুকের উপর। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে যে কত মিনতি কত অনুনয় বিনয়! আমি তো হেসে কূল পাই না। কিছুতে ঘেঁষতে সাহস পায় না বন্দুকের ধারে কাছে। ছোঁয়া তো দূরের কথা। সুযোগ পেলেই বন্দুককে জানায় নিজের মনের হাজারো আকুতি। আমি দেখি আর হাসি।

মরে নি তখনো পাখিটা। বললাম, যা নিয়ে আয়। গেল ছুটে। নিয়ে এল। ফিরে গেলাম বাড়িতে। ছাল ছাড়ানো হলো ছাগল ছানার। পাখিটার পালক সাফ হলো। চড়ালাম রান্না। সেদ্ধই বলা যায়, তবে অন্যদিনের মতো নয়। আজ সুসিদ্ধ। ঘন থকথকে ঝোল। দিলাম বাটি ভরে ওর সামনে। আমিও নিলাম। খেয়ে দেখালাম নিজে। সঙ্গে নুন। সে-ও খেল। জীবনে এই প্রথম নুন খাওয়া। সে কী মুখের ভঙ্গি! ভালো যে লাগে নি সেটা আমাকে বার বার নানান ভাবে বোঝাল। তখন নুন ছাড়া আমি এক টুকরো মাংস মুখে নিলাম। ফেলে দিলাম থু থু করে। ও ভঙ্গি যেমন করেছে তাই করলাম। তখন অল্প একটুখানি তুলে মুখে দিল। সে-ও নিতান্ত অনিচ্ছায়। দেখি মাংস খায় গপ গপ করে। তাতে তৃপ্তি। নুনে রুচি আনতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছে।

পরদিন আর সেদ্ধ নয়, ঝলসে খাওয়া হবে মাংস। আগুন জ্বাললাম কাঠ কুটো জড় করে। ঝুলিয়ে দিলাম তার ওপরে কালকের মাংসের অবশেষ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল এই প্রক্রিয়া। দিলাম ওর হাতে এক টুকরো। দেখি ভারি খুশি। সেদ্ধ মাংসের চেয়ে ঝলসানো মাংসেই ওর তৃপ্তি বেশি। তাতে অবিশ্যি আমার কিছু যায় আসে না। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে ওর মাংস খাওয়ার প্রচলিত অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা। সেটা যে সফল হয়েছে আমি তাতেই খুশি।

এদিকে আটার সঞ্চয় শেষ। যব ভাঙাতে হবে। পরদিন বসলাম এক ঝুড়ি যব নিয়ে। কেমন করে পেষাই করতে হয় দেখিয়ে দিলাম। বুদ্ধি তো তুখোড়। শিখে নিয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই ভাঙতে বসল যব। তখন রুটি বানালাম আটা দিয়ে। দেখল অবাক চোখে খানিকক্ষণ। তারপর আমাকে সরিয়ে নিজেই বানাতে বসল রুটি।

অদ্ভুত নৈপুণ্য ওর প্রতিটি কাজে। আর ভীষণ বুদ্ধি। সব শিখে নিল অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাকে আর কাজ নিয়ে ভাবতে হয় না। প্রয়োজন মতো নিজেই আটা ভাঙে, রুটি গড়ে, মাংস রাঁধে, খাবার টেবিলে এগিয়ে দেয় পরিপাটি করে। আমার আর চিন্তা কীসের!

তবে নেই একদম এটা বললেও ভুল হবে। ঘর সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তাই নিয়ে যে হাজারো রকমের দুশ্চিন্তা। এখন তো আর একলা আমি নই, দু'জন এখন। দু'জনের খোরাক যোগাড়ের চিন্তাটা কি কম। এতদিন যা চাষবাস করতাম সব তো কেবল নিজের কথা ভেবে। কিন্তু এখন যে সে অভ্যেস বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ আরো জমি তৈরি করতে হবে চাষের জন্যে। আরো শস্য ফলানো দরকার। সেটা অবিশ্যি ঝকমারি কিছু নয়। ফ্রাইডেকে নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। অদ্ভুত ক্ষমতা ওর! খাটতে পারে প্রচণ্ড। আমাকে বলল, মালিক, আপনাকে এতো খাটতে হবে না। আমি তো আছি। বলে দিন আমাকে কী কী করতে হবে। সব আমি করব। আপনি শুধু বসে বসে দেখুন।

আমার যেন হাতে স্বর্গ পাওয়ার অবস্থা। এর চেয়ে সুখ আর কী থাকতে পারে জীবনে! ছিলাম পঁচিশটা বছর একাকী, সঙ্গী পেলাম তার পরে। মনের মতো সঙ্গী। এতদিন জানত না নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে। অর্থাৎ আমাকে বোঝাতে পারত না। ইদানীং তা-ও পারে। শিখে নিয়েছে অনেক নতুন নতুন কথা। সেটা আমার কাছে বিরাট একটা ব্যাপার। আমিও জবাবে কিছু বলতে পারি। এতদিনকার বোবা জিভে আবার ভাষা ফুটতে শুরু করেছে। ভারি তৃপ্তি পাই ওর সাথে কথা বলে। এত সরল এত অকপট ওর মন। আর ভীষণ শ্রদ্ধা করে আমাকে। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। জানি না এর আগে এত গভীর ভাবে আর কাউকে ও ভালোবাসতে পেরেছে কিনা।

তবু ঐ যে বলে সন্দেহ। চট করে কাউকে বিশ্বাস করতে মন বিদ্রোহ করে। সন্দেহের বশেই ভাবলাম একদিন—আচ্ছা, নিজের দেশের ব্যাপারে ওর মনের ভাবটা বর্তমানে কী, সেটা একটু পরখ করে দেখা যাক। সুযোগ পেলেই কি আমাকে ফেলে পালাবে নিজের দেশে? তখন বললাম, আচ্ছা ফ্রাইডে, তোর দেশে আগে কখনো লড়াই হয়েছে? বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকবার। আমরা খুব ভালো লড়াই। অর্থাৎ ভালো লড়াই করতে পারে। বললাম, তবে কী করে ওরা তোকে বন্দি করল?

বলল, খুব মার দিয়েছি আমরা। অসম্ভব। অর্থাৎ দু দলে ভীষণ লড়াই হয়েছে।

বললাম, তোর মুণ্ডু। তোরা মার খেয়েছিস। তাই তো তোদের এই দশা।

বলল, কী করব? ওরা অনেক। মারল। মরল। এক দুই তিন আর আমি। বন্দি। নিয়ে এল এখানে। দু হাজার লোক আমরা। কী করবে তারা?

—তোদের চার জনকে তো বাঁচাতে পারত? শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত।

—অসম্ভব। হঠাৎ যে আমাদের চার জনকে পানসিতে তুলে পালাল। আমরা কি জানতাম?

—আর ওদের যারা ধরা পড়ল তোদের দেশে? তাদের কী হাল? তোদের দেশের লোকও কি তাদের কেটে খাবে? সেটাই কি নিয়ম?

—হ্যাঁ। নিয়ম। আমরা মানুষ খাই। খুব।

—কোথায় নিয়ে খাবি তাদের!

—যেখানে খুশি। কত দ্বীপ। কত। দেশে খাব না।

—এখানেও আসে কি তোদের দেশের মানুষ?

—আসে।

—তুই আগে কখনো এসেছিলি এখানে? অন্য কারো সাথে?

—হ্যাঁ। একবার। বলে উত্তর পশ্চিম অংশ আঙুল দিয়ে দেখাল। অর্থাৎ সেই পায়ের ছাপ। আমার প্রথম দেখা সেই ভয়াবহ দৃশ্য। নিজের অজান্তেই একবার শিউরে উঠলাম।

একেই বলে হয়তো পরিহাস। যে মানুষ আগে এসেছে এখানে নরমাংস খাবার লোভে, তাকেই কিনা পরে আসতে হলো বন্দি হয়ে, তার মাংস খাবে অন্য সবাই। আরো কিছুদিন পর তাকে নিয়ে গেলাম একদিন সেইখানে। দেখে চিনতে পারল। আমাকে বলল সব। পুরো বিবরণ দিল ভোজের। সেবার নাকি মহা ভোজ। বন্দি ছিল সঙ্গে মোট তেইশ জন। তার মধ্যে কুড়িটি পুরুষ, দুটি নারী আর একটি শিশু। তা কুড়ি তো তখনো বলতে শেখে নি। আমাকে পাথরের নুড়ি জড় করে বুঝিয়ে দিল সংখ্যাটা। তখন নতুন করে আরো একবার শিউরে উঠলাম।

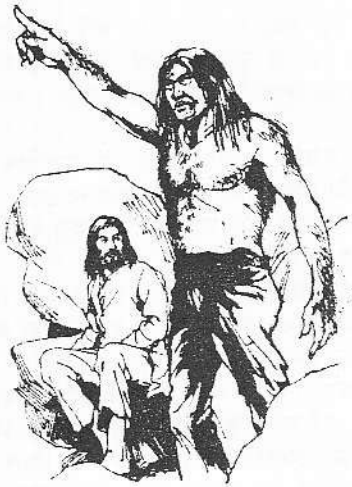

সে থাকে ঐ হেথায়

বললাম, হ্যাঁরে, তোদের দেশ এখান থেকে কতদূর? পানসিতে যে আসিস, ভয় করে না? সমুদ্রে ডুবে যায় না কখনো?

বলল, ডোবে না। বেশি দূর নয় দেশ। ভোর থাকতে রওনা দেয়। তখন সমুদ্রে স্রোত কম, হাওয়াও কম। আবার ফিরে যায় সন্ধ্যে নাগাদ। তখনো আবহাওয়া অনুকূল।

অর্থাৎ সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি ওরা বোঝে। এই যে স্রোত বা বাতাস এর মূলে রয়েছে সূর্যের তাপ। রোদ যত প্রখর হয়, বাতাস তত বাড়ে। তদুপরি জোয়ার ভাটার ব্যাপারটাও কম নয়। ভাটার সময় রুনুকো নদীর জল গলগলিয়ে এসে পড়ে সমুদ্রে, তাতে স্রোত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। এটা অবিশ্যি পরে আমি চিন্তা ভাবনা করে বের করেছি। যতদূর অনুমান, এই যে দ্বীপে আছি আমি—এটা ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঞ্জের অংশ বিশেষ। নদীর উত্তর মুখে এর অবস্থান। সেটা আকারে ইঙ্গিতে ফ্রাইডেও আমাকে বোঝাল। কত যে প্রশ্ন করলাম এই দেশ নিয়ে! কেমন তারা মানুষ। কত তাদের সংখ্যা, কী তাদের অভ্যাস, কয়টি গোষ্ঠী এখানে আছে। তা সব প্রশ্নের পারে না জবাব দিতে। শুধু বলে ক্যারিব, অর্থাৎ এরা ক্যারিবীয় সম্প্রদায় ভুক্ত। ম্যাপ খুলে দেখলাম, আমেরিকা ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গেলে ওরুনুকো নদী। সেখানেই এই অঞ্চল। ফ্রাইডে বলল, নাকি সাদা চামড়ার একদল মানুষও থাকে কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে। ঠিক কোথায় সে বলতে পারে না, তবে শুনেছে বড়দের মুখে। তারা নাকি ভীষণ নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝে সংঘর্ষ লাগে তাদের সঙ্গে। তখন নাকি নির্দয় ভাবে হত্যা লীলা চালায়। অর্থাৎ স্পেনীয়। সারা দুনিয়ায় স্পেনীয়দের নিষ্ঠুরতার কথা কে না জানে।

বললাম, আচ্ছা বলত দেখি, আমি যদি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই তাহলে কেমন করে যাব?

বলল, দুটো নৌকো লাগবে।

তার মানে? ভেবে ভেবে কিছুতে আর মানে পাই না। শেষে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করতে আকারে ইঙ্গিতে যা বোঝাল তার অর্থ এই, পানসিতে হবে না। লাগবে দু দুটো নৌকা জড় করলে যত বড় হয় ততখানি বড় একটা জাহাজ। তবেই তাদের দেশে যাওয়া সম্ভব হবে।

হোক জাহাজ, তাতে আমার কোনো আপত্তি বা অসুবিধে নেই। মোটমাট এখান থেকে বের হবার তো একটা রাস্তা জানা গেল। আজ না হোক কাল, ফ্রাইডে যদি সঙ্গে থাকে, তবে বেরিয়ে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদি সফল হই তবে ভালো, বিফল হলে ডুবে মরব। তা-ও তো বন্দিদশা থেকে মুক্তি।

এই যে এতদিন ফ্রাইডে আছে আমার সঙ্গে—ছায়ার মতো পাশে পাশে ঘোরে, খায় একসাথে বসে, ঘুমোয়—একবারও কিন্তু ওর মনে ধর্মীয় চিন্তা জাগিয়ে তোলার এতটুকু চেষ্টা আমি করি নি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে তার স্রষ্টা। কথাটার মানে সে একদম বুঝতে পারে নি, হা করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তখন বললাম, আচ্ছা বলত দেখি, এই সাগর কার হাতে তৈরি, কিংবা এই পায়ের নিচের মাটি বা মাথার ওপরের আকাশ? বলল, কে আমার—বেনামুকি। সে থাকে ওই হোথায়? বলে দূরে আকাশটা দেখিয়ে দিল। বললাম, সে আবার কে? বলল, জানো না তুমি? সে মস্ত বড় মানুষ। তার অঢেল ক্ষমতা। আর অনেক বয়েস। এই সাগর, মাটি, পাহাড়, চাঁদ, সূর্যের চেয়েও বয়েসে অনেক বড়ো। বুড়ো থুথুড়ে। বললাম, বেশ তো, নয় মানলাম তোর কথা, ধরে নিলাম তোর বেনামুকিই সৃষ্টি করেছে সব। তবে সকলে বেনামুকিকে পুজো করে না কেন? কী গম্ভীর তখন ফ্রাইডের মুখ! যেন বিরাট এক কুট তর্কের সুচিন্তিত মতামত দিতে চলেছে, সেই রকমই ভাব। বলল, করে তো। সবাই পুজো করে। পুজো করে বলেই তো আকাশ গোল, সাগর গোল, মাটি গোল, পাথর গোল—সব গোল। পুজো মানেই গোল। বললাম, আর যারা মারা যায় তারা? কোথা যায় মৃত্যুর পর? বলল, বেনামুকির কাছে।—কী করে তখন বেনামুকি? সবাইকে পটাপট গিলে খায়? বলল, হ্যাঁ, খুব ক্ষিধে তার। তাই খায়।

তারপর থেকেই তার মনে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত বোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করি। বললাম, সত্যিকারের ঈশ্বর কোথায় থাকেন জানিস, ঐ আকাশে। ওর ওধারে স্বর্গ। তাঁরই কর্তৃত্বে চলে এই গ্রহ নক্ষত্র তারা। চলে এই পৃথিবী। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ একাই অসীম শক্তির অধিকারী। কারুর সাহায্য তার দরকার লাগে না। আমাদের সব যেমন তিনি দুহাত ভরে ঢেলে দেন, আবার ইচ্ছে হলে সব কিছু কেড়েও নেন তিনিই।

দেখি শুনছে খুব মন দিয়ে। সারা চোখে মুখে অদ্ভুত আগ্রহের দ্যুতি।

তখন যীশু খ্রিস্টের গল্প বললাম। তাঁর সৃষ্ট প্রার্থনার কথা বললাম। ঈশ্বর স্বয়ং পাঠিয়েছেন তাঁকে এই পৃথিবীতে তাই তো আশ্চর্য শক্তি নিয়ে রচনা করতে পেরেছেন অনবদ্য সব প্রার্থনা গীতি। সে প্রার্থনা ঈশ্বর স্বর্গ থেকেও শুনতে পান।

ফ্রাইডে বলল, তবে তো বেনামুকির চেয়ে তিনি অনেক অ-নে-ক বড়। সে তো থাকে ঐ পাহাড়ের মাথায়। তবু কই সব কথা যে শুনতে পায় না।

বললাম, তুই বুঝি পাহাড়ের মাথায় বেনামুকির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলি?

বলল, না না, আমরা যাই নি। আমাদের যাবার নিয়ম নেই। কম বয়েস যে আমাদের। যায় বুড়োর দল। তারা উকাকী। তারা বেনামুকির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে।

উকাকী অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। এটা আমি প্রশ্ন করে জেনে নিলাম।

বললাম, তারপর?

—তারপর আর কী? সব জেনে ফিরে আসে তারা। বেনামুকী কি বলল আমাদের এসে বলে। আমরা সেই ভাবেই কাজ করি।

অর্থাৎ ধর্মের নামে বুজরুকি। সভ্য জগতের সঙ্গে নেই কিছুমাত্র সংযোগ বা সংস্পর্শ, ধর্মের নামে এখনেও চলে নানান কলা কৌশল। পৃথিবীর সব দেশেই হয়তো এটাই চিরাচরিত প্রথা।

তবে ভুল ভাঙানোটা দরকার। দরকার মন থেকে এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করা। বললাম, দেখরে, এই যে বুড়ো মানুষদের পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বেনামুকির সাথে কথা বলে সব জেনে ফিরে আসা গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে, ভুয়ো। এর মধ্যে সত্যের নাম গন্ধ নেই। তোদের এইভাবে ওরা দিনের পর দিন ঠকায়। যদি সত্যি সত্যি সেই নির্জনে কারুর সঙ্গে তারা কথা বলে। তবে সে ঈশ্বর নয়, পিশাচ। পিশাচই বাস করে একমাত্র ঐ নির্জন বন্ধুর পরিবেশে।

বলে পিশাচ কী, কেমন ভাবে তার জন্ম হয়। বাইবেলে এ সম্বন্ধে কি লেখা আছে—সব বললাম। শুনল মন দিয়ে। তবু ঐ-চট করে কি আর বিশ্বাস যায়! মনে যে এতদিনের ক্লেদ গ্লানি আর কুসংস্কারের বীজ। তখন শুরু করলাম একদম গোড়া থেকে। এই বিশ্ব, তার জন্ম, তার সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অবদান, আমাদের জন্ম, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ, আমাদের পুণ্য, আমাদের পাপ-সব একটু একটু করে ব্যাখ্যা করে, উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম। দেখি শুনছে ভারি তন্ময় হয়ে। আর চোখে বিশ্বাসের ঝিলিক। পিচাশের কথাও বললাম। তার সৃষ্টি, তার ক্রিয়াকাণ্ড। কেমন করে প্রভুর সৃষ্ট দুনিয়াকে ধ্বংস করার জন্যে সে সর্বদা ফন্দি ফিকির খোঁজে। কিন্তু পারে না যেহেতু সে-ও প্রভুরই সৃষ্টি। প্রভুর ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক বেশি। বুঝতে পারল ফ্রাইডে। বলল, তাই যদি হয়, তবে ঈশ্বর পিশাচকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? মেরে ফেললেই তো পারে।

আমি অবাক। হতভম্ব যাকে বলে। কী দেব এর উত্তর? প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি এই মাত্র, কিন্তু আমি কি ধর্মপ্রচারক যে প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখি। তাই চেষ্টা করলাম প্রথমে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে। শুনেও না শোনার ভান করলাম। ফের বলতে বললাম। হুবহু একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তখন বললাম। শেষ করার সময় এখনো আসে নি। শাস্তি পেতে আরো অনেক দেরি আছে। কবে পূর্ণ হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তিনি সময় মতো সঠিক ব্যবস্থা নেবেন। এটা ঠিক মনঃপূত হলো না তার। বলল, কিন্তু কবে হবে সেই সময়? কতদিন পরে? এখন মারলে অসুবিধে কী? বললাম, অসুবিধে আছে। পাপীকে অনুতাপ করার সুযোগ করতে দেয়। অনুতাপই তার শাস্তি। অনুতাপের বোঝা পূর্ণ হলো তবেই আসে বিনাশ। অর্থাৎ শেষ। তারপর তার মুক্তি।

এ জবাবে দেখি বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। ভাবল চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ। আমারো ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। কী কুক্ষণে যে শুরু করেছিলাম ওকে এই সব বোঝাতে! কিন্তু আর নয়। এরপর নতুন কোনো প্রশ্ন করলে জানি না মুশকিলে পড়ব কিনা। তাই চটপট ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালাম। যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে কোনো কাজের কথা। ওকেও একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম দূরে কোথাও। গেল চলে! আমারো স্বস্তি।

স্বস্তি ছাড়া একে বলবই বা কী। আমার কি বাপু অত জ্ঞান গম্যি আছে! তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠা যে অন্য কারো চেয়ে কম নেই এটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। নিষ্ঠা দিয়েই তো চিনেছি ঈশ্বরকে। আমার দাতা, আমার ত্রাতা, আমার রক্ষককে। কিন্তু অতশত প্রশ্নের

উত্তর যে জানি না। ফ্রাইডের চোখে আমি এক মহান ব্যক্তিত্ব কিন্তু যদি প্রশ্নের গুঁতোয় সেই ধারণা ওর মন থেকে মুছে যায়! সে ভয়টাও কিছু কম নয়। মোটমাট এড়িয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ। যতটুকু জানি তার বেশি এগোনো কোনোক্রমেই উচিত নয়। কী বলতে কী বলে ফেলব, তার তো কোনো ঠিক নেই। ঈশ্বর আমার কাছে কিছু অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছি তাকে এই নির্জন পরিবেশে। প্রশ্ন করলে এবার থেকে সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলব। এর বাইরে একচুল কোথাও নড়ব না।

এবং সেইভাবেই কথা হয় এরপর থেকে। প্রশ্ন করে ফ্রাইডে একের পর এক। আমি একের পর এক আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি।—কেমন করে এলাম এখানে, কেমন করে বাসা বাঁধলাম, কী কী ধারণা জন্মাল, কেমন করে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্যশস্য চাষ করতে শিখলাম। কীভাবে সংগ্রহ করতাম অপরাপর খাদ্য। লোভের বশবর্তী হয়ে ডোঙায় চড়ে দ্বীপ জয় করতে গিয়ে একবার কী বিপত্তি হয়েছিল—সব একটার পর একটা বলি। অবাক তন্ময় হয়ে শোনে ফ্রাইডে। আর এক একটা ঘটনাকে নিজের ইচ্ছামতো ভগবৎ চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। সেটাও আবার বলে আমাকে। আমার মতামত জানতে চায়। আমি সায় দিই। দিনের পর দিন চলে এই অদ্ভুত খেলা।

তবে আমার দৈনন্দিন বাইবেল পাঠে কিন্তু ভাঁটা পড়ে নি। রোজ বসি নিয়ম মতো। পড়ি একমনে, ফ্রাইডে বসে শোনে তন্ময় হয়ে! এটা ওটা প্রশ্ন করে। সাধ্যমতো জবাব দিই। স্পষ্ট বুঝতে পারি। একটু একটু করে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি ওর আসক্তি জন্মাতে শুরু করেছে। সেটা মঙ্গল। হয়তো একদিন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করবে। করুক। আমি মনে প্রাণে তাই চাই। তার পূর্ণ কৃতিত্ব হবে আমার। সেটাই সবচেয়ে বড় গৌরব।

এবং এইভাবে দুটি ভিন্ন ধরনের মানুষ আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছি। যাকে বলে আত্মার আত্মীয়। অনেক অন্তরঙ্গ এখন আমরা। মোটামুটি ফ্রাইডে সম্পর্কে নির্ভুল একটা ধারণা আমার মনে জন্মেছে। একটু একটু করে সব ওকে শেখাতে শুরু করেছি। ঘুরে বেড়াই সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের এ মাথা থেকে ওমাথা অব্দি। বন্দুক চালানো শিখিয়েছি। তবে দিই নি ব্যবহারের জন্যে এখনো বন্দুক। পরিবর্তে দিয়েছি একটা ছুরি আর ছোট একখানা হাত কুড়ুল। আমারই মতো একটা বেল্ট করে দিয়েছি কোমরে বাঁধার। তাতে ঝুলিয়ে রাখে কুড়ুল। ছুরিটা প্রায় সময় হাতেই রাখে। কোনোদিন তো পায় নি এমন ছুরি হাতে, এত যে ধার হতে পারে এটা ওর কল্পনার বাইরে। প্রায় সময়ই দেখি ছুরি দিয়ে একটা না একটা কিছু কাটছে।

ইউরোপ দেশটা কেমন, তারও একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়েছি। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের। কেমন ভাবে থাকতাম সেখানে, কী কী আমাদের রীতিনীতি, কী অভ্যাস, ঈশ্বরকে সেখানে আমরা কী চোখে দেখি, জাহাজে কী কী সওদা নিয়ে ভেসে পড়ি সমুদ্রে—সব ওর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার সমুদ্র যাত্রার বিবরণ দিতেও বাকি রাখি নি। তিন বারের কথাই বলেছি। এমনকি নৌকাডুবির পর সেই যেখানে এসে পড়েছিলাম বালির উপর, সেটাও একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এসেছি।

সেই নৌকোটাও দেখালাম। বালির মধ্যে গেঁথে থাকা সেই নৌকা। আমি পারি নি একচুল নড়াতে। ঘুরে ঘুরে ফ্রাইডে সবদিক থেকে জরিপ করল। আমি বললাম, কী ব্যাপার, এত যে দেখলি চারপাশ থেকে? কারণ কী? বলে, দেখেছি এরকম নৌকো আগেও। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে আসে।

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। সেটা একটু পরে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যখন টালমাটাল হাল, তখন নৌকোয় করে আত্মরক্ষার জন্যে ভেসে পড়ে নাবিক।

বাতাস ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ভেড়ায় তাদের দ্বীপে। নাবিকদের কী পরিণতি হয় সেটা সহজেই অনুমেয়। নৌকাটা ওরা নষ্ট করে না, অক্ষত ভাবে রেখে দেয়।

এটা যদি সত্যি হয় তবে ওদের দেশে এরকম নৌকো বিস্তর আছে। সেক্ষেত্রে একটা অন্তত পেলে সমুদ্রে ভেসে পড়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আরেকটুকু বিশদ করে জেনে নেওয়া দরকার।

বললাম, কেমন সে নৌকো, আমাকে বল।

বলল, ভালো। তাতে বোঝাই সাদা চামড়ার মানুষ।

—কজন?

দুহাতের আঙুল দুবার তুলে দেখাল,—সতেরো জন।

—কী করেছিস তাদের? কেটেকুটে খেয়ে নিয়েছিস নির্ঘাৎ?

—না। সাদা চামড়ার মানুষ আমরা খাই না। তারা আমাদের ওখানে থাকে। এখনো আছে।

অর্থাৎ সেই জাহাজের নাবিক এরা—সেই যে বন্দুক ছুড়ে বিপদের কথা জানান দিয়েছিল। আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি এটা ওটা নানান জিনিস।

সে প্রায় চার বছর আগের কথা। তবু ভালো, নরখাদকের দল তাদের হত্যা করে নি।—তা তোদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয় না?

বলল, না, ওরা বন্ধু। বন্ধু ভেবেই ওদের থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওদের কোনোদিন কোনো বিপদ হবে না।

—যদি অন্যায় করে,—খাবি না কেটেকুটে মাংস?

বলল, না, মাংস আমরা সব সময় খাই না। মানুষের মাংস। যখন যুদ্ধ হয়, হেরে যায় কেউ—তখনি খাই। বন্দিদের মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই।

এর বেশ কিছুদিন পরের কথা।

দারুণ ঝকঝকে রোদ। আর মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। কুয়াশার লেশ মাত্র নেই। আমি আর ফ্রাইডে পুবের দিকের পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ চলে শুধু জল আর জল। বহুদূরে রেখার মতো একসারি গাছপালা। ওটা আমেরিকা। আমি অনুমান করতে পারছি। পিছনে ফিরলাম। দেখি একটা কাছেই দ্বীপ। কাছে বলতে একেবারে হাতের গোড়ায় নয়, টানা পথে অন্তত ক্রোশ তিনেকের মতো দূর। ফ্রাইডেরও নজর গেছে সেদিকে। আর কী উল্লাস! লাফাতে শুরু করেছে দেখি শিশুর মতো। বলল, ঐ দেখুন, ঐ আমার দেশ, আমার মাটি। ঐ যে!

সে যে কী সরল কী আনন্দের মুখচ্ছবি! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। বিমূঢ় বিহ্বল আমার অবস্থা। আর মনে একটু একটু করে রাগ জন্ম নিচ্ছে আর বিদ্বেষ। তার মানে তোমার মনের আসল কথা এই। আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে না! দেশে ফিরে যেতে চাও তুমি! সেটাই তোমার একান্ত বাসনা!

বলব কী, মুহূর্তে যেন ভারি নীচ, ভারি নিষ্ঠুর মনে হলো ফ্রাইডেকে। আর হিংসে।—আমি থাকব বন্দি অবস্থায় এখানে, আর তুমি দেশে ফিরে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবে! তারই জন্যে এত উল্লাস! তাহলে এই যে ওর জীবন রক্ষা করলাম, এই যে এত কিছু শেখালাম ওকে—ধর্মের এই এত সব কথা,—সব মিথ্যে? কোনো কিছুরই দাম নেই।

সে এমনই অবস্থা, ভালোভাবে ওর দিক আর তাকাতে পারছি না। কথা বলতে পারি না মন খুলে। কী যেন একটা বাধা সদা সর্বদা আমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ওকে আমি এখন রীতিমতো হিংসে করতে শুরু করেছি। হায়, হায়, তখন কি জানি সে আমার কত বড় ভুল! আমি আমার সভ্য দুনিয়ার নিয়মের ছকে ফেলে ওকে বিচার করতে চেয়েছিলাম। সে বিচার একান্তভাবে আমারই করা বিচার। সত্যের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। অসভ্য দুনিয়ার মানুষ অন্য ধাতুতে তৈরি। তারা ভালোবাসতে জানে প্রাণ দিয়ে। জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যবোধ দিয়ে বারে বারে লাথি মারে আমাদের সভ্য দুনিয়ার মুখে।

ঘটনাটা খোলসা করে বলি।

হিংসেয় তো সর্বদা আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। সেই চোখ দিয়েই বিচার করি ওর প্রতিটি কার্যকলাপ। ওর কিন্তু কোনো কাজেই কোনো ভুল নেই। সেই সরলতা সেই আন্তরিকতা নিয়ে করে প্রতিটি কাজ। সারাদিন ছায়ার মতো থাকে আমার সাথে। আমাকে সন্তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এমন কি, আমার মনে যে এই এত জ্বলুনি—এটাও ওর সহজ সরল চোখে ধরা পড়ে না।

একদিন সেই পাহাড়ের মাথায় উঠেছে গিয়ে ফের পাশাপাশি দু'জন দাঁড়িয়ে। সেদিন আবহাওয়া তেমন পরিষ্কার নয়। ধোঁয়ার মতো কুয়াশার একটা প্রলেপ। তির্যক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কীরে, যাবি না তোর দেশে? বলল, যাব। দেশ আমার খুব ভালো। খুব ভালো লাগবে যেতে পারলে। বললাম, গিয়ে তো ফের মানুষের মাংস খাবি। ভুলে যাবি সব কিছু তাই না? বলল, মোটেই না। আমি আর খাব না। সবাইকে বলব মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে। ঈশ্বরের কথা বলব। চাষ করব। ছাগলের দুধ খেতে বলব।—তবে আর কি, আমি বললাম, তোর তো কপালে অনিবার্য মৃত্যু। ওরা সব শুনে তোকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে। বলল, না না, খাবে না। শুনে আমাকে ভালোবাসবে। আমি যা বলব তাই করবে। তাঁরা নাকি সাদা চামড়ার সেই সতেরো জনের কাছ থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস শিখেছে। কই, তাদের তো মারে নি বা কেটে কুটে খেয়ে নেয় নি! বললাম, বেশ তো, যা চলে। তোর যদি ইচ্ছে হয়, এক্ষুনি যা। বলল, কেমন করে যাব? অতখানি কি সাঁতার কেটে যাওয়া সম্ভব? বললাম, ঠিক আছে, আমি নয় তোকে একটা পানসি বানিয়ে দেব। বলল, আর আপনি? বললাম, আমার আর কি, এখানে থাকব। বলল, আপনি না গেলে আমি যাব না। তখন হাসলাম, বললাম, আমি গেলে আমাকে তো তোরা কেটেকুটে খেয়ে ফেলবি। বলল, না না, ছিঃ, আপনাকে সকলে খুব ভালোবাসবে। আমি বলব সবাইকে আপনার কথা। ভালোবাসতে বলব।

সেই দুরাশাটা মনের মধ্যে ফের পাক খেতে শুরু করেছে। বন্দি দশা থেকে মুক্তির সেই আদিম ইচ্ছা। যাব নাকি ওর সাথে ওর দেশে! সেই সতের জনের সাথে দেখা হবে। হোক না স্পেনীয় কি পুর্তুগিজ—কী আসে যায়! তারাও তো বন্দি। দেশে ফেরার আকুলতা কি তাদের মধ্যেও কিছু কম? সবাই মিলে যুক্তি করে একটা রাস্তা বের করব। খেটে খুটে নয় তৈরি করব মস্ত একটা নৌকো। আমার ডোঙাটাও নিয়ে যাব সাথে করে। নয় আর কিছু না হোক, সেটাতে চেপেই ভেসে পড়ব।

নিয়ে গেলাম তখন তাকে আমার সেই ডোঙার কাছে। বললাম, কীরে, এতে চেপে দু'জনে আমরা যেতে পারব তোর দেশে? বলল, না, এটা বড্ড ছোট। দু'জন যাওয়া যাবে না। একজন হলে হয়। বললাম, বেশ তো, আয় তবে দু'জনে মিলে একটা বড় নৌকা বানাই। গাছ কেটে। তাতে খাবার দাবার সব দিয়ে দেব! আমি নয় এখানেই থাকব। আগে তুই তাতে চেপে তোর দেশ থেকে ঘুরে আয়।

রাগ না? আমি কি রাগ চিনি না

শুনে অব্দি সে যে কী থমথমে মুখের ভাব, সে আমি বলে বোঝাতে পারব না। হাসি খুশি মানুষ হঠাৎ থম মেরে গেলে যে রকম হয়। দেখি চোখ তুলে তাকায় না আর আমার মুখের দিকে। বললাম, কী হলো, চুপ করে গেলি কেন? কী হয়েছে?

বলল, আমি জানি না। আমি কী করেছি আপনার যে আপনি ঐসব বলছেন?

বললাম, কী আবার বললাম তোকে?

বলল, ঐতো, ঐ রাগ। আমি সব বুঝতে পারছি। আপনি আমাকে মোটে ভালোবাসেন না।

আমি অবাক। বললাম, কোথায় রাগ করলাম আমি?

—রাগ না? রাগ কি আমি চিনি না? ঐ যে বললেন, তুই একলা গিয়ে ঘুরে আয়। আমি এখানে থাকব।

—তা এর মধ্যে রাগ কোথায়?

—রাগই তো। আমাকে একলা পাঠাবেন। কেন, আমি তো আপনাকে ছাড়া যাব না বলে দিয়েছি।

—কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

—আপনি শেখাবেন সব। ভালো ভালো জিনিস। ঈশ্বর! মাংস না খাওয়া। আমাকে যে সব শিখিয়েছেন।

—কিন্তু আমি যে শেখাব, আমি নিজেও কি ছাই সব কিছু জানি, বুঝি?

—জানেন। সব আপনি জানেন। আপনাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু যদি তোর দেশের অন্য কারো আমাকে ভালো না লাগে? যদি বন্দি করে আমাকে? মেরে ফেলে?

—কেন মারবে? কেন করবে বন্দি? আপনার সাথে কি যুদ্ধ হয়েছে যে আপনাকে বন্দি করতে হবে?

—তবু থাকা। ফ্রাইডে, তুই-ই বরং গিয়ে ঘুরে আয়।

—না, যাব না আমি। কিছুতেই যাব না। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান। আমাকে ভালোবাসেন না। আমি যাব না। কক্‌খনো না।

বলে কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। সে একেবারে শিশুর মতো কান্না। আমি হতবিহ্বল। কী করব বুঝতে পারছি না। আর ঘেন্না হচ্ছে নিজের উপর। এই মানুষকে কিনা আমি ভুল বুঝেছিলাম। মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম। হিংসে করেছিলাম অবুঝের মতো। আমার মতো পাপী অবিবেচক হয়তো আর সারা দুনিয়ায় নেই।

আসলে আমাকে ভালোবাসে ভীষণ। বুকের মধ্যে আমার জন্যে জমা আছে একরাশ দরদ। আমাকে ছেড়ে ও যে আর কোথাও যাবে না এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। দেশে যে যেতে চায় সেটাও আমার মহিমা জনসমক্ষে জাহির করার জন্যে। আমাকে ও দেশের মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে সাব্যস্ত করতে চায়। ওর ঐকান্তিক অভিলাষ, আমি হয়তো ওর দেশের মানুষের প্রভূত উন্নতি করতে পারব, তাদের অনেক ভালো জিনিস শেখাতে পারব, তাদের মঙ্গল করতে পারব। তাই আমাকে নিয়ে যেতে চায় দেশে। তাই বারবার বলে, ওরা আপনার কিচ্ছুটি করবে না। আপনাকে ভালোবাসবে। এটা ওর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আমি তো আর বাস্তবিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যেতে চাই না। আমার ইচ্ছে সেই সতেরো জনের সঙ্গে দেখা করার। তাদের সাথে যুক্তি পরামর্শ করার। কেমন করে পালাতে পারা যায় তার ফন্দি আঁটব। তবে আর দেরি কেন। ফ্রাইডে আর আমি দু'জনেরই যখন ইচ্ছের অন্তত খানিকটা মিল—তাহলে নৌকো বানাবার তোড়জোড় করি। পাকাপোক্ত নৌকো। তাতে করে দু'জন জমাব পাড়ি।

তখন শুরু হলো বৃক্ষানুসন্ধান। এবার আর আগের বারের মতো ভুলের খপ্পরে পা বাড়াচ্ছি না। জলের ধারে ধারে বিস্তর গাছ। একেবারে বলতে গেলে কিনার ঘেঁষে। কাটব সেরকমই একটা। সেখানে বসেই প্রস্তুতির কাজ সারব। তবে আর নৌকো জলে ভাসানো নিয়ে আগের বারের মতো অত ঝকমারি হবে না।

ফ্রাইডেই খুঁজে বের করল গাছ। আমার চেয়ে এ ব্যাপারে অনেক পাকা। বেশ পুরুষ্টু আকার। তবে নাম জানি না গাছের। ফেলল কেটে মাটিতে। ডাল পালা ছাঁটল। বলে পোড়াব এবার। পুড়িয়ে বানাব পানসি। আমি নিরস্ত করলাম। হাতুড়ি বাটালি কুড়ুল দিলাম এগিয়ে। দেখিয়ে দিলাম কেমন ভাবে কাটতে হয়। অমনি শিখে নিল চটপট। খাটল একটানা প্রায় একমাস। আমিও হাত লাগালাম। হলো ভারি চমৎকার। তখন তাতে হাল বসিয়ে দিলাম। জানত না হালের কথা। বুঝিয়ে দিলাম কী এর কাজ। দেখে তো ভারি আহ্লাদ। মোটমাট ঘঁষে মেজে নিপুণ করতে, প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম বসাতে লাগল আরো প্রায় পনেরো দিন। তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম জলে। অপূর্ব। কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর যাচ্ছি না। তখন কাছাকাছি একটা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখলাম।

নামালাম যখন প্রথম ঠেলতে ঠেলতে, সে কী আনন্দ ফ্রাইডের! একলাফে চড়ে বসল পানসিতে। দাঁড় বাইল, ছুটল খানিকটা হু হু বেগে—কী সাবলীল ওর দাঁড় টানবার ভঙ্গি! আর স্বচ্ছন্দ খুব। বলল, কোনো চিন্তা নেই। কোনো বাতাস পারবে না একে ডুবিয়ে ফেলতে। আমি বলে দিচ্ছি। আপনি মিলিয়ে নেবেন। তখন পানসি থামিয়ে, তৈরিই ছিল সব কিছু—মাস্তুল আর পাল খাটিয়ে দিলাম। ফ্রাইডে তো অবাক। ফুরফুর করে বইছে বাতাস আর পানসি চলেছে আপন খেয়ালে। দাঁড় বাইবার আর দরকার নেই। এরকম আবার হয় নাকি! দেখি অবাক চোখে তখনো দেখছে। তখন বুঝিয়ে দিলাম। কী আনন্দ তার!

তা বললাম যত সহজে, কাজে কিন্তু লেগেছে অনেক সময়। মাস্তুল বসানো থেকে শুরু করে পাল খাটানো, হাল জুড়ে দেওয়া, মোটমাট সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ যাকে বলে—সময় আমার লাগল মোট দুটি মাস। তখন সে একেবারে দেখবার মতো জিনিস। ডুববার আর ভয় নেই। বাতাস গ্রহণ করা থেকে শুরু করে হাল ঘুরিয়ে দিক বদল—কিছুতেই আর কমতি বলতে কিছু নেই।

কিন্তু বসালেই তো হয় না, এ সবের যথার্থ ব্যবহার জানা চাই। বুঝতে হবে কোনটা দিয়ে কী কাজ হয়। সেটা একে একে ফ্রাইডেকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিলাম। ওর তো জ্ঞান বলতে শুধু দাঁড় টেনে পানসি বাওয়া। অকূল দরিয়া কি আর ঐ জ্ঞানে চলে। অনেক কিছু লাগে যে শিখতে। অনেক ব্যাপার। তবে না পাল্লা দেওয়া যায় স্রোতের সাথে, হাওয়ার সাথে। শিখে নিল সব। একটা কম্পাসও বসিয়েছিলাম। বলতে ভুলে গেছি। শুধু সেটা নিয়েই যা গোল। কিছুতে পারি না তার কাণ্ডাকাণ্ড বোঝাতে। বুঝবার দরকারও অবিশ্যি তেমন একটা নেই। কালেভদ্রে কুয়াশা জমে এ অঞ্চলে। আকাশ মোটের উপর নির্মল। দিকভ্রম হবার কোনো কারণ নেই। আর রাতে তো সারা আকাশ তারায় তারায় ঝলমল। দিনের চেয়ে দেখি এরা রাতের আকাশ চিনতেই বেশি অভ্যস্ত। তখন আমি আর কম্পাস-শিক্ষা নিয়ে জোর জবরদস্তি করলাম না।

সাতাশ বছর চলছে এটার। আমার বন্দিদশার দীর্ঘ সাতাশ বছর। কীভাবে যে কেটে যায় সময়! ফ্রাইডেকে পেয়েছি তিনবছর আগে। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেমন হু হু করে পার হয়ে গেল। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। তবু যাহোক ওকে পেয়ে অব্দি আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছু সাড়া পড়েছে। গল্প করার লোক পেয়েছি। নানান পরিকল্পনা করতে পারি দু'জনে বসে। কাজও করি এখন চার হাতে। তাতে চটপট যেকোনো বড় বড় কাজও হয়ে যায়। তবে এতকিছুর মধ্যেও কিন্তু ভুলি নি আমার দ্বীপে আসার সেই প্রথম দিনটির কথা। এখনো ফি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর এলে উপবাস করি, সারাদিন তন্ময় থাকি ঈশ্বরের আরাধনায়। এদিন আমাকে দিয়ে যে বিশেষ কোনো কাজ হবে না এটা ফ্রাইডে আজকাল ভালোমতোই বুঝে গেছে। আমাকে সেদিন আর ঘাঁটায় না বেশি। কত যে ধন্যবাদ দিই ঈশ্বরকে সেদিন! হিসেবে মাপা যায় না। আর কেবলই মনে হয়, আমার মুক্তির দিন বোধহয় সমাগত। আর বেশিদিন এই নির্জনে নিরালায় একটেরে হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। একটা কিছু অদ্ভুত ঘটনা দ্রুত ঘটবে। আমি নিশ্চিত সে ব্যাপারে। কিন্তু কি সেই ঘটনা—বিস্তর ভেবেও তার কোনো হদিশ করতে পারি না।

দেখতে দেখতে বর্ষা এলো। আমার পক্ষে বড় করুণ বড় দুঃখের সেই ঋতু। মোটে সহ্য হয় না মেঘ ধোওয়া জল। বাইরে তো বের হতে পারব না এই দুমাস। তাই আগে ভাগেই যা করার করে ফেললাম। পানসি এনে রাখলাম বাড়ির কাছের সেই নালায়। ফ্রাইডে আর আমি দু'জনে মিলে ছোট একটা খাঁড়ি মতো খুঁড়ে ফেললাম। যাতে জলের তোড়ে নাও না ভেসে যায়। বাঁধ মতো দিলাম এক ধারে। বাইরের জল যাতে ঢুকতে না পারে। অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের সব বন্দোবস্তই পাকা। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত জলে যাতে কাঠ না পচে যায় তার জন্যে ওপরে তুললাম ছোট্ট এক ফালি চালা। তাতে দিলাম যাবতীয় খড় আর ডালপালার ছাউনি। ব্যস, আর চিন্তা কীসের! থাক এইভাবে পড়ে দুটো মাস। বর্ষা কমুক। তারপর নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে অভিযানে নামা যাবে। মোটমাট একটা না একটা কিছু এবার করবই।

দেখতে দেখতে নভেম্বর সমাগত। বৃষ্টি বাদল নেই। আবহাওয়া সর্বদাই পরিষ্কার। এবার যাত্রা হবে শুরু। ভিতরে ভিতরে তারই তোড়জোড় চলছে। দরকার যে অনেক জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাবার। জল থেকে শুরু করে খাবার দাবার—সে অঢেল আর কি। যোগাড় করছি তাই একে একে। ইচ্ছে আছে দিন পনেরো পরে ভেসে পড়ব দরিয়ায়। মোটমাট যাত্রার ব্যাপার নিয়ে ভারি ব্যস্ত আমি। দৈনন্দিন আহার্য অন্বেষণে সেদিন সকালে আর বেরুনো হয়ে ওঠে নি। ফ্রাইডেকে বললাম, যা তো একবার, দেখ দেখি নিদেনপক্ষে একটা কাছিম জোটাতে পারিস কিনা। হপ্তায় একদিন আমরা কাছিমের ডিম খাই। নিয়মরক্ষার খাতিরে তো বটেই, অধিকন্তু বেরুতে পারি নি আজ, সেই কারণে ওকে কাছিমের খোঁজ করতে বললাম। চলে গেল ফ্রাইডে। আমি গোছ গাছের কাজ করছি আপন মনে, হঠাৎ শুনি ফ্রাইডের পরিত্রাহি ডাক—মালিক, মালিক! সর্বনাশ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন। হা ঈশ্বর, কী করি এখন! তখন বাইরে এলাম। বললাম কীরে, এমন হাঁক ডাক করছিস কেন? কী হয়েছে? বলল, ঐ দেখুন। আপনার দুরবিনটা চোখে লাগান। ছটা মোট নাও। এক, দুই, তিন। আরো এক দুই তিন। কূলে এসে ঠেকল সবে। আমি অমনি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। হায় হায়, এখন কী হবে!

সান্ত্বনা দিলাম। মনে সাহস যোগালাম। ভয় পেয়ে গেছে যে ভীষণ। নিজের জন্যে ভয়। ওর ধারণা, ওর খোঁজেই এসেছে ওর দেশের মানুষ। দলে ভারি হয়ে এসেছে। তাহলে আর কীভাবে বাঁচবে! এবার তো ধরার সঙ্গে সঙ্গে খতম। তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে খাবে। আমিও কি রেহাই পাব? অতগুলো মানুষের বিরুদ্ধে পারব কি লড়াই করতে! আমি তো কোন ছাড়, স্বয়ং দেশের সেনাপতি এলেও পারবে না। তাহলে উপায়?

বললাম ধৈর্য ধরতে। চঞ্চল হলে কি আর কিছু ঠিক করে ভাবনা চিন্তা করা যায়! তবে একটা কথা, তুমি যে অবস্থাতে থাক না কেন, লড়াই তোমাকে করতে হবেই। সে পঞ্চাশ জন হোক কি দুশ। কীসের পরোয়া! মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন যেকোনো ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন দেখা দিলে নিতে হবে বৈকি। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউ কি বলতে পারে কীরকম ভাবে কী করলে আত্মরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

বললাম, দেখ ফ্রাইডে, তোকে কিন্তু দরকার হলে গুলি চালাতে হবে। অন্তত জান না নিতে পারিস, গুলির শব্দে ভয় ধরিয়ে দিতে হবে। কী পারবি তো? বলল, আমি চালাব গুলি! তাহলেই হয়েছে। আপনি আর লোক পেলেন না। বললাম, ওকথা আমি একেবারে শুনতে চাই না। গুলি তোকেই চালাতে হবে, প্রয়োজনবোধে দুটো একটা মানুষও মারতে হবে। তার আগে এখন এক বোতল আরক খেয়ে নে।

আরক অর্থে দ্বিতীয় জাহাজ থেকে আনা সেই পেটি বোঝাই মদ। কয়েকটা এনে রেখে দিয়েছি বাড়িতে। বাকি সব সেই লুকোনো গুহায় রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখি বেশ চনমনে ভাব। খুব সাহস তখন মনে। দুটো পিস্তল দিলাম তখন ওর হাতে। আর একটা বন্দুক। আমার সঙ্গে তো যা থাকার আছেই। একটা কুড়ুলও দিলাম।

উঠলাম গিয়ে পাহাড়ের মাথায়। দুরবিনে চোখ রাখলাম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সকলকে। একুশ জন বর্বর। সঙ্গে তিন বন্দি। এক এক পানসিতে এক এক জন। হাত পা বাঁধা। ফেলে রেখেছে উপুড় করে। আর খুব যেন খুশি খুশি ভাব। যেন উৎসবের মেজাজ বর্বর দলের মধ্যে। তুমুল হট্টগোল। শব্দ এতদূর পৌঁছয় না, তবে হাত পা নাড়া দেখে অনুমান করা যায়।

নেমেছে এবার একটু এগিয়ে এদিকে। আমাদের নালাটার কাছাকাছি। কূল এখানে ঢালু হতে হতে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। একধারে ঘন জঙ্গল। এমনই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল

মন! গা ঘিন ঘিন যাকে বলে। এইখানে আমার চোখের গোড়ায় ওরা করবে নরহত্যা! আমি বসে বসে দেখব! একটা নয়, তিন তিনটে মানুষ।—না না, এ অসহ্য! বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে হৃদয়। একটা হেস্তনেস্ত আজ করতেই হবে।

পাহাড় থেকে নেমে ফ্রাইডেকে বললাম, চল, আজ ওদের হত্যা করব। খুনের রক্তে হাত রাঙাব। আমি এ আর সহ্য করতে পারছি না।

ফ্রাইডে বলল, চলুন। আমারো কষ্ট হচ্ছে। এর শোধ তুলতে হবে। যদি মরতে হয় মরব চলুন।

তখন অস্ত্রগুলো দু'জনের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলাম। একটা পিস্তল দিলাম ফ্রাইডেকে, আর তিনটে বন্দুক। আমিও নিলাম তাই। মদের একটা পাত্র নিলাম সাথে। ফ্রাইডের কাঁধে দিলাম মস্ত একটা ঝোলা। তাতে বারুদ, গুলি, সীসের ছররা—সব মজুত। ফ্রাইডের উপর নির্দেশ, যেন আমাকে অনুসরণ করে। কখনো আমাকে ডিঙিয়ে যেন আগে না চলে যায়। আমি না বললে যেন গুলি না চালায়। ফ্রাইডে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, কী মনে হতে কম্পাসটাও নিয়েছি সাথে। আর জলের বোতল। তারপর ঈশ্বরের নাম করে রওনা হলাম।

চলেছি জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে—সন্তর্পণে, যাতে আমাদের ওরা না দেখতে পায়। ভীষণ রাগ তখন শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। টগবগ করে ফুটছে রক্ত। পুরানো চিন্তাটাও মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাইতো, হত্যার প্রতিশোধ তুলতে চলেছি হত্যা দিয়ে। এটা কি ঠিক? কোনো পাপ নেই তো এর মধ্যে? ওরা কি জ্ঞানত কোনো পাপ করছে? হয়তো না। কিন্তু অমানুষিক এই নরহত্যা, এটাও তো ঠিক নয়। বসে বসে তো আর দেখা যায় না। প্রতিবাদ একটা না একটা করা উচিত। তা বলে এই ধরনের প্রতিবাদ? এটাই এক্ষেত্রে সঠিক। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। স্বাভাবিক নিয়মে এদের যদি বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে যাই, তাহলে ওরা মানবে না। যদি ছিনিয়ে আনতে চাই বন্দিদের, তবে যুদ্ধ লাগবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরই প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। আধুনিক কোনো অস্ত্র ওদের সাথে নেই ঠিকই, কিন্তু তীর ধনুক তো আছে। নিপুণ ওরা শরক্ষেপণে। সুতরাং অস্ত্র আমাকে এক্ষেত্রে ধরতেই হচ্ছে। হত্যা করব অহেতুক নয়। হত্যা করার মধ্য দিয়ে তিন জন বন্দির জীবন রক্ষা করব। সেটা পাপ নয়। এক্ষেত্রে সেটাই মহা পুণ্যের কাজ।

নিঃশব্দে চলেছি। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিটুকু অব্দি না ওঠে, সেদিকে আমাদের নজর। ফ্রাইডে চলেছে আমার পিছন পিছন। একেবারে শেষ মাথায় এসে থামলাম। ফ্রাইডেকে বললাম, ঐ গাছে উঠে দেখ দেখি, স্পষ্টভাবে ওদের দেখা যায় কিনা। উঠল গাছে। ফিরে এল একটু পরেই। বলল, দেখা যায়। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে মাংস খাচ্ছে। একজন বন্দিকে ইতোমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। ওরই দেশের লোক এরা। দুই বন্দির মধ্যে একজন সাদা চামড়া মানুষ। এবার সম্ভবত তার পালা।

তখন লাফ দিয়ে উঠলাম। দেখি সত্যিই তাই। সাদা চামড়ারই বটে। পরনে পোশাক। হাত পা বাঁধা দাঁড় করিয়ে দেখেছে সেইভাবে একধারে। ভোজন পর্ব চলছে। আরেক বন্দি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মুখ দেখার উপায় নেই। হাত পা বাঁধা অবস্থায় উপুড় করে শুইয়ে রেখেছে তাকে নৌকোর খোলে। তখন গাছ থেমে নেমে পড়লাম।

সময় হাতে খুব কম। ইশারা করলাম ফ্রাইডেকে। ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা অঞ্চল। অদূরে মস্ত এক গাছ। সেটা ওরা যেখানে বসে আছে তার থেকে পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরে। মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে অতিক্রম করলাম দূরত্বটুকু। এগিয়ে গেলাম। সামনে বড় বড় ঝোপ। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। বুকে তখন হাতুড়ি পিটছে আমার।

এগিয়ে গেছে একদল ইউরোপীয় বন্দিটির দিকে। বন্দুক মাটিতে রেখে নিশানা ঠিক করলাম। ফ্রাইডেকে বললাম, আমি যা করব তুইও তাই করবি। খবরদার, ভুল যেন না হয়। ফ্রাইডেও দেখাদেখি বন্দুক নামাল। নিশানা করল। বললাম, এবার গুলি কর।

আমিও টিপেছি ঘোড়া। ছুটে গেল এক সাথে এক ঝাঁক ছররা। ফ্রাইডের নিশানা নির্ভুল। দেখি দলের মধ্যে দু'জন এক সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালির উপর, অর্থাৎ খতম। বাকি তিন জন ছিটকে গেল তিনদিকে। তারাও অল্প বিস্তর জখম। এদিকে গুলির শব্দে চমকে উঠেছে অন্যান্যরা। ভয় পেয়ে গেছে। ত্রাস যাকে বলে। কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। দ্বিতীয় বন্দুক তখন নামালাম। নিশানা করলাম। দেখাদেখি ফ্রাইডেও। এবার হতবিহ্বল মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে নিশানা। বললাম, চালাও গুলি। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম। অর্থাৎ আমিও ছুড়েছি। ছিটকে পড়ল এবারও দু'জন। আহতের সংখ্যা আগেরবারের তুলনায় এবার বেশি। আর সে কী চিৎকার! ছুটছে চিৎকার করতে করতে বালির উপর দিয়ে। দরদর করে গা দিয়ে ঝরছে রক্ত। তখন ফ্রাইডেকে বললাম, চল এবার দেখা দিই।

বেরিয়ে এলাম ঝোপের আড়াল থেকে। ফ্রাইডে ধাওয়া করল আহতদের। আমি গেলাম বন্দির কাছে। বালির উপর পড়ে আছে বেচারি। হতবিহ্বল ভাব। দেখি চার জন এরই মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে নৌকায় উঠেছে। ফ্রাইডেকে বললাম, গুলি কর। ছুটে এল একঝাঁক গুলি। ছিটকে পড়ল দু'জন জলের মধ্যে। দু'জন ভীষণভাবে জখম। দেখি সেই অবস্থাতেই চেষ্টা করছে পালাতে। ফের গুলি। মারা পড়ল আরো একজন। চতুর্থ ব্যক্তি নৌকোর খোলে শুয়ে কাৎরাতে লাগল।

ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে দিলাম বন্দির। ওঠালাম হাত ধরে। পর্তুগিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম তার পরিচয়। জানে না সে ভাষা। ল্যাটিনে বলল সে খ্রিস্টান। তেমন দুর্বল নয় বা মূর্ছাও যায় নি। শুধু ঘাবড়ে গেছে ঘটনার পরম্পরায় এই যা। তখন বোতল খুলে দিলাম গলায় ঢেলে পানীয়। একটু চাঙ্গা হলো। সঙ্গে রুটি ছিল। দিলাম দুখানা। খেল গোগ্রাসে। আহারে বেচারা, কতদিন বন্দি অবস্থায় ফেলে রেখেছে এইভাবে কে জানে। দেশের নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল স্পেন। আর সে কী শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ঘটা! আমি তার জীবনদাতা। কোনোদিন ভুলবে না আমার ঋণ। তখন যেটুকু জানি ওদের ভাষা, তাইতে বললাম, এখন আর অন্য কোনো কথা নয়। বিপদ এখনো কাটে নি। লড়তে হবে। এই নিন অস্ত্র। বলে পিস্তল দিলাম, আর সঙ্গে তরবারি। হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যা তেজ! উঠল তড়াক করে লাফিয়ে। ছুটে গেল আহত বর্বরদের দিকে, এক কোপে চোখের নিমেষে কেটে ফেলল একজনের মাথা। গুলি ছুড়ল। তাতেও মারা পড়ল দু'জন। তখন আর পালাতে কেউ পথ পায় না। তিন জন যে আমরা তখন এক দলে! তিন জনের হাতেই অস্ত্র। ওরা তো অস্ত্রহীন।

আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এখানে আসা অব্দি একটাও গুলি ছুড়ি নি। হাতে আছে বন্দুক। তাতে গুলি তৈরি। শুধু ঘোড়া টিপে ছুটিয়ে দেবার অপেক্ষা। ফ্রাইডেকে বললাম, যা তো চট করে ঝোপের আড়াল থেকে বাকি বন্দুক কটা নিয়ে আয়। ছুটল ফ্রাইডে সঙ্গে সঙ্গে। নিয়ে এল। ওর আমার দু'জনেরটাই। গুলি ভরলাম সে গুলোয় নতুন করে। ভরছি গুলি, হঠাৎ দেখি সদ্য মুক্ত বন্দির সঙ্গে ভীষণ লড়াই লেগেছে এক বর্বরের। হাতে তার কাঠের খড়্গ। আর কী তেজ মানুষটার! দু দুবার দেখলাম তরবারির আঘাত গিয়ে পড়ল

মাথায়, কেটে গেল এই এতখানি, তবু দমে না। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নতুন উদ্যমে। পারে কি আর বন্দি তার সঙ্গে। তেমন শক্তি কি তার আছে। দেখি ফেলে দিয়েছে বালির উপর, হুঙ্কার দিয়ে আসছে সে ছুটে উদ্যত খড়্গ হাতে, অমনি পিস্তল গর্জে উঠল। লাগল ঠিক বুকের মাঝখানে। আর্ত চিৎকার করে মাটিতে টাল খেয়ে পড়ল। সেই শেষ আর উঠল না।

আর ফ্রাইডেকে যেন পেয়ে বসেছে নেশায়। হাতে অস্ত্র বলতে এখন শুধু কুড়ুল। তাই দিয়ে সে যা যুদ্ধ! তাড়া করতে করতে নিয়ে যায় একেকটাকে শেষ সীমায়, তখন আর পালাতে পারে না, তাছাড়া দৌড়েও তো ভীষণ পটু। পারবে কে দৌড়ে ফ্রাইডের সাথে। মুহূর্তে ধরে ফেলে পলায়মান ব্যক্তিটিকে। তারপর দু দশবার কুড়ুলের এলোপাথাড়ি ঘা। সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মৃত্যু। তিন জন দেখলাম তাড়া খেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রাইডেও পড়ল ঝাঁপিয়ে। তারপর জলের মধ্যেই একের পর এক কোপ। লাল হয়ে গেল জলের রং।

ছিল মোট একুশ জন। পরে যদিও এই হিসেব আমরা করেছি তবু এখানে আগে বলে দিই।

ঝোপের আড়াল থেকে ছোড়া বন্দুকের গুলিতে নিহত	৩
দ্বিতীয় দফার গুলিতে নিহত	২
নৌকোর মধ্যে ফ্রাইডের গুলিতে নিহত	২
প্রথম বারের আঘাতে জখম, পরে নিহত	২
প্রথম বারের আঘাতে জখম, পরে জঙ্গলে গিয়ে মারা গেছে	১
ইউরোপীয় বন্দির হাতে হত	৩
ফ্রাইডে তাড়া করে মেরেছে	৪
	মোট ১৭

বাকি চার জন এক ফাঁকে পানসিতে চড়ে দে চম্পট। খেয়াল করি নি আগে। হঠাৎ নজর পড়তে ফ্রাইডে গেল তেড়ে। গুলি করল। তিন জন চোখের সামনে পড়ল জলে।

ওঠার আর নাম নেই। অর্থাৎ খতম। বাকি একজনকে কিছুতে কায়দা করা গেল না। ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে। গুলি ছুড়লে অতদূর গিয়ে পৌঁছবে না। ফ্রাইডে বলল, চলুন আমরাও নৌকো নিয়ে তাড়া করি। উঠলাম লাফ দিয়ে নৌকায়। দেখি তৃতীয় বন্দিটি উপুর হয়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে। হাত পা বাঁধা। এতক্ষণ ওর কথা আমাদের খেয়াল হয় নি। তখন তাড়াতাড়ি হাত পায়ের বাঁধন কাটলাম। ভীষণ দুর্বল শরীর। আর অসুস্থ। হয়তো গুলি গোলার শব্দে বেদম ঘাবড়ে গেছে। ধুকপুক করছে প্রাণটুকু। তাড়া করে ধেয়ে যাওয়া আর হলো না। ততক্ষণে সে অনেক দূর। ভারি চিন্তা হচ্ছে। যদি দেশে ফিরে গিয়ে নিয়ে আসে দলবল! যদি আমাদের আক্রমণ করে! ফ্রাইডে তখনো যাবার জন্য বদ্ধপরিকর। আমি নিরস্ত করলাম।

তখন নজর গেল বন্দির দিকে। পর মুহূর্তে দেখি অবাক কাণ্ড, ঝুঁকে পড়েছে ফ্রাইডে তার মুখের উপর। আর কী কান্না, কী আনন্দ! বন্দিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে নৌকোর উপরই দেখি তা থৈ তা থৈ নাচ। পরক্ষণে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনল নৌকো থেকে। চিৎকার করে আমাকে ডাকল। কাছে গেলাম। বলল, এই দেখুন, আমার বাবা। আমার বাবা! আমি আমার বাবাকে পেয়েছি! এই দেখুন এখনো বেঁচে আছে।

ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিলাম গাছের ছায়ায়। পানীয় দিলাম। বড় দুর্বল শরীর। তখন ঝড় উঠেছে। সোঁ সোঁ হাওয়া বেগ। ভাগ্য ভালো নৌকো নিয়ে তাড়া করি নি। সমুদ্রের জল উঠেছে ফুঁসে। বললাম, ফ্রাইডে, পানসি দুটো ডাঙ্গায় তুলে রাখি চল। নইলে ভেসে যাবে। তখন তুলে রাখলাম। ঝড় আরো বেড়েছে। সঙ্গে ঢেউ। আমি নিশ্চিত সে নৌকো নিয়ে পারবে না দেশে ফিরে যেতে। ঝড়ের কবলে পড়তে বাধ্য। সে অবস্থায় সলিল সমাধি ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

ফ্রাইডের আর তখন অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। কী যে করবে বাবাকে নিয়ে বুঝে উঠতে পারছ না। ডাকলাম কাছে। হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল। বললাম, বাবাকে কিছু খেতে দিয়েছিস? রুটি টুটি? মাথা নাড়ল দুধারে। বলল, নেই কিছু। তখন ঝোলা থেকে বের করে একখানা রুটি দিলাম। এই একটিই আমার সম্বল। কিসমিস দিলাম একমুঠো আর জল। নিয়ে গেল বাবার কাছে। দিল। দেখি একটু পরে ছুটতে ছুটতে কোথায় চলেছে। মিনিট পনেরো তার আর পাত্তা নেই। দেখি আসছে তারপর ছুটতে ছুটতে। হাতে জলের একটা পাত্র। অর্থাৎ যেটুকু জল দিয়েছি আমি তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় নি আরো চেয়েছে। তাই ছুটে গিয়েছিল তাঁবুতে। ফিরে এল জলের পাত্র নিয়ে।

জল খেয়ে সুস্থির হলো মানুষটা। বললাম, আর কি জল আছে ফ্রাইডে? বলল, আছে।—তাহলে দে এদিকে, আমরা একটু খাই। দিল পাত্র। খেলাম আমি আর স্পেনীয়। রুটিও এনেছে ফ্রাইডে সঙ্গে করে। অবশিষ্ট কটা স্পেনীয়কে দিলাম। খেল। ভারি ক্লান্ত তখন। ঝড় ঝাপটা তো কম গেল না এতক্ষণ ধরে। এবার বিশ্রাম চাই। শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। অমনি ঘুম। কাছে গিয়ে দেখি হাত পা জায়গায় জায়গায় ফুলে উঠেছে। শক্ত বাঁধনে বাঁধা ছিল কতক্ষণ কে জানে। খানিকক্ষণ পরে ঘুম থেকে তুললাম। দিলাম, এক মুঠো কিসমিস। খুব তৃপ্তি সহকারে খেল। আর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে যেন গদগদ ভাব। কী বলে যে আমাকে ধন্যবাদ জানাবে তার আর ভাষা খুঁজে পায় না। বললাম, ওঠ এবার। এখানে থেকে আর লাভ কী। বাড়ির দিকে যাই। উঠতে আর পারে না। হাতে পায়ে জোর মোটে নেই। ক্লান্তির ভাব তখনো শরীরের ভাঁজে ভাঁজে। ফ্রাইডেও এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। টিপে দিল হাত পা। দলাই মলাই করে দিল। কত যে ভালোবাসা ওর মনে! আর কাজ করে, ফাঁকে ফাঁকে ঘাড় ঘুড়িয়ে বাবাকে দেখে। বসে আছে একইভাবে মানুষটা।

এখনো বিস্ময়ের ঘোর হয়তো কাটে নি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা, তা-ও এইভাবে এ যেন কল্পনারও অতীত। সেই কথাই বোধহয় ভাবছে এখনো। বললাম, যা ফ্রাইডে, তোর বাবার কাছে যা। অমনি এক ছুটে চলে গেল। সে যে কত খুশি! কত গল্প দু'জনের মধ্যে। আমি তো মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি। একটু পর বালির উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বাবা। ফ্রাইডে ফিরে এল। বললাম, তা হ্যাঁরে, একে যে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই। এক কাজ কর। তুই বরং ডোঙাটা নিয়ে আয়। কূলের ধার ঘেঁষে বাইতে বাইতে নদীর পথ ধরে নিয়ে গেলে চলবে। ফ্রাইডে বলল, ডোঙার দরকার নেই। পানসিতেই হবে। আমি ব্যবস্থা করছি। বলে অবলীলাক্রমে অতবড় মানুষটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বসাল পানসিতে। বাবাকেও তুলল। তারপর দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে, নাক বরাবর এগোলাম। নালার কাছে পৌঁছে দেখি পানসিও ততক্ষণে হাজির। নামানো হলো দু'জনকে। ধরাধরি করে নিয়ে চললাম বাড়ির দিকে। কিন্তু পাঁচিল কীভাবে ডিঙোই? সেটা যে আরেক সমস্যা। মই বেয়ে তো আর ধরাধরি করে উপরে নিয়ে যাওয়া যায় না। তখন ঠিক করলাম, সুস্থ না হওয়া অব্দি পাঁচিলের বাইরেই তাঁবু খাটিয়ে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করব। লেগে গেলাম ফ্রাইডে আর আমি কাজে। দুঘন্টার মধ্যে তাঁবু তৈরি। চারধারে পুঁতেছি চারটে খুঁটি। মাথায় পুরানো পাল। তার উপর কিছু শুকনো ডালপালা। যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায়। মেঝেয় বিছিয়ে দিলাম পুরু করে খড় তার উপর কম্বল। পাশাপাশি দুটো বিছানা। গায়ে দেবার জন্যেও দুটো কম্বল দিলাম। এগুলো সব আমার দীর্ঘদিনের সঞ্চয়।

মোটমাট দ্বীপ যথার্থ অর্থে এবার রাজ্যের রূপ নিতে চলেছে। একুনে প্রজা আমার তিন জন। আমি তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এরা এক অর্থে আমারই সম্পত্তি। এই দ্বীপের যেখানে যা আছে সব আমার। এমন কোনো শক্তি নেই যে আমার হাত থেকে এসব ছিনিয়ে নেয়। অর্থাৎ রাজা হিসেবে আমি প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন। সেটা আমার তিন প্রজাও বিশ্বাস করে। ভারি অনুগত তারা। তিন জনেরই জীবন রক্ষা পেয়েছে আমার দৌলতে। এটা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে এবং সে জন্য কৃতার্থও। যেকোনো মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে আমার জন্যে জীবন। ধর্মের ব্যাপারে আমি কারো ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করি না। তিন জনের ধর্ম তিন রকম। ফ্রাইডেকে বলতে পারি আধা খ্রিস্টান। তার বাবা বর্বর ধর্মাচরণে বিশ্বাসী। স্পেনীয় ধর্মমত ভিন্ন। তা নিয়ে অবশ্য নিজেদের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য টানে না। আমিও বিশেষ মাথা ঘামাই না।

ততদিনে সুস্থ হয়েছে দুই অতিথি। সর্বাঙ্গীন সুস্থ। স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটাচলা করে বেড়াতে পারে। ঠাঁই দিয়েছি তাদের ভিতরের তাঁবুতে। কিন্তু সে তো গেল শুধু বাসস্থানের সমস্যা। খাদ্য সমস্যা যে অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন। কদিন অবিশ্যি পরপর কটা ছাগল মারলাম। রাঁধল ফ্রাইডে। খেয়ে তো তারা মুগ্ধ। বিশেষ করে ফ্রাইডের বাবা। তার ছেলে যে এত ভালো রাঁধতে পারে, একথা যেন সে ভাবতেও পারে না।

ফ্রাইডেকে দিয়ে ইতোমধ্যে আরা দুটো কাজ করলাম। বন্দুক কটা পড়েছিল সমুদ্রের তীরে। আনালাম। মৃতদেহগুলো জড়ো করে দাহ করল। এটা আমি হাজার চেষ্টা করলেও পারতাম না। বীভৎস সে দৃশ্য। সার সার পড়ে আছে অতগুলো মড়া। পচন ধরতে শুরু করেছে। সে যা দুর্গন্ধ! ধারে কাছে ঘেঁষতেও আমার অনীহা। ফলে ফ্রাইডেকেই সব করতে হলো।

তা দুশ্চিন্তা কিন্তু পুরাপুরি কাটে নি। সেই যে পালাল একজন—যদি সে দলবল নিয়ে ফিরে আসে। ফ্রাইডের বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তো আর তার ভাষা বুঝি না। ফ্রাইডেকেই দিলাম দোভাষীর দায়িত্ব। বলল, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যতদূর অনুমান দেশে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, কেননা ঐ ঝড় এবং ঐ প্রবল ঢেউ অগ্রাহ্য করে সুস্থভাবে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদিবা তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় এগুলো অগ্রাহ্য করে সে ডাঙ্গায় পৌঁছেছে, তবে বাতাসের যা গতি, স্বদেশে ফেরে তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তার পানসি গিয়ে ভিড়েছে দক্ষিণের কোনো দ্বীপে এবং ডাঙ্গায় ওঠামাত্র নরখাদক হিংস্র জন্তুর মুখে পড়ে তার এতক্ষণে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। এ সবই অনুমান যদিও, তথাপি একেবারে যে ভিত্তিহীন তা নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় ভিত্তি এর নেই এবং সব রকম বাধা অগ্রাহ্য করে সে দেশে পৌঁছুতে পেরেছে, তথাপি ঐ যে আমার মনে সংশয়—সে দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, এটা অসম্ভব। ঘটনার আকস্মিকতায় সে রীতিমতো বিভ্রান্ত। সঙ্গীদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেশে গিয়ে বলবে, তারা মরেছে বজ্রাঘাতে। গুলি ছুড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে আগুনের ঝলক বের হয় সেটাকে ওরা বজ্রপাত বলেই ধরে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে হতবিহ্বল অবস্থায় এই সব কথা বলাবলি করছিল। এটা ফ্রাইডের বাবা নিজের কানে শুনেছে। ফ্রাইডে এবং আমাকে ধরে নিয়েছে স্বর্গের দেবদূত। কেননা এই দ্বীপে যে অমিত শক্তিধর কোনো মানুষ থাকতে পারে এটা তাদের কল্পনার বাইরে। ফিরে গিয়ে নির্ঘাৎ সে সেই কথাই বলবে। আর দেশের মানুষ কি এত বোকা যে দেবদূতের বিরুদ্ধে, ঝড় আর বজ্রের বিরুদ্ধে আসবে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করতে! অতএব আমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই।

মোটামুটি যুক্তি নির্ভর কথা। বেশ মনে লাগল। বাস্তবেও যাচাই করে নিলাম তার সত্যতা। এল না কেউ। রোজই সতর্ক দৃষ্টিতে চারধারে কূল জরিপ করি। দেখা মেলে না কোনো নৌকো কি কোনো মানুষের। হয়তো ধরে নিয়েছে তারা, এই দ্বীপে আসার অর্থই হলো বেনামুকির রোষ-নজরে পড়া এবং তার পরিণতি মৃত্যু। কে আর চায় যেচে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে!

স্পেনীয় অতিথির কাছে শুনলাম, লা প্লাটা থেকে চলেছিল তারা হাভানার দিকে। পথে ঝড়ের কবলে পড়ে। সবাই উদ্ধার পায় নি। মাত্র সতেরো জন নৌকায় করে উঠেছে গিয়ে ঐ দ্বীপে। মোটের উপর বর্বরদের সাথে মিলে মিশে সুখেই আছে। জাহাজে ছিল চামড়া আর রূপার পসরা। কথা ছিল মাল খালাস করে ফেরার সময় নিয়ে আসবে নানান পণ্য সামগ্রী। কিন্তু বিধি বাম। পড়তে হলো এই দুর্ভোগের মুখে।

সঙ্গে পর্তুগিজ ক'জন নাবিকও আছে। এরা তাদের জাহাজের লোক নয়, অন্য আরেক জাহাজের। সে জাহাজও বিপর্যস্ত, উদ্ধার করতে পেরেছিল তারা মাত্র এই পাঁচ জনকে। বাকি সবাই মারা গেছে। সেই পাঁচ জনকে নিয়ে মোট সতেরো জন। তারাও দ্বীপে বহাল তবিয়তে আছে।

কয়েকটা বন্দুক ছিল সাথে। থাকা না থাকা এখন সমান। কেননা বারুদ নেই। একটা টোটাও নেই। জলে ভেসে গেছে বারুদের পিপে। সামান্য যেটুকু ছিল তা বন্দুকে। তা দিয়ে অচেনা অজানা দ্বীপে প্রথম কদিন চলেছে খাদ্য অন্বেষণের প্রচেষ্টা। তারপর সব শেষ। এখন ফেলে দিলেও কিছু যায় আসে না।

বললাম, তা তোমরা পালাবার চেষ্টা কর নি? বলল করেছে চেষ্টা। তবে সবই মুখে মুখে। অর্থাৎ আলোচনা যাকে বলে। কার্যত কিছুই করা সম্ভব হয় নি। পালাবার জন্যে

নৌকো বা খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি দরকার। কোথায় পাবে সে সব। শুধু হাতে সমুদ্রে ভেসে পড়ার অর্থই হলো যেচে মৃত্যুবরণ। কেউই সেরকম কোনো প্রস্তাবে রাজি হয় নি।

বললাম, বেশ তো, আমি যদি একটা প্রস্তাব দিই। যদি সবাই মিলে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করি। বলল, আপত্তি কীসের। বলুন না কী আপনার প্রস্তাব।

বলব কি বলব না তাই নিয়ে নিজের মনেই বিস্তর দ্বিধা। আগে ঠিক করতে হবে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। ওদের সকলকে যদি এখানে আনি, পালাবার যাবতীয় সুযোগ করে দিই—তখন যদি আমাকে ফেলে ওরা পালায়! বিশ্বাসঘাতকতায় স্পেনীয়দের তো জুড়ি নেই। মোটমাট আমার কর্তৃত্ব আগাগোড়া বজায় থাকবে। এমন নয়, আমি ওদের হাতের ক্রীড়নক। ওরা আমার দয়ায় আমার সহায়তায় পালাতে পারবে এটা ওদের সদা সর্বদা মনে রাখতে হবে। তার পরেও কথা আছে। আমাকে হয়তো নিয়ে গেল স্পেনে। সেখানে আমি শুনেছি, ইংরেজ কাউকে দেখলে ওরা বলি দেয়, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। হবে না তো সেরকম? সেটাও আগে ঠিক করে নিতে হবে। যদি ওদের তরফ থেকে আশ্বাস পাই তবে আমার যা যন্ত্রপাতি আছে তাই দিয়ে সবাই মিলে তৈরি করব বজরা, সঙ্গে খাবার দাবার প্রচুর থাকবে। থাকবে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ। তখন কাজ শুধু দিনক্ষণ দেখে সবাই মিলে ভেসে পড়া। নিরাপদে কূলে যে পৌঁছুতে পারব, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওদের হয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কোনোরকম বেচাল ওরা করবে না। করবার মতো অবস্থা বা শক্তি থাকলে তো? বন্দুকের কথা তো একটু আগেই বললাম। অকেজো কতগুলো খেলনাসামগ্রী, মনোবল বলতে কিছুই আর নেই। এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে অতিকষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই বড় কথা। মনোবল সেখানে কোনো উপকারে আসে না। পালাতে পারলে এখন সবাই বাঁচে। কীভাবে পালাবে বা কার সাহায্যে সেটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। এটা ঠিক, কাউকে না কাউকে নির্ভর করে তবে পালানো সম্ভব হবে। তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাই থাকবে বরং এবং কৃতজ্ঞতা। এর কোনো ব্যত্যয় হবে না।

বলল, বেশ তো, এত কিছুর পরও যদি আপনার মনে ভরসা না জন্মায়, তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি আর ফ্রাইডের বাবা দ্বীপে ফিরে যাই। কথা বলে আসি ওদের সাথে। জবাব শুনে আসি। মানবে কি মানবে না বা আপনার সাথে কোনোরকম ছলনা করার চেষ্টা করবে কিনা সেটা স্পষ্ট বলতে বলব। শুধু বললেই হবে না, ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে হবে। সেটা যদি করে তখন এসে বলব আপনাকে তাদের মতামত। তারপর যা করণীয়, আপনি নির্দেশ দেবেন। আমি সেই মতো করব।

বলে সে নিজে আমার সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করল—কোনোদিন আমার অবমাননা করবে না, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমাকে প্রভু বলে মানবে। আমার জন্যে প্রয়োজনবোধে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পিছপা হবে না।

একই ভাষায় বাকিরাও করবে শপথ। সে বলল বড় দুঃখজনক তাদের অবস্থা। মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সৎ এবং বিশ্বাসী। কারোর মনে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই। নেই বলেই তো পড়ে আছে ঐখানে ঐ অবস্থায়। পরনের একফালি ন্যাকড়া অব্দি নেই। ক্ষুধার অন্ন নেই পেটে। সবই বর্বরদের দয়ার উপর। অত্যাচার করে না তারা ঠিক। কিন্তু করতে কতক্ষণ! একটু বেচাল করলে কি আর রক্ষে রাখবে। আমাকে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কথা দিলাম।

তখন ঠিক করলাম পাঠাব দু'জনকে দ্বীপে। ঘুরে আসুক যত দ্রুত সম্ভব। আর আমি দেরি করতে চাই না। কথাবার্তা বলে মোটামুটি সম্মতিটুকু নিয়ে আসুক। শুধু সম্মতিইবা বলি কেন, সম্ভব হলে অমনি নিয়ে আসুক নৌকোয় করে সকলকে। তারপর এখানে বসে সবাই মিলে মতলব ঠিক করা যাবে।

ঠিকঠাক যখন সব, দু চার দিনের মধ্যেই তারা রওনা দেবে—হঠাৎ বেঁকে বসল সে। কিছুতেই যাবে না। আমি যত বোঝাই যত বলি সব নিরর্থক। সেই এক গোঁ তার—যাবে না এখন, কদিন যাক। তারপর যাবে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। তলিয়ে বিচার করে দেখি, আপত্তি যে করছে, তার পিছনে কোনো রকম মতলব বা দুরভিসন্ধি নেই। আবার পরে সময় সুযোগ হলে যে যাবার কথা বলছে, সেটাও ঐকান্তিক। একটু খাদ নেই তাতে। ফলে ছ'মাস দেরি হলো। ঘটনাটা পুরো ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করি।

তা মাসখানেক তো হলো এসেছে এই দ্বীপে, মোটের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখিয়েছি এখানকার। এখানে আমি কীভাবে থাকি, কী আমার খাদ্যাখাদ্য, কীভাবে করি চাষবাস, কতটুকু আমার সঞ্চয়—কিছুই বাদ দেই নি। সেটা বর্তমানের চার জনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। দেখে শুনে নিজেই মাথা নাড়ল। বলল, না না, এ অবস্থায় আমার সাথীরা যদি আসে, তবে মুশকিল। কী করে কুলোবে? তাছাড়া এতগুলো মানুষ যে রওনা হব, সঙ্গে তো প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য নেবার দরকার হবে। সেটাই বা আসবে কোত্থেকে? বরং এক কাজ করি, এই বর্ষায় বেশি করে জমিতে চাষ দিই। তাতে ফলন প্রচুর হবে। বীজের তো আর অভাব নেই। বেশির ভাগ সঞ্চয় করব যাত্রার জন্যে। বাকিটা লাগবে খেতে। এ সবের ব্যবস্থা না করে আগে থাকতে অতগুলো মানুষকে আনলে কি অসুবিধেয় পড়তে হবে না।

কথাটা ঠিক আন্তরিকতায় এতটুকু অভাব নেই। সব দিক বিবেচনা করেই বলা। এ ব্যাপারে আমারো যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। বললাম, বেশ তো, তবে তাই হোক। আগে খাদ্যের সংস্থান করে তবে নয় যাওয়ার কথা ভাবা যাবে।

তখন চার জনে আটহাত নিয়ে লেগে পড়লাম ফসল ফলাবার কাজে। জমি আরো বাড়ালাম। কাঠের তৈরি তো সব যন্ত্রপাতি—দেখি ফ্রাইডে আর তার বাবা ভীষণ ওস্তাদ এই কাজে। এক মাসের মধ্যে জমি চষা শেষ। একসাথে জড় করলে সে মস্ত এক মাঠ। একটি আগাছা নেই। নেই একটি কাঁকর কি পাথর। শুধু ঝুরো মাটি, আর যথেষ্ট গভীর। তাতে মোট বাইশ বুশেল যব আর ষোলো ঝুড়ি ধান ছড়িয়ে দিলাম। তারপর বৃষ্টি হলো। খাই খরচা বাবদ যে দানা, তার বেশির ভাগটাই দিয়েছি বীজ শস্য হিসেবে। সঞ্চয় এখন বলতে গেলে শূন্য। তা প্রথম বর্ষার জল পেয়ে অঙ্কুর গজাল। প্রায় প্রতিটি দানা থেকেই গজিয়েছে অঙ্কুর। সে যা আনন্দ আমাদের! এখন আর কি—অপেক্ষা কেবল। অঙ্কুর থেকে চারা হবে, তাতে ফল ধরবে, পাকবে। সে কি দু চার দিনের কাজ!

চুপচাপ বসে থেকে তো আর লাভ নেই, বজরা বানাতে হবে। সেটা একটা মস্ত বড় ব্যাপার। দলবল মিলে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আর ভয় কীসের আমাদের! দলে রীতিমতো ভারি। অস্ত্র আছে সর্বদা হাতের নাগালে; যদি একান্তই আসে বর্বরের দল—ঠেকাব প্রাণপণে, লড়াই করব। সেই মন নিয়েই যত্রতত্র স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে গাছ দেখলাম পরপর বেশ কয়েকটা। খুব মোটা। ফ্রাইডে আর তার বাবাকে দেখালাম, বললাম, কাট এর যেকোনো একটা। কাটা শুরু হলো। অচিরেই মস্ত গাছ

পপাতধরণীতলে। স্পেনীয়কে বললাম ওদের কাজ দেখাশুনা করতে, দরকার মতো প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে। অবশ্য তার দরকার বিশেষ নেই। ওরা দু'জন একাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দেখতে না দেখতে চিরে ফেলল গাছ করাত দিয়ে। বের হলো বিশাল আকৃতির তক্তা। এক একখানা প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা, দু ফুট চওড়া আর সোয়া দু ফুট মতো পুরু। তাই দিয়ে তখন বজরা তৈরির কাজ শুরু হলো।

এদিকে আমিও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। খামার নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছি। সংখ্যা বাড়াতে হবে। একদিন ফাঁদ পেতে নতুন কটাকে ধরলাম। বেশির ভাগই বাচ্চা। ছানা পোষাই এখন আমাদের দরকার। বড় হবে দ্রুত। গায়ে গতরে যথেষ্ট মাংস হবে। মাংসটা যে এখন খুব প্রয়োজন। পাশাপাশি আঙুর শুকিয়ে কিসমিস করার কাজও চলছে। ইতোমধ্যে আশি পিপের মতো শুকিয়ে রেখেছি। আরো দরকার। সঠিক ভাবে কতটা লাগবে আমাদের সে কি ছাই জানি! যাই করি না কেন মনে হয়, কম পড়ে যাবে। তখন তড়িঘড়ি যাতে কম না পড়ে তার ব্যবস্থা করি।

দেখতে দেখতে ফসল কাটার সময় এসে গেল। যব ধান দুইই পেকেছে। কাটতে হবে এবার। আট হাতে ফের একসাথে লেগে গেলাম। তারপর ঝাড়াই মাড়াই। ওস্তাদ মানুষ বটে ফ্রাইডের বাবা। কী নিপুণ যে হাতের কাজ। ঝাড়াই মাড়াই সে-ই বলতে গেলে করল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলাম। তা সব মিলিয়ে বাইশ বুশেলের মতো যব, আর সেই পরিমাণ চাল। চিন্তা কীসের। আসুক না ওরা ষোলো জন। দুবেলা পেট পুরে খাওয়াবার এখন হিম্মৎ রাখি। তারপরেও যথেষ্ট মজুত থাকবে। সেটা হবে আমাদের যাত্রার অন্যতম রসদ।

কিন্তু নেব কীসে করে, সেটাও এক সমস্যা। ঝুড়ি যা ছিল তাতে এখন আর কুলোবে না। তখন নতুন করে ঝুড়ি বোনার পালা। এ ব্যাপারে দেখলাম স্পেনীয় ভারি ওস্তাদ। টকাটক বানিয়ে ফেলল বেশ কটা ঝুড়ি। তাতে ফসল তুলে রেখে দিলাম।

এবং আর দেরি করা ঠিক নয়, এবার রওনা হতে হবে। স্পেনীয় আর ফ্রাইডের বাবা যাবে দ্বীপে। আমি আর ফ্রাইডে এখানে থাকব। শুভক্ষণ দেখে রওনা হলো। যাবার আগে মনে করিয়ে দিলাম কী কী শর্ত, কোন কোন ব্যাপারে তাকে শপথ আদায় করে আনতে হবে। দেখলাম মনে আছে সব হুবহু। একটা কথা শুধু যোগ করে দিলাম। বললাম, এই যে প্রতিশ্রুতি ওরা দেবে, সেটা কিন্তু লিখিতভাবে দেওয়া চাই। কলম কাগজ আমি যোগাড় করে দেব। তাতে রাজি হলো। তখন রওনা হতে অনুমতি দিলাম।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। ঝকঝক করছে রোদ। সমুদ্র শান্ত। কুয়াশার লেশ মাত্র নেই কোনোখানে। উঠে বসল দু'জন। সেই পানসিতে যাতে করে বন্দি অবস্থায় এসেছিল ওরা দ্বীপে। আমরা হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। চলে গেছে যখন অনেকটা দূর, তখন হঠাৎ খেয়াল হলো—এই যা, কবে নাগাদ ফিরবে সেটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না।

সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি নানান জিনিস। একটা করে বন্দুক দু'জনের হাতে, সেই সাথে বারুদ আর ছররা। বলা আছে প্রচণ্ড প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন ভুলেও বন্দুকের সাহায্য না নেয়। মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এই বন্দুক। একে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে।

বিস্তর খাদ্যদ্রব্যও তুলে দিয়েছি সাথে। রুটি, হাতে গড়া কেক, ঝুড়ি বোঝাই কিসমিস—আরো কত কী। সারা দ্বীপের লোককে প্রয়োজন বোধে কিসমিস বিলোতে

পারবে। চাই কি রুটিও। মোটমাট আয়োজনে কোনো ত্রুটি নাই। বলা আছে, ফেরার সময় একটু আগে থেকে বন্দুক ছুড়ে আমাদের যেন জানান দেয় তারা ফিরছে।

সেটা অক্টোবর মাস। তারিখ সঠিকভাবে কত আমি বলতে পারব না। তারিখের হিসেব তো আজকাল আর রাখি না। সেই গোলমাল হয়ে যাবার পর থেকে। শুধু মাসের হিসেবটা আকাশ দেখে বুঝতে পারি। সেই সাথে ক বছর কাটল আমার দ্বীপে সেটাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

আটটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই আট দিনে কত যে পরিকল্পনা আমার! কত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা। কী হয় কে জানে। কী সংবাদ নিয়ে আসে ওরা তারই বা ঠিক কী। যদি রাজি না হয় বাকি নাকিকের দল! যদি আমার চোখের আড়ালে কোনো ঘোঁট পাকায়! আবার এমনও হতে পারে। দ্বীপে যাওয়া মাত্র ফের ওদের বন্দি করা হলো। তারপর মুলুক সন্ধান জেনে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ প্রতিশোধ নেবে বলে এল এখানে! তখন উপায়? কীভাবে আত্মরক্ষা করব তাদের রোষের হাত থেকে? বন্দুকে কি আর তখন কাজ হবে?

জানি না এমনধারা হয়তো আরো কত কী ভাবতাম। কোথায় কোন সুদূরে ভাসিয়ে দিতাম আমার কল্পনার ভেলা। হঠাৎ ন দিনের দিন। ভোর তখন। ঘুমে তলিয়ে আছি আমি গুহার বিছানায়। ফ্রাইডের ডাকে এক লাফে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম।

—মালিক, মালিক, ওরা এসেছে। শিগগির উঠুন! বুকে তো আমার পড়ছে হাতুড়ির ঘা। ভীষণ উদ্বেগ। অমনি হুড়মুড়িয়ে উঠলাম গিয়ে পাহাড়ের মাথায়। সঙ্গে যে অস্ত্র আনব তাড়াহুড়োর মাথায় সেটাও মনে নেই। দুরবিন নেই। তবে খালি চোখেই সব নজরে পড়ছে। কূল থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নৌকো—কোনো জাহাজেরই নৌকো বলে অনুমান হয়—কূলের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। তাতে অনেক যাত্রী। বেশির ভাগই নাবিক। খুব ভালো করে দেখলাম। কই চেনা তো লাগছে না কাউকে! সেই স্পেনীয় কোথায়! কোথায় ফ্রাইডের বাবা। তাছাড়া এদের পোশাক আশাক ধোপদুরস্ত। এরা কারা তবে?

ফ্রাইডেকে বললাম, নড়াচড়া করিস নে। আগে দেখে নি ওরা আমাদের বন্ধু না শত্রু। তারপর কী করব ঠিক করা যাবে।

বলে চুপিসাড়ে পাহাড়ের আড়াল দিয়ে নেমে নিয়ে এলাম দুরবিন। উঠলাম সবচেয়ে উঁচু স্থানে। পরিষ্কার দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। দেখি দূরে একখানা জাহাজ। নোঙর ফেলা। কূল থেকে প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে। ধরন দেখে মনে হয় আমারই দেশের জাহাজ। এমনকি নৌকোর নাবিকরাও ইংরেজ।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব। আর মনের গভীরে খুশির ঝিলিক। তবে কি মুক্তি এবার আসন্ন! আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছে আমারই দেশের মানুষ! ইচ্ছে হয়, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি জলে, সাঁতার কেটে চলে যাই ওদের নৌকোর কাছে। আমার পরিচয় দিই। ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি দ্বীপে। কিন্তু না, এত ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই। ধৈর্য এখানে অসম্ভব প্রয়োজনীয়। আর প্রতীক্ষা। দীর্ঘ সাতাশ বছরের নির্জনতা আমাকে এই দুটি বিশেষ গুণ শিখিয়েছে। আগে বুঝতে হবে সব কিছু। দেখার এখনো অনেক বাকি। অনুধাবন করতে হবে। তবে না উচ্ছ্বাস! তবে না ছুটে যাওয়া কি জলে ঝাঁপ খেয়ে পড়া!

তবু কেন জানি না, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা বিপদের সঙ্কেতও টের পাচ্ছি। এটা সকলেরই হয়। এ হলো নিছক অনুভূতির ব্যাপার। আচ্ছা, এরা তো হত্যাকারীও হতে পারে, কিংবা দস্যু! আসছে হয়তো দ্বীপে তেমনই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। কিংবা হয়তো এমনও হতে পারে, আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে নতুন কোনো দেশ। এসে পড়েছে এখানে। সেক্ষেত্রে এই নির্জন নিরালা পরিবেশে আমাকে হঠাৎ দেখলে পারবে তো সহজ ভাবে নিতে? অবাক হবে না বা ঘাবড়ে যাবে না? আমাকে ভয়ে বিস্ময়ে হত্যা করার চেষ্টা করবে না তো?

যদি তেমন কিছু ঘটে, তবে আমি অসহায়। সামনে আমার গভীর সংকট। এ অবস্থায় আগে কখনো পড়ি নি। এরা শিক্ষিত। এরা অস্ত্রধারী। সভ্য দুনিয়া থেকে এসেছে। পারব কীভাবে আমরা কটা পাখি মারা বন্দুক আর বারুদের পসরা নিয়ে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে?

নৌকো এসে কূলে লাগাল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভাগ্য ভালো, বেশি দূর এগোল না। বালির উপর তুলে রাখল নৌকো। নামল। আমি যেখানে তার থেকে প্রায় আধ মাইল দূর। নালাটা নজরে পড়ে নি। জানি না, তবে হয়তো নালা দিয়ে সরাসরি ঢুকিয়ে দিত নৌকো। নামত আমার আস্তানার কাছে। দেখতে পেত পাঁচিল। গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করত। সেই সাথে আমার অস্তিত্বও। তারপর আর কি? নির্বিচারে লুটপাট। গুলি গোলা। আমি কি এঁটে উঠতে পারব ওদের চালাকির সঙ্গে?

তবে ইংরেজ সবাই নয়, দু'জন সম্ভবত ওলন্দাজ। সম্ভবত এই কারণে বলছি কেননা আমার দুরবিনে মুখের আদল সেরকমই লাগছে। মোট এগারো জন। তিন জন বাদে সকলেরই হাতে অস্ত্র। অর্থাৎ বন্দুক। নৌকো থামার সাথে সাথে চার জন নামল কূলে লাফ দিয়ে। অস্ত্রহীন তিন জনকে হ্যাঁচকা টান মেরে নামাল। তবে কি বন্দি এরা? প্রশ্নটা হঠাৎ মনের গভীরে ঝিলিক দিয়ে উঠল। এখনি কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আগে দেখার প্রয়োজন আছে। ঐতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। থমথমে মুখের ভাব একজনের। যেন কত না বিষণ্ন।

কাতর অনুরোধ জানিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। শুনছে না অস্ত্রধারীর দল। বাকি দু'জন উর্ধ্বে তুলে ধরেছে হাত। যেন ঈশ্বরের কাছে করুণ প্রার্থনা।—প্রভু, তুমি এর বিচার করো! কিন্তু কীসের বিচার? তবে কি ওরা ওদের হত্যা করবে?

চমক ভাঙল ফ্রাইডের প্রশ্নে। অবাক হয়ে গেছে সে-ও। চোখে মুখে বিস্ময় বিমূঢ় ভাব। বলল, মালিক, ইংরেজরাও কি আমার দেশের মানুষদের মতো মানুষের মাংস খায়? রীতিমতো চমকে উঠলাম। বললাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন করার অর্থ? বলল, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। ঐ তিন জনকে ওরা খাবে।

বললাম, খাবে না। ওরা ওদের হত্যা করবে।

তখনো মনের মধ্যে আমার দ্বিধা দোদুল্যতা। এদের উদ্দেশ্য আমার অনুমানের বাইরে। তবে সৎ যে নয় এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কু মতলব নিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখি একজনের হাতের তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠল। শূন্যে তোলা তার হাত। অস্ত্রহীন একজনের ঠিক মাথার উপর। বুকের রক্ত আমার হিম। ওকে কি এখুনি খুন করবে? আমার চোখের সামনে! চোখ বুঝলাম। একটু পরে দেখি, করে নি খুন। মাথার উপর থেকে তলোয়ার নামিয়েছে। আর ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেই বন্দি। হয়তো আসন্ন মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

ইস থাকত যদি এখন সেই স্পেনীয় আর ফ্রাইডের বাবা! আমি কি স্থির ভাবে এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম! চার জনে মিলে চলে যেতাম ঝোপের আড়ালে। আকস্মিক গুলিতে চমক ধরিয়ে দিতাম। মরত হয়তো দু একজন। বাকিরা ভয় পেত। তখন মুক্ত করে আনতাম তিন জনকে।

একটু পরে দেখি বসেছে তিন জন বালির উপর। আর বাকিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে চারধার। নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে এলে যেভাবে মানুষ ঘুরে ঘুরে সব দেখে। আনন্দে ডগমগ তাদের হাবভাব। শুধু তিন বন্দির মুখে বিষাদের ছায়া। বিরস বদনে বসে আছে সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা। সেই স্মৃতি। দ্বীপে আমার প্রথম দিন। অবাক হয়ে এইভাবেই বসে ছিলাম আমি। আমারো চোখের দৃষ্টিতে এই হতাশা। আর কত ভয়? মনে আছে প্রথম রাতটা কাটিয়েছিলাম গাছের উপর উঠে। আতঙ্ক তখন। যদি নিচে থাকলে হিংস্র জানোয়ার এসে গিলে খায়। সে যেন দুঃস্বপ্নের দিন আমার! দুঃস্বপ্নের এক একটি মুহূর্ত।

তবে একবারে যে নিরাশা তা নয়। জাহাজটা ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল অদূরে। সেটা আমার কাছে বিরাট এক আশার ব্যাপার। সেই আশায় ভর করেই তো যেতে সাহস পেলাম পরদিন। তারপর ফের। তারপর আবার, আবার। তবেই না সংগ্রহ করে আনলাম জীবনধারণের যাবতীয় সরঞ্জাম। এই গুলি গোলা বারুদ বন্দুক খাদ্য, এরই উপর নির্ভর করে, বলতে গেলে এখনো বেঁচে আছি।

আর ওদের সামনে ভারি জমাট অন্ধকার। আশার বিন্দুমাত্র ঝিলিকও নেই। নির্জন নিরালা একটা দ্বীপ। জানে না এর অন্ধিসন্ধি। জানে না এখানে কোথায় কী রহস্য আছে লুক্কায়িত। হিংস্র জন্তু আছে কি নেই সেটাও জানে না। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তা। তারই ধোঁয়াটে ছায়া মেখে মলিন মুখে বসে আছে।

বালির ওপর তুলে রাখল নৌকা

জানি না আমার মতো এরাও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে কিনা। অন্ন, বস্ত্রদাতা জগদ্বীশ্বর। এই বিশাল বিশ্বের নিয়ন্তা। যদি বিশ্বাস থাকে ঈশ্বরে, তবে আমারই মতো সাহসে বুক বাঁধতে পারবে। আমারই মতো পারবে ধৈর্য দিয়ে সময় দিয়ে প্রতিটি সমস্যা মোকাবিলা করতে। তবে আর অনিশ্চয়তার মেঘ জমবে না মনের কোণে। তবে সব সমস্যার নিরসন হবে।

দেখতে পাচ্ছি ওদের গোটা দলটাকেই। এসেছে ঢেউ ওঠার আগেই। সমুদ্র এখন মোটামুটি শান্ত। একটু পরেই উঠবে বাতাস। তখন চঞ্চল হবে। জানে নির্ঘাৎ ওরা প্রতিটি খুঁটিনাটি। বন্দিদের নির্বাসনে রেখে এখনি নিশ্চয় ফিরে যাবে না। তাতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। বাতাস পড়ে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ সেই বিকেল। ততক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখবে চারধার। কোথায় কীরকম জায়গায় নির্বাসন দিয়ে গেল বন্দিদের সেটা অনুমান করার চেষ্টা করবে।

একটু পরে দেখি নাবিকের দু'জন গিয়ে নৌকোয় উঠল। একটু যেন নেশাগ্রস্ত ভাবে। টলছে পা, শুয়ে পড়ল পাটাতনে। তারপর ঘুম।

অর্থাৎ হাতে আমার প্রায় দশ ঘণ্টার মতো সময়। এই দশ ঘণ্টায় দ্বীপ ছেড়ে ওদের পক্ষে জাহাজে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সে চেষ্টাও তারা করবে বলে মনে হয় না। রওনা হতে হতে সেই সন্ধ্যে। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল। কেননা অন্ধকারে আমাদের যে দেখতে পাবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে অবস্থায় আরো নিকটস্থ হতে পারব। বন্দুক থাকবে হাতের গোড়ায় প্রস্তুত। মোটমাট মনে মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি আমি নিয়ে ফেলেছি। মরণজয়ী এ লড়াই। তিনটি প্রাণীকে উদ্ধার করার জন্যে যুদ্ধযাত্রা। শুধু সেটাই বড় কথা নয়। এই সমগ্র ঘটন অঘটনের পিছনে একটা কারণ আছে। তার রহস্য ভেদ করার জন্যেই আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে। তাতে স্বজাতির প্রাণ যাক কিছু পরোয়া নেই। জয়ী হতে পারলে জাহাজে করে দেশে ফেরার একটা চেষ্টা করতে হবে। আশ্চর্য, এই সহজ সরল কথাটা এতক্ষণ মনে উদয় হয় নি! আমি তো এর দ্বারা উদ্ধারও পেতে পারি। একবার চেষ্টা করব নাকি?

ফ্রাইডেকে সাবধান করে দিলাম। যেন সূর্য ডোবার আগে কোনো কিছু না করে। হাতে এখনো অঢেল সময়। আর বেলা বাড়ছে একটু একটু করে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দৈনন্দিন কাজ সব পণ্ড। তাকিয়ে আছি একই ভাবে। দেখতে দেখতে দুপুর। গণগণে রোদ। সূর্য লাফ দিয়ে মাথার উপর উঠল। আর কি পারে রোদের প্রচণ্ড তাপ অগ্রাহ্য করে ঘুরে ঘুরে দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বেড়াতে। প্রচণ্ড কাহিল তখন। শুয়ে পড়ল আট জন গাছের ছায়ায়। সেই নৌকোর ঘুমন্ত নাবিকটিও এক ফাঁকে উঠে এসেছে। বন্দি তিন জনও বসেছে এক গাছের ছায়ায়। মোটমাট কাউকে আর এতদূর থেকে দেখা যায় না। গাছের আড়ালে সবাই ঢাকা পড়ে গেছে।

তখন নামলাম পাহাড়ের মাথা থেকে। যেখানে বসে বা শুয়ে আছে ওরা সেটা এখান থেকে সোয়া মাইল মতো দূর। ঘন জঙ্গল। আর বিস্তর ঝোপঝাড়। ইচ্ছে করছে যাই চুপিচুপি, অন্তত কে ওরা, কী ওদের মতলব সেটা একবার জেনে আসি। আমি তো আর কথা বলব না ওদের সাথে, ওরা নিজেরা নিজেরা কিছু না কিছু বলবে, আমি আড়ি পেতে শুনব। শুনে তবে তো সেই মতো ব্যবস্থা! আগে থেকে কিছু না জেনে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে কি আর কিছু সিদ্ধান্ত টানা যায়।

রওনা দিলাম। সে ভারি নিঃশব্দ নিশ্চুপ। ফ্রাইডে আসছে পিছু পিছু বলেছি খবরদার এতটুকু শব্দ যেন না হয়। কিছুতে আমাদের কিন্তু দেখা দেওয়া চলবে না। অস্ত্র দু'জনের হাতেই তৈরি। কোমরেও ঝোলানা পিস্তল আর তরবারি। আরো দুটো করে বন্দুক দু'জনের পিঠে। তাতে গুলি বারুদ আর সীসে ভরা।

ভাগ্য ভালো, আরো খানিকটা এগিয়ে দেখি সেই তিন জন। বিরস বদন। শোয় নি কেউ, বসা। এ অবস্থায় পারে কি কেউ নিশ্চিন্তে শুয়ে বিশ্রাম করতে! অন্তত আমার অনুমান যদি ঠিক হয়। দেখি ওরা বেশ খানিকটা দূরে। মাঝখানে জঙ্গল আর ঝোপ ঝাড়। তখন পা টিপে টিপে আরো কাছে গেলাম। বলতে গেলে হাতের নাগালে তিন জন। ফ্রাইডে ঠিক আমার পাশে তারপর গলার স্বর যতদূর সম্ভব নামিয়ে স্পেনের ভাষায় বললাম, কে আপনারা? কী পরিচয়?

অমনি চমকে উঠেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আমাদের। যেন মানুষ নই আমরা, ভূত। ভূত দেখলে যেমন হয় সেরকমই চোখ মুখের ভাব। মুখ চুপ। যেন ভুলে গেছে কথা বলতে। হয়তো এখুনি উঠে দৌড় দেবে। তখন ইংরিজিতে বললাম, ভয় নেই। আমাকে দেখে অবাক হবেন না। আমি আপনাদের বন্ধু। আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।

তখন একজন বলল, আপনি কি দেবদূত?

বললাম, না, আমি মানুষ।

—কিন্তু আমাদের যা অবস্থা এ তো মানুষের এক্তিয়ারের বাইরে।

বললাম, মানুষ ঈশ্বরেরই প্রেরিত জীব। আপনি বলুন, কেন আপনারা এখানে? আপনাদের পরিচয়।

বলল, আমাদের অনন্ত বিপদ।

বললাম, জানি। যখন নৌকা থেকে নামলেন আমি দেখেছি। একজন আপনাকে মারবে বলে তরবারি তুলেছিল। আপনার প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও হয় নি।

তখন কান্না। সে যা চোখের জল! বিমোহিত অবস্থা তখন। আমাকে ধরেই নিয়েছে ঈশ্বরের প্রেরিত কোনো দূত। মাথার টুপি খুলে আমাকে সম্মান জ্ঞাপন করল।

বললাম, আমি ঈশ্বর নই। দেবদূতও নই। আমি আপনারই মতো রক্তমাংসে গড়া একজন মানুষ। ঈশ্বর বা দেবদূত হলে আমার পরনে স্বাভাবিক পোশাক থাকত। এগুলো

ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। এই কোমরের বেল্ট অব্দি। সে অনেক ইতিহাস। পরে সম্ভব হলে শোনাব। বর্তমানে এইটুকু শুনে রাখুন আমি ইংরেজ। এখানে এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে। ও আমার সহচর। আমাদের সাথে বন্দুক আছে। নির্ভয়ে বলুন এবার কি আপনাদের সমস্যা।

তখন বলল, তবে সংক্ষেপে বলি। ওরা খুনী। বেশি কিছু বলার হয়তো সময় পাব না। ঐ জাহাজের আমি কাপ্তেন। ওরা নাবিক। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমাকে হয়তো খুনই করত। শেষে কী মনে করে নিয়ে এসেছে এখানে। এই নির্জন নিরালা দ্বীপে। আমাদের নির্বাসিত করবে। ও আমার সহকারী। আর উনি একজন যাত্রী। এরা বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেছিল। তাই এই শাস্তি। জানি না ভাগ্যে কী আছে।

বললাম, ওরা কি সবাই ওখানে?

—হ্যাঁ। শুয়ে আছে। বিশ্রাম করছে। বিকেল নাগাদ ফিরে যাবে জাহাজে। আমার ভয় করছে। যদি ওরা শুনতে পায় আমি কথা বলছিলাম আপনার সঙ্গে তবে হয়তো আর আস্ত রাখবে না। খুন করে ফেলবে।

—কটা বন্দুক আছে ওদের সাথে?

—দুটো। আর তলোয়ার।

বললাম, বেশ বাকিটা তাহলে আমার উপর ছেড়ে দিন। যা করার আমি করব।

করণীয় এখন দুটো। হত্যা করতে পারি একধারসে সবাইকে, নয়ত বন্দি করতে পারি। দ্বিতীয়টাই আমার বেশি মনঃপূত। কিন্তু করব কীভাবে।

কাপ্তেন বলল, দু'জন আছে দলে তারা মারাত্মক। ভীষণ নিষ্ঠুর। করতে পারে না এমন কাজ নেই। যদি ঐ দু'জনকে শায়েস্তা করা যায়, তবে বাকিরাও শায়েস্তা হবে। সুড়সুড় করে কাজে গিয়ে যোগ দেবে।

বললাম, কারা তারা দেখিয়ে দিন।

বলল, এতদূর থেকে তো দেখানো সম্ভব নয়। পরে সুযোগ পেলে আমি চিনিয়ে দেব।

বললাম, যা আমি করতে বলব করবেন?

বলল, একশবার। আপনার প্রতিটি আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

বললাম, তবে আর একটু ওধারে চলুন। কথা আছে। ফন্দি আঁটতে হবে। যাতে শুনতে না পায় ওরা সেই ব্যবস্থা আগে করা যাক।

তখন অতি সন্তর্পণে আমরা পিছিয়ে এলাম। জঙ্গলের আরো কিছুটা গভীরে। নিরাপদ এখন। অন্তত শোনা তো দূরের কথা, আমাদের দেখতেও আর পাবে না।

বললাম, একটা প্রশ্ন গোড়াতেই করে নিই। আপনাদের আমি জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু দুটি শর্তে। আপনারা কি কোনোরকম শর্ত মানতে প্রস্তুত?

বলল, নিশ্চয়। জীবনের বিনিময়ে যেকোনো শর্তে তারা রাজি। তাদের জাহাজ, তারা তিন জন সব এর পর থেকে আমারই কর্তৃত্বে আসবে। অর্থাৎ আমি যা বলব তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তারা সকলে। এর এতটুকু অন্যথা হবে না।

বললাম, তথাপি শর্ত দুটি প্রকাশ্যে বলে রাখার প্রয়োজন আছে। প্রথম শর্ত এই দ্বীপে যে কদিন বা যতদিন আপনারা থাকবেন, আমার নির্দেশ না মেনে কোনো কাজ করতে পারবেন না। যদি আমি আপনাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিই—তবেই পারবেন অস্ত্র ব্যবহার করতে। নিজের খেয়াল খুশিতে নয়। এককথায় দ্বীপে থাকাকালীন আপনারা আমারই একান্ত অনুগত।

দ্বিতীয় শর্ত : যদি জাহাজ উদ্ধার করতে পারি তবে আমার লোকজন সমেত আমাকে জাহাজে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য ভাড়া বাবদ কোনো খরচ আপনি দাবি করতে পারবেন না। এখন ভেবে বলুন, এই দুটি শর্তে আপনাদের কোনোরকম আপত্তি আছে কিনা।

মেনে নিল সব। সে যে কত ভাবে কত কথায় আমার প্রতি নিঃশর্ত আস্থা জ্ঞাপনের চেষ্টা! আমি অভিভূত। বললাম, ঠিক আছে। আমি আপনাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। এই নিন তিন জনের জন্যে তিনটে বন্দুক। এতে গুলি বারুদ ভরা আছে। এবার চলুন ওরা যেখানে আছে সেখানে যাই। যদি ঘুমিয়ে থাকে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই অবস্থাতেই এক সাথে পাঁচ জন গুলি ছুড়ব। কেউ হয়তো মারা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। মারবার ইচ্ছে আমাদের নেই। তবে একজনের মৃত্যু যদি বাকিদের প্রভাবিত করে, যদি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সেক্ষেত্রে সেটাই সবচেয়ে ভালো।

কাপ্তেনেরও দেখলাম একই ধরনের ইচ্ছে। শুধু সেই দুই পাষণ্ডকে নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত। তারা যথার্থ পক্ষে দুষ্ট প্রকৃতির। তারা যদি মরে তবে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ কি ক্ষোভ নেই।

বললাম, সেটা অবস্থা বুঝে ঠিক করা যাবে। ঘটনা যেমন হবে সেই মতো আমরা কাজ করব, সিদ্ধান্ত নেব। আপাতত চলুন এগোই। আর দেরি করা ঠিক নয়।

বলে এগোতে যাব, দেখি একজন ঘুম থেকে উঠেছে। তারপর আরো একজন। দেখতে পাচ্ছি তাদের এখান থেকে স্পষ্ট। বললাম, এই দু'জন কি সেই পাষণ্ড? বলল না। এরা নয়।—তবে এদের আমরা এতটুকু ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে পারি। আমি বললাম, কিন্তু তা বলে কারোর ক্ষতি হবে না, গায়ে একটু আঁচ লাগবে না এটা ভাবলে কিন্তু মুশকিল। সেক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না।

তখন এগোল তারা তিন জন। আমি আর ফ্রাইডে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা পিস্তলও দিয়েছি কাপ্তেনকে। খানিক দূর গিয়ে তিন জনের মধ্যে একজন হাতে তালি দিল। তাতে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সদ্য জাগ্রতদের একজন। চিৎকার করে ডাকল বাকিদের। ততক্ষণে বন্দুক গর্জে উঠেছে। নির্ভুর নিশানা। লুটিয়ে পড়ল একজন মাটিতে তৎক্ষণাৎ। বাকি জন যথেষ্ট আহত। ছিটকে পড়ল মাটিতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল। ডাকল প্রাণপণ চিৎকারে সবাইকে। কাপ্তেন এগিয়ে গেল। হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। বলল, এবার ঈশ্বরকে ডাক। বলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারল তার মাথায়। মুহূর্তে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরো তিন জন। বন্দুকের ছররার আঘাতে তারাও অল্পবিস্তর জখম। আর দেরি করা ঠিক না। তখন আমি আড়াল থেকে প্রকাশ্যে এলাম।

অবাক তারা। স্তম্ভিত। সব জারিজুরি মুহূর্তে খতম। আতঙ্কে চোখ ছানাবড়া। সেই অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সামনে। ক্ষমা প্রার্থনা করল। কাপ্তেন বলল, ক্ষমা করতে পারি, তবে এক শর্তে। ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করতে হবে দুশমনদের সঙ্গে হাত মেলাবে না এবং সেই সাথে দুশমন কর্তৃক অধিকৃত জাহাজ পুনরুদ্ধারের জন্যে যা যা করণীয় সব করতে হবে। জাহাজ জামাইকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তাদের। তারা কি রাজি? বলল, রাজি। জীবনের বিনিময়ে তারা সব কিছু করতে রাজি। আমরা তাদের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

বলাবাহুল্য, শুধু মুখের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। বিশেষ করে একটু আগে যাদের ওরকম মারমুখী চেহারা। আমরা তাই সব দিক বিবেচনা করে তাদের হাত পা বেঁধে বালির উপর ফেলে রেখে দিলাম।

ফ্রাইডে আর কাপ্তেনের সহকারীকে পাঠালাম নৌকোটার দিকে। বললাম, পাল দাঁড় হাল সব যেন খুলে নিয়ে আসে। গেল তাই। ইতোমধ্যে দেখি আরো তিন জন গুটি গুটি আমাদের সামনে হাজির। কী ব্যাপার, কী চাই তোমাদের? বলে বন্দুক তুললাম। অমনি হাত জোড় করে সে কী অনুনয় বিনয়! হকচকিয়ে গেছে তো কাপ্তেনকে দেখে। সঙ্গে আবার আমার মতো একটা অচেনা মানুষ। কিছুক্ষণ আগের বন্দি এখন থেকে বন্দুক হাতে তাদেরই উপর খবরদারি করার জন্যে দণ্ডায়মান। বলল, আমাদের দয়া করুন। জীবন হানি ঘটাবেন না। আমরা আপনার হয়ে সব কিছু করতে রাজি।

তখন তাদেরও হাত পা বাঁধলাম। ফেলে রেখে দিলাম প্রথম কজনের পাশে। আমরা বিজয়ী এটা এখন নিদ্বিধায় বলা যায়। সব কটি শত্রুই পর্যুদস্ত। বলতে গেলে খুব সামান্য রক্তপাতেই এতবড় বিজয় পর্ব সমাধা হলো।

নিরুদ্বিগ্ন এখন। বসলাম আমি আর কাপ্তেন মুখোমুখি। পরস্পরের খবরাখবর নিতে। প্রথমে বললাম আমি আমার নিজের কথা। শুরু থেকে এই দীর্ঘ সাতাশ বছরের ইতিহাস। একাগ্র মনে শুনল। আর ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাব। বিশেষ করে গোলাবারুদ রক্ষার ইতিবৃত্ত শুনে তো রীতিমতো হতবাক। আর সত্যি বলতে কি তার মতো মানুষের পক্ষে এতটা ভাবাও যে কষ্টকর। পারবে কীভাবে সুখী সুস্থ মানুষ ক্ষণে ক্ষণে এবংবিধ রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনাবলি ভাবতে! শুনে শ্রদ্ধায় সৌজন্যে বিগলিত ভাবে বলল, আপনি না থাকলে এই শয়তানরা আমাকে মেরে ফেলত। আমি হলফ করে বলতে পারি, বলে কাঁদতে লাগল।

তখন সান্ত্বনা দিলাম। তাকে আর তার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে গেলাম আমার আস্তানায়। খাদ্য দিলাম। পানীয় দেখালাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু। দেখে তো তাজ্জব। যেন কথা সরে না মুখে। আর ক্ষণে ক্ষণে সে কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সে কী তারিফ!

বিশেষ করে ঐ যে লোকচক্ষুর আড়াল—ঐ চারপাশে ঘন গাছগাছালি, আমি বিশ বছর আগে লাগিয়েছি গাছ, বড় হয়েছে এতদিন ধরে, এ তো আর ইংল্যান্ড নয় যে ধীরে ধীরে গাছ বাড়বে, এখানে খুব দ্রুত এর বৃদ্ধি, কুঞ্জ বলতে যা বোঝায়—বলল, এটা ভারি চমৎকার। আপনি এইভাবে নিজেকে চারদিক থেকে আড়াল করে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তখন হাসতে হাসতে বললাম, এত দেখেছেন। একটা, এর চেয়ে আরো গোপন আরো লুক্কায়িত আমার আরেকটা বাড়িও আছে। সেটাকে আমি বলি বাগান বাড়ি। রাজা বাদশাদের যেমন থাকে। সেটা পরে দেখাব। তবে এখন আমাদের কাজ হলো কীভাবে জাহাজটা উদ্ধার করা যায় তার একটা ফন্দি বের করা। আপনি কী কিছু ভেবেছেন?

বলল, আমি ভাবব কী! আমার তো কিছুই মাথায় খেলছে না। এখনো ছাব্বিশ জন বিদ্রোহী নাবিক জাহাজে রয়েছে। ওরা কি আর সহজে আমাদের শর্ত মেনে নেবে? জানে যে মেনে নেবার হাজারো বিপদ। চক্রান্তের অভিযোগে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে প্রত্যেকের ফাঁসি অব্দি হয়ে যেতে পারে। কে আর চায় সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে। মোটমাট, ওরা কিছুতে ছেড়ে কথা বলবে না। সে অবস্থায় কী যে আমাদের করণীয় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু তা বলে তো আর বসে থাকলে চলে না। দ্রুত যাহোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্রুত এই কারণে কেননা দেরি করলে ঘোর বিপদ। কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। জাহাজে যারা আছে, তারা যখন দেখবে তাদের সাকরেদরা ফিরে আসছে না তখন ভিতরে ভিতরে ভীষণ চঞ্চল হবে। কী হলো তাদের দেখার জন্যে এখানে আসবে। নির্ঘাৎ ভালো যে কিছু ঘটে নি সেটা অনুমান করেই আসবে। সঙ্গে থাকবে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র। সে অবস্থায় আমাদের মুখোমুখি পড়ে যাবারই সম্ভাবনা যথেষ্ট এবং তার অর্থ আমাদের পরাজয়। কেমন করে আমরা চারটে মানুষ পেরে উঠব ছাব্বিশ জন সশস্ত্র মানুষের সঙ্গে!

বললাম, আপাতত এই মুহূর্তে একটাই করণীয়। তা হলো কূলে ওদের যে নৌকোটা পড়ে আছে, তাকে অকেজো করে দেওয়া। ফুটো করে দেব নিচে। তাতে জল উঠবে। নৌকো নিয়ে জাহাজে ফিরে যেতে পারবে না।

সেটাই করলাম। নৌকোয় উঠে যা সব জিনিস ছিল আগে নিয়ে এলাম। যেমন কটা বন্দুক। পানীয়ের বোতল। কিছু বিস্কুট। বারুদের একটা প্যাকেট। চিনি অনেকখানি। আর এক বোতল ব্রান্ডি। এর মধ্যে ব্রান্ডি আর চিনি পেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম। সাতাশ বছর এই দুটি জিনিসের স্বাদ পরখ করার সুযোগ হয় নি। হয়তো ভুলে গেছি খেতে কীরকম লাগে।

মালপত্র নামিয়ে নৌকোর খোলে করলাম মস্ত একটা ফুটো। নিশ্চিন্ত এখন। যদি অন্য নৌকোতে করে আসে এখানে এবং আমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি করে, সে অবস্থায় সবাই মিলে একটা নৌকোয় করে জাহাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। দ্বীপে কাউকে না কাউকে রেখে যেতেই হবে। তখন কী করা সম্ভব সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে।

তবে অন্য একটা ব্যবস্থাও ওরা নিতে পারে। যদি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারে সঙ্গীরা পড়েছে বিপদে, সে অবস্থায় তাদের ফেলে রেখেই জাহাজ নিয়ে ওরা রওনা হয়ে যাবে। ভুলেও দ্বীপের দিকে আসার চেষ্টা করবে না। যদি সেরকম বুঝি তখন কী করব আমরা? মনে পড়ল তখন স্পেনীয় নাবিকদের কথা। দলে মোট সতেরো জন। খবর দিয়ে তখন নয় তাদের ডেকে আনব। আর যদি ইতোমধ্যে এসে পৌঁছয় তবে তো কথাই নেই।

হলো তখন মোট বাইশ জন। ফ্রাইডের বাবাকে ধরে। বাইশ জন পারব না কি চাব্বিশটা দুশমনের সাথে পাল্লা দিতে?

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঠেলে ঠেলে নৌকোটাকে ডাঙ্গার উপরে তুললাম। নিরাপদ দূরত্ব বলা যায়। প্রবল স্রোতও পারবে না ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভারি ক্লান্ত তখন চার জনই। বসে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ শুনি জাহাজ থেকে গুলির শব্দ। যতদূর অনুমান নৌকোর উদ্দেশে সঙ্কেত ধ্বনি। দুরবিন লাগালাম চোখে। দেখি ফের ছুড়ল গুলি। ফের। কিন্তু নৌকোর তো এক চুলও নড়ার নাম নেই। তখন দেখি কজন মিলে কি জল্পনা কল্পনা হলো। একজন নির্দেশ দিল আরেকটা নৌকো জলে নামাতে। নামাল সেটা জলে। উঠল তাতে মোট দশ জন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। আসছে সোজা এই দিকেই।

প্রতিটি মুখ এখান থেকে বলতে গেলে স্পষ্ট। চিনতে বা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। চেনে তো কাপ্তেন সকলকে। আমাকে চিনিয়ে দিল একে একে।—ঐ যে দেখছেন তিন জন, ঐ পাশাপাশি, ডানদিকে—ওরা নির্দোষ। ভালো মানুষ বলতে যা বোঝায়। তবে নিরুপায় এই শয়তানদের হাতে পড়ে। জোর করে ওদের বাধ্য করেছে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে অংশগ্রহণ করতে। বাকিরা সব বদমাশ।

বদমাশই বটে। মুখ দেখে চেনা যায়। রুক্ষ দুর্বিনীত গোছের ভাব। চোখে সারা রাজ্যের হিংসা আর শয়তানী। গায়ে শক্তি থাকুক আর না থাকুক, হাতে আছে অস্ত্র আর মনে বিদ্বেষ। এই দুটোকে সম্বল করে লড়বে আমাদের সাথে মরিয়ার মতো। আমরা কি পারব?

কিন্তু সেকথা তো আর বলা যায় না। তাতে হতাশ হয়ে পড়বে কাপ্তেন। বললাম, এই যে আসছে ওরা, কী করবেন এখন বলুন। বলল, আপনি যা বলবেন তাই। বললাম, সেটা তো নির্ভরশীলতার কথা। আপনার জীবন রক্ষা করেছি বলে কি আপনি ভাবছেন আমি ঈশ্বর? আমার অসীম ক্ষমতা আছে? বলল, তাহলে কী করণীয় এখন? বললাম, একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। যে দশ জন আসছে তাদের মধ্যে যারা সৎ-প্রকৃতির তাদের আমি এতটুকু আঘাত করতে চাই না। সে অবস্থায় তারা পরে আমাদেরই দল ভারি করবে। কিন্তু যারা দুশমন, তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। হয় এসপার নয় ওসপার। দরকার হলে জান নেব। যদি মরতে হয় তা-ও সই। তবু ছাড়ব না কাউকে।

বেশ মনঃপূত হয়েছে আমার কথা। দেখি চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। কিন্তু বসে থাকা তো চলবে না। আসছে ওরা। আমাদের যা করণীয় এই বেলা করে ফেলতে হবে। লেগে পড়লাম অমনি কাজে।

বন্দিরা একইভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সবচেয়ে আগে ওদের সরাতে হবে। দু'জনকে পাঠিয়ে দিলাম ফ্রাইডের সাথে। বদমাশ এরা। কাপ্তেন বলল, বড় অসৎ স্বভাব। তিন জনকে রেখে এলাম গুহায়। ভিতর দিকের ঘরে। সেটা একই সঙ্গে নিরাপদ এবং নিরিবিলি। চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউ শুনতে পাবে না। অবিশ্যি কাপ্তেন যা বলল তাতে এরা গোলমাল পাকাবার লোক নয়। মোটের উপর শান্ত প্রকৃতির। দলে পড়ে হালফিল বদমায়েশী শিখেছে। সামান্য ভয়-ডরও দেখালাম।—দেখ বাপু, পালাবার চেষ্টা যদি কর, নিজেরাই বিপদে পড়বে। শাস্তি সেক্ষেত্রে মৃত্যু। গুলি করে একেকটাকে খতম করব। আর যদি চুপচাপ থাক, দু তিনদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। এটা মুখের কথা নয় প্রতিজ্ঞা। এই দ্বীপের অধিকারী যেহেতু আমি, আমার প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না। বলে

খাবার দাবার হাতের কাছে ধরে দিলাম, জল দিলাম। বলল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভুলেও পালাবার চেষ্টা করব না। আপনার দয়ায় আমরা নিজেদের সঁপে দিয়েছি। হ্যাঁ, আলোও দিলাম। একটা মোমবাতি। আর সকলের অজ্ঞাতসারে ফ্রাইডেকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম গুহার মুখে। অর্থাৎ প্রহরী। এতৎসত্ত্বেও যদি কোনোরকম বেগড়বাঁই করে, ফ্রাইডে তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

ফ্রাইডের হাতে দিয়েছিলাম যে দু'জনকে, তারা খাবার দাবার কিছু পেল না। এমনকি গুহার একটু আচ্ছাদনীও না। আমার আস্তানার একটু দূরে খোলা মাঠে পিছমোড়া করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় তাদের ফেলে রাখা হলো। এরা যেহেতু শয়তান, এটাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

দেখেশুনে দুই বন্দির অবস্থা তো কাহিল। কত অনুনয় বিনয়, কত আর্জি। বললাম, বেশ, তবে আমাদের কথা শুনবে এই প্রতিজ্ঞা কর। ঈশ্বরের নামে কসম খাও। তাই করল। তখন বাঁধন খুলে দিলাম। বলল, আপনারা যদি মরতে বলেন তা-ও আচ্ছা, তবু জানব সৎকাজের জন্যে লড়াই করে মরেছি। আমরা আর ওদের দলে নেই। তো হলাম এখন চার। আর তিন জন তো আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছে। সব মিলিয়ে সাত। সবাইকে ভাগ করে দিলাম বন্দুক আর বারুদ। সশস্ত্র এখন। গোটা দলের নেতৃত্ব আমার হাতে। আর যা মনের জোর আমাদের—আসুক না দশ কি বিশ জন, হাসতে হাসতে পারব তাদের মহড়া নিতে।

নামল এসে কূলে। লাফ দিয়ে পড়ল একে একে দশ জন। নৌকো টেনে তুলল বালির উপর। এটা আমার পক্ষে মঙ্গল। কেননা আমি ভেবেছিলাম হয়তো নোঙর ফেলে জলের উপরই রাখবে। সেক্ষেত্রে নোঙর তুলে ভেসে পড়া অনেকখানি সময়ের ব্যাপার। দু'তিন জনকে দাঁড় করিয়ে রাখল নৌকোর কাছে পাহারায়। বাকিরা ছুটে গেল প্রথম নৌকোটার দিকে।

অর্থাৎ সেই যে বন্দিদের নিয়ে এসেছিল নৌকো। আমরা তো আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। দেখে তা অবাক।—একি, এ যে ফুটো! দেখি কী যেন বলা বলি করছে নিজেদের মধ্যে।

তারপর ডাঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ডাক দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ডাক। ফিরে এল শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে। সাড়া কেউ আর দেয় না। তখন একসাথে অনেকগুলো বন্দুক দাগল। গুড়ুম গুড়ুম—সে যেন এক ঝাঁক গর্জন। সেটা নিষ্ফল। যতদূর অনুমান দু'জন মাত্র শুনেছে সেই আওয়াজ। যারা পড়ে আছে খোলা মাঠে। কিন্তু শুনে লাভ কী। সাড়া দিলে তো আর এরা শুনতে পাবে না। উঠে যে চলে আসবে এদের সহায়তা করতে তারও উপায় নেই। আর গুহার মধ্যে যে তিন জন তারা তো যাবতীয় শ্রবণের বাইরে। অতগুলো দরজা ভেদ করে কিছুতে পৌঁছবে না তাদের কানে গুলির আওয়াজ।

ফলত তারা অবাক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখ মুখ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব। কী যেন আলোচনা করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখি হুড়মুড়িয়ে উঠল গিয়ে নৌকায়।

কাপ্তেন তো থ। আমাকে কেবল বলে একি হলো, চলে যাচ্ছে যে ওরা! হয়তো ভেবেছে সঙ্গীরা সকলেই নিহত। সে অবস্থায় জাহাজে ফিরে গিয়ে বাকিদেরকে বলবে, ওরা কেউ বেঁচে নেই, চল আমরা এবার নোঙর তুলে রওনা দিই। তাতে ওদের বরং লাভ, আমাদেরই ক্ষতি। গেল তো জাহাজ! আমরা তো নির্বাসনেই পড়ে রইলাম।

চিন্তাটা যে আমার মাথাতেও নেই তা নয়। তবু ধীর স্থির আমি। অত চঞ্চল হলে আমার চলবে কীভাবে! আমি না এখন নেতা! তা বসে রইলাম একইভাবে। দেখি একটু পরে নৌকা নিয়ে আবার কুলের দিকেই ফিরে আসছে। জানি না কী মতলব। তবে দেখলাম, তিন জনকে নৌকায় বসিয়ে রাখল। বাকিরা চলল বনবাদড় ডিঙিয়ে সঙ্গীদের পাত্তা লাগাতে। অর্থাৎ গিয়ে যে বলবে সকলেই মারা গেছে, এটা অনেকের মনঃপূত হয় নি। জাহাজের বাকি লোকেরা তাতে ওদেরকেই সন্দেহ করবে। সেটা ওরা অনুমান করতে পেরেছে।

আমরা তো উভয় সঙ্কটে বলতে যা বোঝায় তাই। কী করি এখন! কোনদিকে যাই! যদি গিয়ে ডাঙ্গার ঐ সাত জনকে ঘায়েল করি, তবে এদিকের তিন জন নৌকো নিয়ে পালাবে। জাহাজে গিয়ে জানিয়ে দেবে সব, নোঙর তুলে অমনি ওরা সটকে পড়বে। তাতে আমাদের উদ্ধারের আশা বরবাদ। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তখন সাতটা পেট বাড়ল। মারতে তো আর পারব না এদের সকলকে। তখন নাও এদের জন্যে চাষবাস থেকে রান্নাবান্না, বাসন ধোওয়া শুরু কর!

কী করণীয় তাহলে?

মন বলল, ধৈর্য ধর। দেখ অগ্র-পশ্চাৎ সব কিছু বিবেচনা করে। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।

অতএব বসে রইলাম চুপচাপ।

সাত জন গেল পাহাড়ের দিকে। সেই পাহাড়ের নিচেই আমার বসতি। বাকি তিন জন নৌকোটাকে নিয়ে গেল বেশ খানিকটা দূরে। তারপর নোঙর ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল।

সাত জনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চলছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। মনে নিদারুণ ভয়। উঠবে পাহাড়ের মাথায়। সেটা একপক্ষে ভালো। আমাদের কাছাকাছি হতে হবে। গুলির নাগালের মধ্যে। তখন প্রয়োজনবোধে গুলি চালিয়ে কটাকে জখম করতে পারব।

আর যদি পাহাড় থেকে নেমে দূরে কোথাও যায়, সেটাও আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ পাব তখন এই তিন জনকে কাবু করার। মনে প্রাণে সেটাই চাই।

উঠল পাহাড়ের মাথায়। ঘুরে ঘুরে দেখছে চারদিক। দূরের দিকেই নজর। তাই পায়ের গোড়ায় আমার বসতি দেখতে পাচ্ছে না। দেখার মনও বোধ হয় নেই। ডাকাডাকি শুরু করল বন্ধুদের নাম ধরে। রীতিমতো চিৎকার। কিন্তু কে দেবে সাড়া! হতাশা তখন নেমে এল ধীর পদক্ষেপে। একটা গাছের নিচে বসল। ঘুমোবে নাকি? সেই যেমন আগের দল ঘুমিয়ে পড়েছিল? তবে আর পায় কে আমাদের! অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি করব সবাইকে। কিন্তু না, ঘুমোবার ধারকাছ দিয়েও গেল না। ভয় যে মনে। আর ত্রস্ত শঙ্কিত ভাব। কোন দিক থেকে বিপদ আসবে বলতে তো কেউ পারে না। সেই মন নিয়েই থম মেরে বসে রইল।

কাপ্তেন বলল, আমার মাথায় একটা মতলব খেলছে। ওরা হয়তো একটু পরে ফের বন্দুক ছুড়ে দলবলকে জানান দেবার নতুন একটা চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে আমরা যদি ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাই, তবে নতুন করে বন্দুকে বারুদ পুরবার আগে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের উপর, এতটুকু রক্তক্ষরণ না করে সকলকে বন্দি করব।

ডাঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ডাক দিল

মতলব হিসেবে চমৎকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওরা বন্দুক ছুড়ল না। তখন হতাশ হয়ে নতুন চিন্তা করতে বাধ্য হলাম। ফন্দি একটা এসেছে মাথায়। কিন্তু সেটা দিনমানে কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সন্ধ্যে ঘনাক। ততক্ষণে যদি তারা নৌকোয় গিয়ে ওঠে, তবে আমরা যে সফল হব এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সে যেন ধৈর্যের রীতিমতো পরীক্ষা। বসে আছি একভাবে। নড়াচড়া বন্ধ। অস্বস্তি হচ্ছে। আর ভয় যদি সন্ধ্যের আগেই ওরা রওনা হয়ে যায়! সেটা অবিশ্যি না হবারই সম্ভাবনা। কেননা স্রোত শান্ত হতে হতে সন্ধ্যে কাবার। তবে যদি মরিয়া হয়ে স্রোত অগ্রাহ্য করে ওরা আগে ভাগে রওনা হয়, সেটা আলাদা কথা।

করল তাই। যা ব্যতিক্রম সেটাই আপাতত ওদের কাছে বিধি, উঠে পড়ল হঠাৎ এদিকে সন্ধ্যেও প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ঘোর ঘোর ভাব। এগোচ্ছে কূলের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা যাকে বলে হতভম্ব। কিন্তু কী করা যায়? এ অবস্থায় যেমন করে হোক ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কিছুতেই চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। উঠলাম গোপন জায়গা থেকে। কাপ্তেনকে নিয়ে গেলাম ফ্রাইডের কাছে। বললাম, এক কাজ কর। তুই আর কাপ্তেনের এই সহকারী—দু'জন মিলে চলে যা সেই নালাটার কাছে। সেখান থেকে হাঁক দে। এমন ভাবে যেন ওরা শুনতে পায়। ওরা ধরে নেবে ডাকছে ওদের হারানো সখীরা। সেক্ষেত্রে যাবে না ওরা, ফিরে আসবে।

স্বভাবতই ডাক লক্ষ্য করে এগোবে তখন। ক্রমশ পিছিয়ে যাবে ডাক। এই ভাবে গহীন জঙ্গলে ওরা প্রবেশ করবে। অর্থাৎ যেকোনোভাবে হোক নৌকার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে ওদের। সেটাই আমাদের কাজ। তারপর যা করার আমরা করব।

হলো তাই। নৌকায় উঠতে যাবে ওরা, শোনা গেল ডাক। অস্পষ্ট জড়ানো সেই ধ্বনি। ওরা থমকে দাঁড়াল। সাড়া দিল। বিমূঢ় ভাব। তখন ফের ডাক। তখন তৎপর হলো। শুনল কান খাড়া করে। আসছে পশ্চিম প্রান্ত থেকে। নালাটা সে দিকেই। কিন্তু যাবার যে উপায় নেই। তখন নৌকোর মুখ ঘোরাল। উঠল নৌকোয়। ছপাৎ ছপাৎ দাঁড় ঠেলে নৌকো এগিয়ে চলল নালার দিকে।

ঢুকল নালায়। দেখতে পাচ্ছি সব। নৌকো ভেড়াল খাঁড়িতে। আমরা চুপ। মোট আট জন নামল। রইল দু'জন। নৌকো বাঁধল শক্ত করে একটা গাছের গুঁড়িতে। তারপর আট জন জঙ্গলের দিকে এগুলো।

ফ্রাইডে আর কাপ্তেনের সহকারীকে রেখে আমরা দলবল চুপিচুপি ঘুরপথে ডিঙ্গিয়ে এধারে এলাম। ততক্ষণে নৌকোর দু'জনের একজন নেমে পড়েছে ডাঙ্গায়, সটান চিৎপটাং হয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থা। অতর্কিতে একলাফে পড়লাম গিয়ে তার সামনে। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠল। তখন কাপ্তেন মারল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এক ঘা। মুহূর্তে সে চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান। তখন নৌকোর বাকি আরোহীর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। বলল, নেমে আয় নয়ত এক গুলিতে তোর জান নিয়ে নেব।

নেমে আসবে না সে সাহস কি আর তার আছে। চোখের সামনে দেখল সাথীর ঐ অবস্থা। আর কি মনে এতটুকু জোর পায়! সুড়সুড় করে নেমে এল নৌকা থেকে। অস্ত্র কাপ্তেনের হাতে তুলে দিল। হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে। কসম খেল। মোটের উপর বদমাশ লোক নয়। কাপ্তেনও বলল সে কথা। তখন তাকে আমাদের দলে নিলাম।

ফ্রাইডে আর কাপ্তেনের সহচরও কিন্তু বসে নেই। নিপুণ তাদের কাজ। ডাকতে ডাকতে গোটা দলটাকে নাকে দড়ি দিয়ে বলতে গেলে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, এ বন থেকে ও বন—সে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। শেষে রীতিমতো ক্লান্ত তারা। হাঁটতে আর পারে না। এদিকে আমরাও নিশ্চিন্ত—যতদূরে গিয়েছে সেখান থেকে নৌকোর কাছে পথ চিনে রাত ঘোর হওয়ার আগে ফিরে আসা অসম্ভব। যদি চেষ্টা করে তবু? দেখা যাক।

কিন্তু তা বলে এখনি কিছু করতে যাচ্ছি না আমরা। অন্ধকার ঘনাক। রাত হোক। তখন শুরু হবে আসল খেলা।

ফ্রাইডের ডাক সমানে চলছে। সেরকমই কথা। ডাকতে ডাকতে এদিক ফের নিয়ে আসবে ওদেরকে। আসছে। শরীর রীতিমতো দুর্বল। পা আর চলে না। তা নিয়ে কত অভিযোগ। তবু নিরুপায়। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই নৌকা। সব দেখে তো তাজ্জব। ভাটার টানে জল ততক্ষণে সরে গেছে। কাদা মাটির উপর গেঁথে গেছে নাও। আর কোথায় সেই দু'জন প্রহরী? খুঁজল কত। পেলে তো দেখা! আহত মানুষটাকেও আমরা যে ইতোমধ্যে তুলে নিয়ে গেছি। তখন দেখি যারপর নাই ঘাবড়ে গেছে। কান্নাকাটি শুরু করার দাখিল। একজন বলল, দানো আছে দ্বীপে। এসব তারই ছলাকলা। তখন ত্রাস। একজন বলল, দানো নয়, নির্ঘাৎ বর্বরদের এলাকা। আমাদের নাকে দঁড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে কাহিল করে শেষে মেরে ফেলবে। তারপর কেটে কুটে মাংস খাবে। শুনে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

ডাকল সঙ্গীদের নাম ধরে অনেকবার। পেলে তো সাড়া! কী করবে তখন বুঝতে পারছে না। এই একবার গিয়ে বসে নৌকোয়, পরক্ষণেই নেমে আবার ডাঙ্গায় এসে ঘোরাঘুরি করে। মোটমাট ভীষণ হতাশ তখন। আর দুর্বল। আর সব মিলিয়ে ভীষণ এক ত্রাস।

আমরা এই অবস্থার সুযোগ অনায়াসে নিতে পারি। রাত হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি রে রে করে। ওদের যা অবস্থা এতটুকু বাধা দেবার সুযোগ পাবে না। এতটুকুও নটঘট করলে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাবে। চাই কি আমাদেরও দু একজন

মরতে পারে। সেটা আমার অভিপ্রায় নয়। বন্দি করতে চাই সবাইকে, তবে এতটুকু রক্তপাত না ঘটিয়ে। তখন সবাইকে বললাম, তোমরা পা টিপে টিপে যতদূর পার ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাও। গুলির নাগালের মধ্যে। তারপর যা করণীয় আমি বলব।

গেল তাই। ভেবেছিলাম বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ঘটনার জন্যে। তার আর দরকার হলো না। দলের নেতা সেই শয়তানটা এদিকেই আসছে। সঙ্গে দুই সাকরেদ। কথা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। তা আমরা তো তাকে চিনি না, কাপ্তেনই গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল। অন্ধকারে আবছা তার অবয়ব। শেষে একদম হাতের নাগালের মধ্যে। তখন কি আর পারে কাপ্তেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে? মনে যে ভীষণ জ্বালা। অমনি দুই সঙ্গীকে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। হাতের বন্দুক তীব্র শব্দে গর্জে উঠল।

অদ্ভুত নিশানা। মরল সেই শয়তান তৎক্ষণাৎ। একজন সাকরেদ ভীষণ ভাবে জখম। মরল যদিও আরো ঘণ্টাখানেক পরে। বাকি আর একজনের গায়ে আঘাত তেমন লাগে নি। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতভম্ব মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে দৌড়ল পরিত্রাহি বেগে।

তখন আর আড়ালে বসে থাকা যায় না। ঘটনা যতদূর গড়িয়েছে তাকে সামাল দেবার প্রয়োজন আছে। দলবল সমেত অমনি এগিয়ে গেলাম। বিরাট বাহিনী এখন তো আমার। আট জনের দল। আমি সেই দলের সেনাপতি। ফ্রাইডে আমার দক্ষিণ হস্ত। আর কাপ্তেন বাঁ-হাত। সকলেরই হাতে অস্ত্র। অন্ধকার ভেদ করে সোজা গিয়ে তাদের মুখোমুখি হলাম।

সে ভারি মজা। অন্ধকারে দেখতে পায় না তো আমাদের পরিষ্কার, আমরা কত জন, কী কী অস্ত্র আমাদের হাতে মজুত কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। দেখি চারধারে ঘন ঘন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। তখন নৌকো থেকে ধরে যাকে দলে নিয়েছি খানিকক্ষণ আগে, তাকে বললাম, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল। ওরা যদি স্বেচ্ছায় ধরা দেয় আমরা কোনো ক্ষতি ওদের করব না। কিন্তু যদি উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করে, তবে মুশকিলে পড়বে।

সে তখন নাম ধরে ডাকল একজনকে, টম, টম, স্মিথ?

টম বলল, কে, রবিনসন নাকি?

বলল, হ্যাঁ, আমি রবিনসন। আমি নিরাপদেই আছি। যদি বাঁচতে চাও এক্ষুনি হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পণ কর।

—কার কাছে আত্মসমর্পণ করব?

—আমাদের কাছে। মস্ত দল আমাদের। পঞ্চাশ জন যোদ্ধা। কাপ্তেনও আছে দলে। তোমাদের পাণ্ডা একটু আগে মারা গেছে। আরেকজন ভীষণভাবে জখম। যদি বাঁচতে চাও এইবেলা হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও।

—একটু ভাবনার সময় চাইছি। ধর পনেরো মিনিট। তারপর তোমাকে জানাব।

—সময় দেওয়া যেতে পারে তবে এক শর্তে—যদি তোমরা সকলে আত্মসমর্পণ কর। অবিশ্যি সময় দেবার মালিক এই মুহূর্তে কাপ্তেন। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

বলে জোরে জোরেই রবিনসন কাপ্তেনের কাছে সব বলল।

কাপ্তেন বলল, স্মিথ, আমি কাপ্তেন বলছি। আমার গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ। যদি এই মুহূর্তে অস্ত্র ত্যাগ করে তোমরা ধরা না দাও, তবে তোমাদের জীবন সংশয়। বিশেষ করে লি অ্যাটকিন্সের।

অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়লো ...

উইল দলের পাণ্ডার ডান হাত। পালিয়ে এসেছে জখম অবস্থায়। কাপ্তেনের কথা শেষ হতে না হতে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, দোহাই কাপ্তেন, পনেরোটা মিনিট সময় আমাদের দিন। আমরা কথা দিচ্ছি অস্ত্র ত্যাগ করব। আমাকে দোষ দেবেন না। আমি অনেক অপরাধ করেছি। তার জন্যে দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি।

পরে শুনলাম অ্যাটকিন্স নাকি জাহাজে কাপ্তেনের গলা চেপে ধরেছিল। গালাগাল দিয়েছে অকথ্য ভাষায়। ছাড়ে আর কি কাপ্তেন! তার সেই এক গোঁ—অস্ত্র আগে ত্যাগ কর। তারপর মালিকের সাথে কথা বলে দেখব তোমার জীবন রক্ষা করা যায় কিনা।

মালিক অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি। কথা আছে আমার নির্দেশ ছাড়া এ দ্বীপে কোনো কিছু এরা করবে না। কাপ্তেন সেই নির্দেশ হুবহু মান্য করেছে।

তখন একে একে অস্ত্র নামিয়ে রাখল ছ'জন। দু'জন তো মৃত, দু'জন আমাদের দখলে। বন্দি করা হলো প্রত্যেককে। শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হলো হাত পা। নিয়ে গেল তাদের গুহার দিকে। আমি আর দলের আর একজন ইচ্ছে করেই প্রকাশ্যে দেখা দিলাম না। তারও কারণ আছে। সেটা কী, পরে বলব।

কাজ এখন অনেক। ছ্যাঁদা-করা নৌকোটা সারাতে হবে। সেদিকে গেলাম আমরা কজন। কাপ্তেন গেল বন্দিদের সাথে। অনেক রাগ তো মানুষটার মনে। অনেক জ্বালা। বকাবকি করুক একটু ওদের। তাতে জ্বালা মিটবে।

পরে শুনেছিলাম, বন্দিদের কেউ নাকি অভিযোগের উত্তরে রা টুকু খাটে নি। মাথা নিচু করে শুনেছে নিজেদের অপরাধের কথা। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছে নিজেদের জীবন। প্রাণ ভিক্ষা যাকে বলে। কাপ্তেন বলেছে, তোদের নিয়ে যাব দেশে, বিদ্রোহের অভিযোগে এক একটাকে ফাঁসিতে চড়াব। তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে। বলেছে কাপ্তেনকে দ্বীপে নির্বাসন দেবার আগে ভেবেছিল এটা নির্জন নিরিবিলি দ্বীপ, কিন্তু নির্জন যে নয়, তাতে তারা বরং সন্তুষ্ট। ঈশ্বর হাতে করে রক্ষা করেছেন কাপ্তেনকে। আর জন্যে তারা ঈশ্বরের প্রতি চির কৃতার্থ।

শুনে কাপ্তেন বলেছে আপাতত কারুর প্রতি সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অপরাধের বিচার যা কিছু হবে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে। তবে উইল অ্যাটকিন্স ক্ষমার অযোগ্য। সে যেন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়। ভোর হলেই তার ফাঁসি হবে। এটা মালিকের নির্দেশ।

বলাবাহুল্য আমি এরকম কোনো নির্দেশ দিই নি। শোনামাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ল অ্যাটকিন্স কাপ্তেনের পায়ের উপর। আর সে কী কান্না!—দোহাই আপনার, মালিককে বলুন, আমি আর এমন অপরাধ কখনো করব না। আমাকে যেন প্রাণে না মেরে ফেলেন।

শুনে বাকিরা বলল, মালিককে আমাদের হয়েও একটু বলুন। দেশে ফিরে যেতে আমরা চাই না। ফিরে যাওয়া মানেই ফাঁসি কাঠে মৃত্যু। বরং আমরা এখানেই থাকব। দোহাই আপনার। আমাদের যেন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়।

মোটামুটি পরিকল্পনা মতোই কাজ এগোচ্ছে। সেটা আমাদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এমতাবস্থায় জাহাজ দখলের ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে এবং আমার অস্তিত্ব ঘোষণারও প্রয়োজন আছে। তখন পাঠিয়ে দিলাম একজনকে। বললাম, যাও গিয়ে বল, কাপ্তেন যেন আমার সাথে একবার দেখা করে।

সে সবাইকে শুনিয়ে বলল, কাপ্তেন, আপনাকে মালিক তলব করেছেন।

অমনি তড়িঘড়ি উঠে পড়ল কাপ্তেন। বলল, যাও তুমি গিয়ে মালিককে বল, যেন অপরাধ না নেন—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে তখন বন্দিরা। এটা ফ্রাইডের কাছ থেকে পরে আমি শুনেছিলাম। হয়তো মালিকের তরফ থেকে ফের কী নির্দেশ আসে, তারই জন্যে এই হতবিহ্বল ভাব। তা এল কাপ্তেন। আমি জাহাজ দখলের ব্যাপারে আমার পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করলাম। শুনে ভারি খুশি। ঠিক হলো পরদিন ভোরেই আমরা কাজে লেগে পড়ব।

ভোরে উঠে প্রথম কাজ হলো বন্দিদের দু ভাগে ভাগ করা। অ্যাটকিন্স সমেত বাকি দুই দুশমনকে নিয়ে যাওয়া হলো গুহায়। হাত পা বেঁধে বাকিদের দলে ফেলে রাখা হলো। এটা করল ফ্রাইডে আর প্রথম নৌকোয় আসা সেই দুষ্ট সাকরেদ। বাকিদের পাঠালাম আমার মাচানে। হাত পা তাদেরও শক্ত করে বাঁধা। নিরাপদ আশ্রয়। মই নেওয়া হলো সরিয়ে। তদুপুরি চারদিক ডাল পাতার ঘেরা। বাইরের কেউ যে দেখতে পাবে এমন সম্ভাবনা নেই। খানিক পরে পাঠালাম মাচানে কাপ্তেনকে।—যাও, তুমি গিয়ে এবার ওদের সঙ্গে কথা বল।

কথা অর্থাৎ দলে টানবার চেষ্টা। যদি এদের পাঠানো যায় জাহাজে। আচমকা গিয়ে অবাক করে দেবে বাকি নাবিকদের। তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। বন্দি হবে তারা। তারপর আমরা গিয়ে নিরাপদে জাহাজের দায়িত্ব নেব।

বলতে তো আর কোনো অসুবিধা নেই। মালিকের নাম উল্লেখ করে একেকটা কথা ছেড়ে দিলেই হলো। ভয় দেখাল খুব। বলল, দেশে ফিরে যাবার অর্থই হলো ফাঁসি। আর এই দ্বীপে থাকা মানে চিরতরে নির্বাসন। যদি এমতাবস্থায় তারা আমাদের মন মতো কাজ করার অঙ্গীকার করে। যদি জাহাজে গিয়ে অতর্কিতে ঘায়েল করতে পারে বিদ্রোহী নাবিকদের, তবে মালিককে বলে সে কমিয়ে দেবে তাদের শাস্তির মাত্রা। যেন তারা ভেবে দেখে।

এরকম প্রস্তাবে যে তৎক্ষণাৎ সম্মতি মিলবে এত জানা কথা। যেকোনো শিশুও বলে দিতে পারে। অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাপ্তেনের পায়ের উপর। আর প্রতিজ্ঞা। আর ঈশ্বরের নামে শপথ। তখন কাপ্তেন বলল, বেশ, তবে আমি মালিককে গিয়ে জানিয়ে আসি আমাদের মনোভাব। বলি তাকে সব খুলে। দেখি তিনি কী বলেন।

বলে এল আমার কাছে। মন দিয়ে শুনলাম সব ঘটনা। বললাম, কী মনে হয় তোমার? বলল, আমার মনে হয় আর কোনো রকম গোল পাকাবার চেষ্টা করবে না। বললাম, বেশ, তাহলে ঐ পাঁচ জনকে সঙ্গী হিসেবে নাও। বাকিরা বন্দি অবস্থায় থাকুক। যাদের সঙ্গে নেবে তাদের এটুকু শুধু জানিয়ে দাও, যদি ঠিক ঠিক হিসেব মতো কাজ না করে, তবে তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে বাকি বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া হবে।

কঠোর সিদ্ধান্ত। কিন্তু এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। এরকম একটা হুমকি না দিলে হিসেবে বানচাল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সেই ভাবেই কাপ্তেন গিয়ে বোঝাল। বলল, মালিকের এটাই সংকল্প। এর অন্যথা হবার উপায় নেই। যেহেতু এই দ্বীপের তিনি কর্তা সুতরাং এমনতাবস্থায় তোমার যা ভালো বোঝ করবে।

শক্তিতে এখন আমরা খুব একটা কম নই। লোকবল একুনে চৌদ্দ। কাপ্তেন, তার সহকারী আর সেই নির্দোষ যাত্রী। তারপর প্রথম দলের সেই দুই বন্দি। তারা এখন পুরোপুরি আমাদেরই অনুগত। তাদের হাতে বন্দুক দিতে আমার এখন আর কোনো দ্বিধা নেই। এরপর সেই দুই বন্দি—এরাও প্রথম দলের। মাচানে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছিলাম কাল অব্দি। কাপ্তেনের কথায় এখন মুক্ত। এছাড়া বর্তমানের সর্বশেষ মুক্ত সেই পাঁচ বন্দি। মোট বারো। সঙ্গে ফ্রাইডে আর আমি তো আছিই। বন্দি হিসেবে গুহার আড়ালে রইল এখনো পাঁচ জন। এদেরকে মুক্ত করার বাসনা আপাতত নেই। খাবার দাবার যথারীতি হাতের কাছে পৌছে দিই। কোনোক্রমে বাঁধা হাতে খায়। এদের আমরা অতিথি বলেই ধরে নিয়েছি।

কাপ্তেনকে বললাম, আমি আর ফ্রাইডেকে বাদে বাকি বারো জনের দল নিয়ে জাহাজ দখল। অভিযানে যেতে রাজি কি না। বলল কোনো ভয় নেই, নিশ্চয়ই যাব। আপনার অনুমতির শুধু অপেক্ষা! তা আমার আর অনুমতি দিতে অসুবিধা কি। বললাম একটু ধৈর্য ধরুন। আরেকটু কাজ বাকি আছে। সেটা করে নিই।

ফ্রাইডেকে বললাম, এক কাজ কর। দুই বন্দিকে আমার গুহা থেকে বের করে দূরের ঐ গুহাটায় নিয়ে যা। সেখানে আমি ওদের সাথে কথা বলব।

নিয়ে গেল তাই। তখন আমি আর কাপ্তেন গেলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে। কাপ্তেন আমাকে দেখিয়ে বলল, একেই মালিক হুকুম দিয়েছেন তোমাদের দেখা শোনা করার জন্যে। একে অমান্য করো না। বিপদে পড়বে। তাহলে ধরে ধরে নিয়ে যাবে দুর্গে। সেখানে অন্ধকূপ আছে। আর এক ঝাঁক সৈন্য। লোহা ভারী ওজন চাপা দিয়ে রাখবে তোমাদের। আরো নানারকম শাস্তি দেবে। সে সাংঘাতিক। আমি ভাবতে পারছি না।

তখন সেই রেশ টেনে আমি ফেঁদে বসলাম নানান আজগুবি গল্প। তাতে চোখ তাদের ছানাবড়া। বলল, এতটুকু গোলমাল কেউ করবে না। শান্তি বজায় রাখবে। আমি যেন মালিককে বলি, যে প্রাণে তাদের না মারেন।

মোটামাট সবই শুভ। কাপ্তেনের রওনা হতে আর কোনো অসুবিধে নেই। বন্দি সংখ্যা পাঁচ। তার থেকে তিন জনকে আমরা আলাদা করতে পারলাম। এতে সমবেত শক্তি হ্রাস

পাবে। দু'জন রইল এধারে। বাকি তিন জন আরেক গুহায়। চেষ্টা করে কেউ পারবে না কারো হদিস বের করতে। তো ভাবনা কী!

রওনা হলো কাপ্তেন। দুটো নৌকোয় দু দল। একদলে সেই যাত্রী, চার বন্দি আর সে নিজে, আরেক দলে সহকারী আর পাঁচ বন্দি। বের হলো যখন বেশ রাত। জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বারোটা। রবিনসন ডাকল একজন নাবিকের নাম ধরে। বলল লোকজন নিয়ে নৌকো নিয়ে তারা ফিরে এসেছে। শুরু হলো এই নিয়ে খোশ গল্প। ইত্যবসরে কাপ্তেন আর তার সহাকারী পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠল গিয়ে জাহাজে। অর্তকিতে বিদ্রোহী নাবিকদের দুই পাণ্ডাকে ঘায়েল করল। উঠে পড়ল হৈ হৈ করে বাকিরা। তখন আর পায় কে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো জাহাজ নিজেদের অধীনে।। বিদ্রোহী সকলেই বন্দি। হাত পা বেঁধে ঘরে আটক করা হলো সবাইকে।

তখনো গভীর ঘুমে নিমগ্ন বিদ্রোহের প্রধান পাণ্ডা। সেও কাপ্তেনের আরেক সহকারী। তাকে হাঁকডাক করে তোলা হলো। উঠে দেখে সামনে কাপ্তেন। হাতে উদ্যত পিস্তল। তখন তো ভূত দেখার সামিল। ধাতস্থ হতে লাগল সামান্য কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে কাপ্তেনের দিকে দিল একলাফ। অমনি গুলি। মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেল কানের ওপরে খুলি ফুটো করে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল মেঝেয় মস্ত শরীর। যেন কাটা গাছ। ব্যস, খতম সব। বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন। অমনি তোপ ঘরে গিয়ে পরপর সাতবার কামান দাগল কাপ্তেন। এটা আমারই নির্দেশ। জাহাজ যে দখল হয়েছ সেটা জানান দেবার ইচ্ছা। আমার তো আর আনন্দ ধরে না জেগে আছি সারারাত কখন শুনব এই আওয়াজ সেজন্যে। দেখি তখনো প্রায় এক প্রহর রাত বাকি। আর ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। সারা শরীরে অদম্য এক ক্লান্তি। শুয়ে পড়লাম মাটির উপরই। অমনি ঘুমে সারা শরীরে তলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। বন্দুক গর্জে উঠল যেন কোথায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কে যেন ডাকছে আমাকে দুহাতে। হাসছে কিন্তু চোখে জলের ধারা। বলল, ঐ দেখুন জাহাজ, আপনার জাহাজ। আপনি রক্ষাকর্তা। আপনি আমাকে না বাঁচালে আজ এই জাহাজ উদ্ধার করতে পারতাম না। আমিও সে অর্থে আপনার সেবাদাস। আদেশ করুন এবার কী করতে হবে!

তাকিয়ে দেখি মাত্র আধ মাইল দূরে জাহাজ নিয়ে এসেছে কাপ্তেন। নোঙর ফেলেছে। আবহাওয়া শান্ত। ভয়ের কোনো কারণ নেই। নৌকো বেয়ে চলে এসেছে কাপ্তেন আমাকে খবর দিতে। নৌকো নালায় বাঁধা। আমাকে সেটাও আঙুল দিয়ে দেখাল।

অর্থাৎ মুক্তি আমার আসন্ন! এটা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই বন্দি দশা, নির্জন দ্বীপবাসের এই আঠাশ বছর প্রায়—এর থেকে মুক্তি। আমি কি জাগরণে না নিদ্রায়! গায়ে চিমটি কাটলাম জোরে। ব্যথা লাগল। তবে তো জেগেই আমি। সত্যিই তাহলে মুক্তি এবার পাব। সারা শরীরে রক্ত যেন মুহূর্তে ঝলাৎ করে উঠল। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আঁকড়ে ধরলাম কাপ্তেনের হাত সজোরে। কে জানে, আমি হয়তো চরম উত্তেজনায় মাটিতে পড়ে যাব।

আমার যে এই অবস্থা সেটা কাপ্তেনের নজরে গেছে। অমনি পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বের করে ছিপি খুলে ঢেলে দিল আমার মুখে। ব্র্যান্ডি। শরীরে যেন বল পেলাম। পরে বলেছিল, আমার কথা ভেবেই নাকি বোতল পকেটে করে আনা।

আর সে যে কত শ্রদ্ধা, কত প্রশংসা, কত প্রাণখোলা ভালোবাসার কথা! যেন ঘোরে রয়েছে মানুষটা। আশ্চর্য সেই ঘোর। কথায় পেয়ে বসেছে। বুকের মধ্যে জমাট শেষ কথার বিন্দুটি অব্দি বের না করে দিয়ে শান্তি নেই।

আমারো কথা জমে আছে বুকের মধ্যে অনেক। জড়িয়ে ধরলাম ফের। বললাম, তুমি আমার পরিত্রাতা। তোমার সহযোগিতা না পেলে আমিও কি পারতাম এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পেতে? ঈশ্বরের প্রেরিত দূত তুমি। তোমাকে তিনিই আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমার এই ভালোবাসা, এই সহযোগিতার কথা আমি জীবনে ভুলব না।

বলে হাঁটু গেড়ে বসলাম মাটিতে। দেখাদেখি সেও। দুহাত শূন্যে তুলে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরকে।—প্রভু, তুমি সুখে দুঃখে মানুষের সঙ্গী। মানুষকে তুমিই ফেল দুঃখ সাগরে আবার তুমিই তার ত্রাণ কর। তোমাকে প্রণাম। শত কোটি প্রণাম।

কাপ্তেন বলল, এই আনন্দের দিনে জাহাজ থেকে আমার জন্যে সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। যদি আমি সম্মতি দিই আমাকে দিতে পারে। বললাম, বেশ তো, দাও না। তখন নৌকার লোকটাকে ডেকে কী যেন বলল। নিয়ে এল সে মস্ত এক কাঠের পেটি। খুলে ফেলল ঢাকনা। দেখি নানান জিনিসে বোঝাই। সুস্বাদু পানীয় থেকে শুরু করে তামাক, টিনে ভরা গরুর মাংস, বিস্তর বিস্কুট, কিছুটা শুয়োরের মাংস আর সেদ্ধ মটর, সঙ্গে এক প্যাকেট চিনি, এক বোঝাই লেবু, দু বোতল লেবুর রস, আরো কত যে টুকিটাকি আমার সব মনে নেই। সব থেকে ভালো লাগল ছ প্রস্থ পোশাক দেখে। সব নতুন। তাতে শার্ট থেকে শুরু করে পাৎলুন, গলাবন্ধ এবং রুমাল অব্দি আছে। জুতোও এনেছে এক জোড়া, সঙ্গে মোজা। আর একখানা জাঁদরেল টুপি। মোটমাট সাজাবে দ্বীপের মালিককে। সাজটা যাতে মালিকের মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তো!

পরলাম এক প্রস্থ পোশাক। বলব কী, এতদিন পর এমন অস্বস্তি লাগছে। বেশ খানিকক্ষণ লাগল নিজেকে পোশাকের সাথে মানিয়ে নিতে। তারপর মোটামুটি খানিকটা ধাতস্থ হলাম।

পেটি পৌঁছে দিয়ে গেল আমার গুহায়। দেবে,—আমি যে মালিক! বসলাম দু'জনে মুখোমুখি। বন্দিদের নিয়ে কী করব সেটা ঠিক করার প্রয়োজন আছে। রাস্তা আমাদের সামনে দুটো। এক, নিয়ে যেতে পারি তাদের সঙ্গে করে আমাদের সাথে, কিংবা এখানে নির্বাসন দিতে পারি। তবে সবাইকে নয়। আমাদের মূল নজর সেই দুই দুশমনের দিকে। এদের নিয়ে কী করব সেটাই সমস্যা। কাপ্তেন দেখি যা বলি তাতেই ইতস্তত করে। অর্থাৎ ঠিক কী করবে সেটা স্থির করতে পারছে না। তখন বললাম, বেশ তো, যদি ইচ্ছে হয় তোমার, আমি নয় দু'জনকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করি। তুমি কথা বল। এমনভাবে বল যাতে ওরা নিজেরাই এখানে নির্বাসিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

কাপ্তেন রাজি। বলল, তাই ভালো। আপনি এখানে ওদের আনান। আমি কথা বলব। তবে হ্যাঁ, আপনাকেও থাকতে হবে।

তখন পাঁচ বন্দিকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মাচানে নিয়ে যাবার জন্যে ফ্রাইডে আর দুই সঙ্গীকে হুকুম দিলাম। বললাম, আমি না পৌঁছানো অব্দি তাদের যেন কড়া পাহারায় রাখা হয়। কেউ যেন পালাতে না পারে। সাবধান!

হলো তাই। ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা দেরি করে আমি গিয়ে হাজির হলাম। পরনে আমার নতুন পোশাক। পৌঁছবার সাথে সাথে 'মালিক' 'মালিক' বলে কাপ্তেন আর ফ্রাইডের

যা ডাকাডাকি আর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঘটা! বললাম, নিয়ে আয় এবার ওদের আমার সামনে। তখন নিয়ে এল। সব বললাম আমি। তাদের দুর্ব্যবহার—সব। শেষে বললাম, বল এবার, এর শাস্তি হিসেবে কী তোরা প্রত্যাশা করিস।

বলে না কিছুই। দেখি চুপচাপ। তখন বললাম, জাহাজ আর তোদের দখলে নেই। আমরা দখল করেছি কাল রাত্রে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। তোরা পাপী। পাপীরা পৃথিবীতে নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা নিজ নিজ কবর খনন করে। তোরা এখন সেই কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। ফাঁসি হবে তোদের। এক একটাকে গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেব, তারপর আমরা এখান থেকে রওনা দেব।

একজন বলল, কাপ্তেন বন্দি করার সময় নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের জানে মারবে না। তবে এখন কেন এই ফাঁসির আদেশ? বললাম, ফাঁসি ছাড়া তোদের আর কিছুই প্রাপ্য নেই। এখান থেকে যদি তোদের বন্দি অবস্থায় দেশে নিয়ে যাই, তবে সেখানেও তোদের ফাঁসি হবে। বল এখন, কোথায় ফাঁসি যেতে তোদের ইচ্ছে।

তখন অনুনয় বিনয় করল। দয়া প্রার্থনা করল। জীবন রক্ষার জন্যে আবেদন জানাল। বললাম, বেশ তবে শেষ কথা আমার। জীবন রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু দেশে নয়, এখানে। আমিও লোকজন নিয়ে জাহাজে করে ফিরে যাব বলে ঠিক করেছি। এখানে তোদের রেখে যাব। এছাড়া তৃতীয় বিকল্প আর কিছু নেই। বল সেটা তোদের মনঃপূত কিনা।

সবাই একবাক্যে আমাকে সাধুবাদ জানিয়ে আমার প্রস্তাবে সায় দিল। কাপ্তেন বলল, নানা, এটা ঠিক নয়। আমার এতে মত নেই। এ আপনি কী করলেন?

শুনে ভীষণ যেন রেগে যাচ্ছি আমি, সেইরকম ভঙ্গি করে বললাম, তোমার মত আছে কি না, সেটা আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। এরা আমার বন্দি। এদের নিয়ে যা ইচ্ছে আমিই করব। আমি এদের মুক্তি দেব। যদি সেটা তোমার মনঃপূত না হয়, তবে মুক্তি দেবার পরে তুমি এদের ফের বন্দি করতে পার। তখন যা খুশি করবে, আমি বাধা দেব না।

কাজে লাগল আমার ছদ্ম রাগ। দেখি তাতে আরো সন্তুষ্ট। অজস্র সাধুবাদ জানাল আমাকে। বললাম, এদের বাঁধন খুলে দাও। তখন বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। বললাম তোমরা এবার মুক্ত। বনে বনে স্বাধীন ভাবে বিচরণের অধিকারী। আমি তোমাদের বন্দুক দেব সকলকে, আর গোলাবারুদ। অন্যান্য নানান ব্যবস্থা আছে আমার। যেমন ক্ষেত, যেমন পশুপালন। এগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেব। তোমাদের জীবনধারণে এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কাপ্তেনকে বললাম, তুমি জাহাজে চলে যাও। আমি আজকের রাতটুকু এখানেই থাকব। শেষ মুহূর্তের কিছু কিছু কাজ এখনো বাকি। কাল ভোরে তুমি নৌকোটা আমার জন্যে পাঠিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, জাহাজের নতুন কাপ্তেন সেই শয়তানটাকে সবার চোখের সামনে ফাঁসি দিও। যেন ভুল না হয়। আমি যেন গিয়ে তাকে জীবিত না দেখি।

বলা বাহুল্য, এটা সকলকে শুনিয়ে বলা। সে শয়তান কাপ্তেনের হাতে কাল রাতেই মরেছে। মরা মানুষকে নতুন করে ফাঁসি দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এদের শোনাবার প্রয়োজন আছে। এরা ভয়ে আতঙ্কে নতুন কিছু অঘটন ঘটাবার সাহস পাবে না।

চাবুক মারা হলো

কাপ্তেন চলে গেল জাহাজে। আমি বন্দিদের নিয়ে আমার ডেরায় গেলাম। আলোচনা হলো অনেকক্ষণ ধরে। সব বললাম, বোঝালাম সব কিছু। মৃত্যু আর নির্বাসন—দুটোর মধ্যে যে তারা নির্বাসন মেনে নিয়েছে এতে আমি খুশি। সেটা জানালাম। তারপর শোনালাম আমার দ্বীপে আগমন থেকে এ পর্যন্ত এই ছাব্বিশ বছরের ইতিবৃত্ত। ঘটনা সবই, কিন্তু এখন নিজের কানে লাগছে যেন গল্পের মতো। তারাও গল্প শোনার মতো করেই শুনল। অর্থাৎ ভয়ডর নয়, ব্যাপারটার মধ্যে যে আগাগোড়া রোমাঞ্চের ছোঁয়া আছে, সেটা মোটের উপর হাবেভাবে বুঝলাম তাদের বেশ চমৎকৃত করেছে। তারপর নিয়ে গেলাম আমার ক্ষেত দেখাতে। কীভাবে চাষ করি, কী তার যন্ত্রপাতি, আঙুর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। ছাগলের খোয়াড় কোথায়—সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। ষোলো জন স্পেনীয় নাবিকের কথাও বললাম। যেকোনো মুহূর্তে তারা এখানে হাজির হতে পারে। যেন তাদের সাথে বিন্দুমাত্র অসদাচরণ না করা হয়। বন্ধুর মতোই যেন গ্রহণ করা হয় সকলকে।

মোট আটটা বন্দুক আমার। সব তুলে দিলাম তাদের হাতে। আর তিনখানা তলোয়ার। প্রায় দেড় পিপে বারুদ এখনো মজুত। এখানে আসার বছর দুই পর থেকে তেমনভাবে বারুদ তো আর ব্যবহার করি নি। বলতে গেলে বেশির ভাগটাই রয়ে গেছে। ছাগল কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়, ধরতে হয় কীভাবে এতটুকু বারুদ না খরচ করে—সেটাও শিখিয়ে দিলাম। আর শেখালাম দুধ দোওয়াবার কৌশল। দুধ থেকে কী কী বানাতাম, কেমন করে বানাতাম, সব শেখালাম। অর্থাৎ বাদ কোনো কিছুই নেই। দ্বীপে আমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, তার সংগ্রাম, আত্মরক্ষার জন্যে নানান উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া—সব কিছুর সাথে ঘটনাকে মিশিয়ে বললাম প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণ। বললাম, কাপ্তেনকে বলে আরো দু পিপে বারুদ যাতে তোমাদের দিয়ে যাওয়া যায় আমি তার ব্যবস্থা করব। আর মটর দানার থলিটা হাতে তুলে দিলাম। বললাম, চাষ করো। ভালো ফলন হবে। এটা তোমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার নতুন সংযোজন।

আর একটা মাত্র কাজ বাকি। সবই এক ঠাঁই বসে নৈশ ভোজ। কাপ্তেনের পাঠানো জিনিস আর সঙ্গে আমার ঘরোয়া সব কিছু মিলে মিশে জমল সে যা দারুণ! খুব হৈ হৈ হলো। দ্বীপে এই আমার শেষ রজনী। কাটল সারারাত গভীর উত্তেজনার মধ্যে। ছাব্বিশ বছরের নির্বাসিত জীবনের কালই হবে তাহলে শেষ! ভোর হতে দেখি কাপ্তেনের প্রেরিত নৌকো হাজির। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমি গিয়ে নৌকোয় উঠলাম।

রাত্রেই ছাড়ার কথা জাহাজ, ছাড়া হলো না। এটাও আমাদের আগে থেকে ঠিক করা ফন্দি। পরদিন ভোর তখন। দেখি পাঁচ জনের দু'জন এতখানি পথ সাঁতরে এসেছে। ঘুরছে জাহাজের আশেপাশে। আর সেই কী কাতর আবেদন!—দোহাই আমাদের নিয়ে চলুন। এখানে রেখে গেলে আমরা বাঁচব না। ওরা আমাদের কালই মেরে ফেলবে। হোক ফাঁসি, তাও সই, তবু দেশে যাব। ওদের হাতে কিছুতে মরব না।

শুনে কাপ্তেন বলল, বুঝলাম তো সব, কিন্তু আমার যে কিছু করার ক্ষমতা নেই। মালিক মত না দিলে আমার যে হাত পা বাঁধা। তখন আমাকে তলব করে আনা হলো। শুনলাম মন দিয়ে প্রতিটি কথা। কাপ্তেনকে বললাম, বেশ, এদের জাহাজে তুলে নাও। কিন্তু অপরাধী এরা। তার শাস্তি এদের প্রাপ্য। চাবুক মারো এদের। একদিন উপোস থাকুক। এতেও যদি পাপের বোঝা লাঘব না হয় তবে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

হলো তাই। চাবুক মারা হলো। অনাহারে রাখা হলো। টুঁ শব্দটি অব্দি করল না। তারপর খাবার দিলাম। স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলাম। কোনো দিন আর ভুল করে কখনো মাথা গরম করে নি বা অবাধ্য হয় নি।

দু'জনকে জাহাজে তুলে নেবার পর নৌকো নিয়ে কজন গেল কূলে। সঙ্গে এটা ওটা নানান জিনিস। যেগুলো আর কি ওদের পাঠিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম। অধিকন্তু কাপ্তেন নিজে দয়াপরবশ হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এক বাক্স জামা প্যান্ট। এটা উপরি পাওনা। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি আপত্তি করি নি। সে যাই হোক, বলে পাঠালাম, যেন শান্ত ও সুস্থির হয়ে থাকে। আমি দেশে পৌঁছে এদিকে যে জাহাজ আসবে তাকে বলে দেব তাদের কথা। যেন ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা নিছক প্রতিশ্রুতি নয়। যাতে আসে কেউ, সেদিকে আমি নজর রাখব।

হ্যাঁ ভালোকথা, বলতে ভুলে গেছি,—জাহাজে ওঠার আগে কিন্তু আমার সেই বিখ্যাত ছাতা আর টুপি আর ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী সেই বিকট দর্শন পোশাক সঙ্গে আনতে ভুলি নি। এর সাথে আমার ছাব্বিশ বছরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই যে মুদ্রা কটা কিংবা সোনা রুপোর সেই কটা টুকরো—তাও নিয়েছি সাথে। সভ্য জগতে ফিরছি যখন এগুলো এবার প্রয়োজনে লাগবে। তা দেখি জং ধরে গেছে কয়েকটা মুদ্রায়। আর বহুদিনের অব্যবহারে কেমন এক পুরানো পুরানো ছাপ। তবু মুদ্রা বলে কথা! হাজার পুরানো হলেও এর কি প্রয়োজন ফুরোয়!

এবার যাত্রা শুরু। তারিখটা দেখলাম। ষোলোশ ছিয়াশি সালের ১৯ ডিসেম্বর। অর্থাৎ ছাব্বিশ নয়, আমি এখানে আছি মোট আঠাশ বছর। কে জানে কীভাবে দুটো বছরের হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে। সর্বমোট আঠাশ বছর দু মাস উনিশ দিন। তা সব মিলিয়ে এক ইতিহাস বটে। আমার জীবনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নিঃসঙ্গ এক অধ্যায়।

ইংল্যান্ডে পৌঁছলাম ১৬৮৭ সালের এগারোই জুন। সিধে তো আর আসি নি। ঘুরতে হয়েছে বিস্তর। হিসেব করে দেখলাম, মোট পঁয়ত্রিশ বছর পর আমার ফের ইংল্যান্ডে পদার্পণ। বাড়ি থেকে পালাবার পর সুদীর্ঘ কাল কেটে গেছে। আমি এতদিন সেটা বুঝতে পারি নি।

এবং যা সচরাচর ঘটে থাকে। এতদিন পরে এল একটা মানুষ—সে তো অচেনা অজানা এই দেশে, যেন ভীনদেশি আগন্তুক। সবই প্রায় বদলে গেছে। আগের ছবির সঙ্গে কিছুই আর মেলাতে পারি না। তা সেই যে পুরানো কাপ্তেনের স্ত্রী, টাকা পয়সা মজুত রেখে গিয়েছিলাম যার কাছে,—দেখি এখনো তিনি বেঁচে আছেন। বড় দয়া আমার উপর। মাঝে নাকি আর একবার বিয়ে করেছিলেন। সে স্বামীও মারা গেছে। এখন একেবারে একলা। বড় কষ্টে কাটে দিন। আমাকে বললেন, বাছা আমার যে সে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য এখন নেই। বললাম, তার জন্যে কি! আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার ভালোবাসা আমি জীবনে ভুলব না। এই নিন, এই সামান্য কিছু অর্থ রাখুন। বলে সঙ্গের আনা সেই অর্থ—তার বেশির ভাগটাই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

গেলাম তারপর ইয়র্কশায়ারে। আমাদের বাড়ি যেখানে। কোথায় সেই বাড়ি! দেখি তার চিহ্নমাত্র নেই। খোঁজখবর করে জানলাম বাবা মা দু'জনেই গত হয়েছেন। বাবা আগে, মা তার পর। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি আর বেঁচে নেই। ফলে আমার জন্যে মা কিছু উইল করে রেখে যাবারও প্রয়োজন মনে করেন নি। থাকবার মধ্যে আছে শুধু দুই বোন। তারা কেউ আমাকে দেখে নি। আমি পালাবার পর তাদের জন্ম। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। অসীম দূরত্ব যেন আমার আর তাদের মধ্যে। সেই ভাবেই দায়সারা গোছের কিছু কথা বলল। আমিও মানে মানে জবাবের পাট চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থাগমের সুযোগ হলো। খবর দিয়ে একদিন ডেকে পাঠাল জাহাজের সেই কাপ্তেন। যেটাতে করে আমি আর কি ফিরে এলাম। দেখি একদল মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ হাজির। বণিক সকলে। তাদেরই জাহাজ। আমার বিস্তর প্রশস্তি করল। আমি যে রক্ষা করেছি কাপ্তেনকে তথা মালপত্র বোঝাই তাদের জাহাজটাকে, সেজন্যে অজস্র সাধুবাদ দিল এবং সবশেষে হাতে তুলে দিল দুশ পাউন্ডের নোট। এটা কৃতজ্ঞতার স্মারক। বলল, ক্ষুদ্র এই পারিতোষিক। আপনি নিন। আমি নিলাম।

ইংল্যান্ডে আর নয়, যাব এবার লিসবনে। সেখান থেকে ব্রাজিল। ক্ষেত তো ছিল সেখানে আমার, সেটার কী অবস্থা দেখার জন্যে কদিন ধরেই মন কেমন করছে। উঠে বসলাম জাহাজে, সঙ্গে আমার চিরসাথী চিরমিত্র ফ্রাইডে। আমার অনুচরও বলতে পারেন। অনুগত বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই।

পৌঁছতে পৌঁছতে পরের বছর এপ্রিল। চেনা জানা কে আর আছে এখানে। সেই কাপ্তেন? আছেন কি তিনি এখনো বেঁচে। খবর নিয়ে দেখি জীবিত আছেন। বুড়ো হয়েছেন। এখন আর জাহাজ নিয়ে বের হন না। ছেলে হয়েছে এখন কাপ্তেন। সে-ই সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমায়। তা আমাকে তো কিছুতেই চিনতে পারেন না। আমিও চেহারা দেখে পারি না ঠাওর করতে। শেষে পুরানো দিনের কথা তুলতে সব মনে পড়ল। তখন পরস্পরকে চিনতে পারলাম।

সে যা আনন্দ তখন! উচ্ছ্বাস! আমার ক্ষেত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন আমি চলে যাবার পর একজন অংশীদার নিয়েছিলেন তিনি ব্যবসায়। পরে তারই হাতে আমার অংশ দেখাশোনার ভার তুলে দিয়েছেন। ন বছর যান নি ব্রাজিলে। ন বছর আগে অব্দি দেখে এসেছেন, সেই অংশীদার বহাল তবিয়েতে বর্তমান। আমি যেন গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

মুখে মুখে হিসেব যা দিলেন, তাতে আমার ভাগে বিস্তর অর্থ জমার কথা। তবে যেহেতু দীর্ঘদিন আমার কোনো খবর নেই, আমার অংশের যাবতীয় প্রাপ্তি জমা হয়েছে রাজসভা নিযুক্ত জনৈক অছির হাতে। এরকম নির্দেশ আছে, যদি আমি কোনোদিন না ফিরি

তবে সমগ্র প্রাপ্তির এক তৃতীয়াংশ যাবে রাজকোষে, বাকি দুই তৃতীয়াংশ যাবে গির্জার তহবিলে। ফেরৎ এলে সব টাকাই আমার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে টাকার যে অংশ গির্জা দরিদ্র সেবায় বা দানখয়রাতির কাজে ব্যয় করবে, সেটা ফেরৎ পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

বললাম, কীরকম প্রাপ্তি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

বললেন, সঠিক ভাবে বলতে পারব না। তবে অংশীদার যে আমার, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, কয়েক বছরের মধ্যে সে বিরাট ধনীতে পরিণত হয়েছে। রাজকোষে জমা পড়ে প্রতিবছর যে এক তৃতীয়াংশ, তা নাকি দুশ মোহরের সমান। বললেন, অসুবিধা কি তোমার? তোমার নাম তো সরকারি খাতায় এখনো অংশীদার হিসেবে তোলা আছে। শুধু প্রমাণ করতে হবে এই যা সমস্যা। তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। অছি পরিষদে দু'জন সদস্য আছেন, আমার বন্ধুস্থানীয়। আমি তাদের চিঠি লিখে দিচ্ছি, দেখ কাজ হবে।

বললাম, কিন্তু অছির হাতেই বা গেল কেন আমার অংশ? এটা তো আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না। আমি তো যাবার আগে আপনার নামে সব উইল করে দিয়ে গিয়েছিলাম। স্পষ্ট তাতে লেখা ছিল আমার অবর্তমানে আপনি যাবতীয় সম্পত্তির মালিক। সেটাকে তারা মানবে না কেন?

বললেন, মেনে ছিল, কিন্তু শেষ অব্দি সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে নি। অর্থাৎ আমি যে মারা গেছি এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। মারা গেলে তবে তো উইলের নির্দেশ বর্তাবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে আমি নিরুদ্দেষ্ট এবং সেই মর্মে আমার যাবতীয় সম্পত্তি অছির হস্তগত হয়েছে। আমি যদি ফের আমার দাবি পেশ করে প্রমাণ করতে পারি আমি জীবিত এবং আমিই সেই লোক, তখন ওরা সম্পত্তি আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।

অছির হাতে গিয়েছে আমার চলে যাবার ছ বছর পর। এই ছ বছর লাভের টাকা তাঁর হাতেই দেওয়া হয়েছে। তার হিসেবও রেখেছেন নিখুঁত ভাবে। সব মিলিয়ে প্রায় চারশ সত্তর মোহর। আক্ষেপ করলেন তাই নিয়ে। বললেন, একটি পয়সাও আমি রাখতে পারি নি। সব গেছে। খরচ হয়েছে কিছু। যেমন ধর তোমার জমিতে কাজ করার জন্যে ক্রীতদাস কিনতে হয়েছে চার জন, আরো টুকিটাকি এটা ওটা খরচ। এই তার তালিকা। বাকি টাকা আমি জাহাজ ব্যবসায় লাগিয়েছিলাম। ডুবে গেছে সে জাহাজ। আমাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। জানি না তোমাকে নগদে শোধ করতে পারব কিনা। তবে ছেলেকে বলেছি, সম্প্রতি বহু কষ্টে সামান্য সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে যে জাহাজ কিনেছে তাতে যেন তোমাকে অংশীদার করে নেয়। যদি লাভ হয়, তুমি তার অর্ধেক পাবে। আর যদি ডুবে যায় জাহাজ, তবে গেল সব। ধরে নাও এটা তোমার লোকসান।

বললেন, সেই মর্মে অচিরে দলিল তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আর সিন্দুক থেকে ছোট্ট একটা গেঁজে বের করে আমাকে দিলেন। বললেন, এটা রাখ। এই আমার শেষ সঞ্চয়। একশ ষাটটি মোহর আছে। আমি বহুকষ্টে জমিয়ে রেখেছি। এটা তোমারই প্রাপ্য।

বলব কী, চোখে তখন আমার জল এসে গিয়েছে। জমাট বাঁধা অশ্রু। আমার প্রকৃত বান্ধব এই বৃদ্ধ মানুষটি। কত কষ্ট আজ তাঁর, তবু তুলে দিলেন হাতে আমার প্রাপ্য। কিন্তু কেমন করে নিই আমি এ টাকা? ফেরৎ দিতে চাইলাম, কিছুতে নেবেন না। তখন বললাম, বেশ, এক কাজ করুন, এই ষাটটা মোহর আপনি রেখে দিন আর কাগজ কলম দিন আমাকে। দিলেন কাগজ। লিখলাম, আমার সমস্ত পাওনা সজ্ঞানে বুঝিয়া পাইলাম। নিচে সই করে লিখে দিলাম তারিখ।

বৃদ্ধের চোখে তখন টলটল করছে অশ্রু।

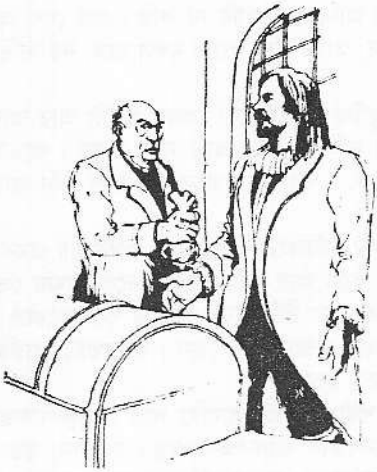

এটা রাখো এই আমার শেষ সঞ্চয়

নিজেকে সংবরণ করতে কিছুটা সময় গেল। বললেন, এক কাজ কর। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। যদি বন্ধুদের দিয়ে কোনো কারণে কোনো কাজ না হয় তার জন্যে নতুন একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাক। লিসবন থেকে কদিনের মধ্যে ব্রাজিলের দিকে চলেছে এক জাহাজ। তাতে তোমাকে যাত্রী হিসেবে দেখিয়ে দিই। যেতে হবে না তোমাকে এই মুহূর্তে ব্রাজিল। সেটা আমি ব্যবস্থা করব। আমার বন্ধুর জাহাজ। তুমি যে যাত্রী সেটা এখানকার একজন সরকারি মুখপাত্র লিখে দিক। সেটাও আমিও ব্যবস্থা করব। পরে কোনো আকস্মিক কারণে তোমার যাত্রা বাতিল হবে। জাহাজের কাপ্তেনের হাত দিয়ে ব্রাজিলের রাজদরবারে আর তোমার সেই অংশীদারের কাছে চিঠি দিয়ে দাও। তোমার যাবতীয় প্রাপ্য তারা যেন এই জাহাজেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

তাই হলো। আমি তো তখন যেন ঘোরের মধ্যে আছি। চিঠি দিলাম। তার পর প্রতীক্ষা। সাত মাস পরে দেখি জাহাজ ফিরে এসেছে। তাতে আমার নামে মস্ত বড় একটা পেটি। সে একবারে বিশাল। সঙ্গে চিঠি। আর একটা খামে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

এ পর্যন্ত আমার সমস্ত প্রাপ্য অর্থের হিসেব ওরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে অর্থও। সেটা পেটির মধ্যে আছে।

ছ বছরের কাপ্তেনের হাতে লাভ বাবদ যা দিয়েছিল, তা ছাড়াও আমার যা প্রাপ্তি তা এতদিনে সুদেমূলে হয়েছে ১১৭৪ মোহর।

প্রথম চার বছর অছির হাতে ছিল পুরোপুরি হিসেব নিকেশের ভার। তাতে আমার নামে সঞ্চয় একুনে সুদে আসলে মোট ৩২৪১ মোহর।

রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ বিলিবন্টন হয়ে তলানি হিসেবে যেটুকু পড়ে আছে তার মুদ্রামূল্য মোট ৮৭২ মোহর। এ ছাড়াও গির্জার কোষাগারে কিছু সঞ্চয় আছে। সেটা আমি যদি দাবি করি তবে তারা দিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু দাবি করব কি করব না সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন।

অর্থাৎ বলতে চায় আমি যেন দাবি না করি। তো বেশ আমার অত গরজ কীসের! সৎকাজে ব্যয় হবে টাকা, তাতে পাঁচ জনের মঙ্গল হবে, নয় দাবি না-ই করলাম। কী এসে যায়।

আর অংশীদার বন্ধুটির চিঠিতে তো কেবল প্রশস্তি আর আপ্যায়নের ঘটা। কবে যাব আমি তারই জন্যে সে নাকি উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। আমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করেছে বারবার সঙ্গে ভেট। পাঠিয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি আর চুরুট। তারও অর্থমূল্য কম নয়।

মোটমাট এখন আমি রীতিমতো বড়লোক। শুরুটা যে এমন দারুণ হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। চিঠি পড়ে আর সব মিলিয়ে দেখে আমার তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবার দাখিল। হাত পা থরথর করে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে। ভাগ্যিস কাপ্তেন ছিলেন পাশে, তাই রক্ষা। আমার শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ। তাড়াতাড়ি ব্র্যান্ডির গ্লাস এগিয়ে দিলেন। তাই খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হলাম।

তবে অসুস্থ হলো শরীর। সেটা অবিশ্যি পরে। আকস্মিকতা থেকেই এই অসুস্থতা। ডাক্তার ডাকা হলো। দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। বললেন, রক্ত নেই শরীরে, রক্ত দিতে হবে। তখন রক্ত দেওয়া হলো। তাতে খানিকটা চাঙ্গা হলাম। পরে ধীরে ধীরে অসুস্থতা সম্পূর্ণভাবে কেটে গেল।

আসলে অর্থই ঘটায় মানুষের জীবনে অনর্থ। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এলাম এদেশে,—সভ্য জগতের মাঝখানে, অমনি রক্তশূন্য হলো শরীর। কই, থাকতাম যদি দ্বীপে, এসব ঝকমারি কি পোয়াতে হতো। আর টাকা হয়েছে বলেই না এত গোলমাল! টাকার জোরেই না এল এতবড় ডাক্তার! ধনী মহারাজ যে আমি এখন। বিশাল বিপুল অর্থের মালিক। প্রায় ৫০০০ স্টার্লিং আমার হাতে। প্রতিবছর হেসে খেলে ফেলে চড়িয়ে জমা হবে আরো হাজার স্টার্লিং আমার নামে। কিন্তু কী করে খরচ করব এত টাকা!

পয়লা কাজ আমার শুভানুধ্যায়ী আমার পরমাত্মীয় সেই কাপ্তেনকে একশ মোহর ফিরিয়ে দেওয়া। জীবনের শেষ সঞ্চয় বলতে গেলে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। এটা না ফেরৎ দিলে বন্ধুত্বের অসম্মান হবে। দিলাম তাই। কিন্তু এটুকুতেই সন্তুষ্ট নয় মন। তখন সরকারি উকিল ডাকিয়ে দলিল করলাম। আমার অংশীদার করে নিলাম। নির্দেশ দিলাম এইরকম, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন আমার সাম্বৎসরিক আয় থেকে একশ মোহর করে পাবেন, আর তিনি মারা গেলে পঞ্চাশ মোহর করে পাবে তার ছেলে। এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হবে না।

কিন্তু তাতেও যে বিস্তর টাকা থেকে যায়! তাও কী কিছু কম! সেগুলো রাখি কোথায়! এ তো আর নির্জন নিরালা দ্বীপ নয় যে গুহার এক কোণে অবহেলায় ফেলে রাখব, কেউ দেখবে না, বা দেখলেও হাত দিতে সাহস পাবে না। এ হলো খোদ শহর। এখানে নানান বিপদ। টাকা কেড়ে নেবার জন্যে লোক ওত পেতে বসে আছে। অতএব সে টাকার নিরাপত্তা তো চাই।

তা আমার তো আর ঘরবাড়ি নেই যে নিরাপদে রেখে দেব কোথাও। ভেবে চিন্তে দেখলাম কাপ্তেনেই আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। সেখানেই রাখব কি সব? কিন্তু তার আগে আরো কিছু করণীয় আছে।

সেই বিধবা, তারও প্রতি আমার কর্তব্য কিছু কম নয়। অসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও আমার অর্থ ফেরৎ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। দিয়েছিলেনও একদা। কিন্তু থাকেন যে তিনি লন্ডনে। আর আমি এতদূরে লিসবনে। কীভাবে কবর কর্তব্য? তখন এক ব্যবসায়ীর

সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। লিসবন থেকে প্রায়ই লন্ডনে তার যাতায়াত আছে। তাকে বললাম আমার হয়ে যেন তিনি বিধবার সঙ্গে দেখা করেন, তাকে আমার এই অনুদান পৌঁছে দেন। এটা কৃতজ্ঞতার স্মারক। যেন অন্য কিছু মনে না করেন। আর যেন বলে আসেন, ভবিষ্যতেও এ জাতীয় অনুদান তিনি আমার কাছ থেকে পাবেন। নিয়মিত। যেমন করে হোক আমি পাঠিয়ে দেব।

লন্ডনের দুই বোনকেও হতাশ করলাম না। দিলাম শ পাউন্ড করে দু'জনকে। তাদের অবিশ্যি অবস্থা ভালো। সাহায্যের দরকার নেই। তবু এই যে আমি পেয়েছি এতগুলো টাকা, খরচ করতে হবে তো!

ব্যস, সব কর্তব্য শেষ। করণীয়ও। সঙ্গে বিস্তর টাকা। কী করব—রেখে যাব? ঠিক করলাম, না। সঙ্গেই থাক সব। বরং কিছু আরো কমিয়ে নিই।

তখন চিঠি লিখলাম গির্জা কর্তৃপক্ষের কাছে। সঙ্গে পাঠালাম আটশ বাহাত্তর মোহর। বললাম, এটা আপনার অতিরিক্ত প্রাপ্য। নিয়ে নিন এটা। এর পাঁচশ আপনাদের গির্জার ব্যয়ে লাগুক, বাকিটা দীন দরিদ্রের সেবায় ব্যয়িত হোক।

পাঠিয়ে দেবার পর খেয়াল হলো,—তাইতো কেন পাঠালাম আগে ভাগে! আমি না যাব বলে ঠিক করেছি ব্রাজিলে! মনের কুয়োয় তখন নামিয়ে দিলাম ডুবুরি। খোঁজখবর করে আমাকে জানাল—মিথ্যে কথা, তোমার মোটে ব্রাজিলে যাবার ইচ্ছে নেই। আসলে মনে মনে ধর্ম নিয়ে তুমি ভারি ঘাবড়ে গেছ। ভয় আছে তোমার। সেখানে তো সবাই প্রোটেস্টান্ট। তুমি এদিকে রোম্যান ক্যাথলিক বলে পরিচিত। যদি তাইতে শেষে বাধে কোনো গণ্ডগোল।

কথাটা ঠিকই। ধর্ম নিয়ে মনে কিছুটা ভয় আছে বটে। ইদানীং যা সব চলছে! যদি ঘটনাচক্রে তার শিকার হয়ে পড়ি! যদি এটা বলতে সেটা বলে কাউকে চটাই! বরং থাক, ব্রাজিল নয়, আমি ইংল্যান্ডের দিকে যাই। ধনসম্পদ সব সমেত। সেখানে গিয়েই নয় থিতু হবার চেষ্টা করি।

সেই মর্মে অছি পরিষদকে একখানা চিঠি লিখলাম। আর আমার অংশীদারকে। আমার অংশ তদারকীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাকে দেওয়া হলো। অছিদেরকে নির্দেশ দিলাম কোথায় কোথায় বাৎসরিক আয়ের অংশ পাঠিয়ে দিতে হবে সেই মর্মে। অংশীদারকে বললাম, হয়তো ব্রাজিলে কোনোদিনই আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। সুস্থির ভাবে আমি জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে চাই। আমাকে যেন ব্যবসার এটা ওটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে তিনি বিব্রত না করেন। ও ব্যাপারে যা ভালো তিনিই করবেন। আমি বছরে বছরে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ পেলেই নিশ্চিন্ত।

মোটমাট নির্ঝঞ্ঝাট এখন সব দিক থেকেই। আর কোনো দুশ্চিন্তা আমার মনে নেই। এবার রওনা হব। কিন্তু যাব কোন পথে? জাহাজে চড়তে কেন যেন আর মন চায় না। কী তার কারণ বুঝি না, কিন্তু ইচ্ছেটা যে বাস্তব, তার মধ্যে এতটুকু খাদ নাই—এটা টের পাই।

কি জানি হয়তো সৌভাগ্যের মুখ দেখেছি বলে দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। এটা হতে পারে। সমুদ্র যাত্রা তো আমার পক্ষে সুখকর নয়। সেটা এই নিয়ে তিন তিনবার ভালোভাবেই টের পেলাম। কেন আর তবে অনর্থক ঝঞ্ঝাট।

কাপ্তেনকে বললাম সব। তিনি আমার মতো সায় দিলেন। বললেন, এক কাজ কর। তুমি বরং হাঁটাপথে যাও। বিস্তর লোক যায় এই পথে। এখান থেকে সোজা যাবে গ্রোয়েনে, সেখান থেকে বিস্কে উপসাগর পেরিয়ে উঠবে রোশেলে। প্যারিসে যাবার এটাই

সবচেয়ে নিরাপদ পথ। তারপর তো কালে, সেখান থেকে ডোভার। ব্যস, পৌঁছে গেলে তুমি ইংল্যান্ড! বা যদি মনে কর, কালের পথ না ধরে, তুমি মাদ্রিদের মধ্য দিয়েও যেতে পার। যেটা মনঃপূত হয় আর কি! মাদ্রিদ পেরিয়ে গেলেও সরাসরি ফ্রান্সে পৌঁছে যাবে।

এর মধ্যে কালে থেকে ডোভার শুধু জাহাজে পাড়ি দিতে হয়, বাকি গোটা পথটাই হাঁটাপথ। আমার তো আর কোনো তাড়া নেই। সময় অঢেল। হুন্ডি করে নিয়েছি যাবতীয় টাকাপয়সা। সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সুতরাং এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা।

সঙ্গীও জুটে গেল। আমি আর ফ্রাইডে তো আছিই। কাপ্তেন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন লিসবনের এক প্রখ্যাত ব্যবসায়ীর পুত্রের সঙ্গে। তিনি ইংরেজ। যাবেন তিনি ঐ পথে। তো মন্দ কি। পরে দেখি আরো দু'জন সঙ্গী হাজির। এরাও ইংরেজ এবং বণিক। হাঁটা পতে গোটা পথ পাড়ি দেবে। পরে আরো দু'জন এসে দলে যোগ দিল। তারা পর্তুগিজ। প্যারিস অব্দি যাবে। ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সঙ্গে একজন আবার ভৃত্য। অর্থাৎ মোট আট জনের দল। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে!

তা রওনা হলাম। চিন্তা কীসের আমাদের! সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও তো কিছু কম নয়। মোটমাট সব দিক দিয়েই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর দল হিসেবে তো অনবদ্য। সবার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আমি। সবাই যেকোনো ব্যাপারে আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। আর দুটি ভৃত্য—সদা জাগ্রত তাদের আচরণ। সব সময় আমাকে খুশি রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা। এমন সঙ্গ কি আর কারো ভালো না লেগে পারে!

ভয় নেই আপনাদের। ভাববেন না আমি এখন সেই যাত্রার বিশদ বিবরণ দিতে বসব। সেটা আমার ইচ্ছেও নয়। দেখেছেন আপনারা, আমি আমার সমুদ্র যাত্রার গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনিয়ে আপনাদের বিব্রত করি নি। সেটা আমার স্বভাবের বাইরে। তবে হ্যাঁ, কয়েকটি কথা অবশ্যই বলব। যাত্রাকালীন অদ্ভুত কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা। আশা করি তাতে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না।

মাদ্রিদে নিরাপদেই এসে পৌঁছলাম। পথে কোনো বিঘ্ন হয় নি। সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইচ্ছে ছিল থাকব দুদিন সেখানে, স্পেনের রাজদরবার দেখব, ঘুরে ঘুরে দেখব এটা ওটা দর্শনীয় স্থান, কিন্তু বিধি বাম। গ্রীষ্মের সেটা শেষ পর্যায়। কদিনের মধ্যে শীত পড়বে। শীত মানে তো বরফ। রাস্তা ঘাট বনবাদাড় বরফে ছেয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে থাকতে আর দেরি না করে রওনা হওয়া মঙ্গল।

অক্টোবরের মধ্যভাগ সেটা। এসে পৌঁছলাম নাভারে। পথে কত মানুষ যে সাবধান করল!—খবরদার, এ পথে আর এগুবেন না। বরফ পড়ছে ভীষণ। ঘুরে পাম্পেলুনা দিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

গোটা এলাকটাই ফ্রান্সের পার্বত্যঞ্চল। পাম্পেলুনাও তাই। তবে পাহাড় সেদিকে তেমন উঁচু নয়। অর্থাৎ তুষারপাতের সম্ভাবনা কম।

তা পৌঁছে দেখি আবহাওয়া চমৎকার। গরম বেশ। গায়ে পোশাক রাখা দায়। আহ্লাদে আমরা তো আটখানা। ওমা, দেখতে না দেখতে পীরেনিজ পর্বতমালার দিক থেকে ছুটে এল এমন একফালি বাতাস! সে যা শীতল আর কনকনে আমি বলে বোঝাতে পারব না। গায়ে যেন হুল বেঁধায়। আঙুল টাঙুল তো রীতিমতো টনটন করতে শুরু করেছে।

আর বেচারি ফ্রাইডের যা করুণ অবস্থা! শীতের দেশে থাকে নি তো কোনোদিন। জানবে কী করে শীতের হালচাল! দেখি ঠকঠক করে কাঁপে অষ্টপ্রহর। তবে সে প্রথম দু চার দিন। পরে ধাতস্থ হয়ে গেল।

ভীষণ বরফ পড়া শুরু হলো অকস্মাৎ। আমার ভাগ্যটাই এরকম। সুস্থ সুষ্ঠু ভাবে কোনো কাজ কি হবার জো আছে! পথঘাট দেখতে না দেখতে বরফের নিচে। কোথাও কোথাও এক কোমর সমান। এর মধ্য দিয়ে কি হাঁটা যায়! বিশদিন সেখানেই রয়ে গেলাম। যদি পরিবর্তন হয় আবহাওয়ার, যদি মেঘ কেটে গিয়ে ঝরঝরে নীল আকাশের দেখা মেলে! হলো না তাও। তখন সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করলাম এখান থেকে ফিরে যাব ফন্টারাবিয়ায়, সেখান থেকে জাহাজে করে যাব বোরদোতে। সামান্যই পথ। মোটমাট ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু সমুদ্র যাত্রা নয়।

ঠিক সেই সময় জনৈক ফরাসি ভদ্রলোকের সাথে দেখা। ঘুরতে বেরিয়েছেন। গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে সিধে এসেছেন এদিকে। যাবেন মাদ্রিদ। বললেন, আমি তো ল্যাঙ্গুইডক হয়ে এলাম। ছোট্ট গ্রাম। অখ্যাত অচেনা। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এক গাইড। আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করুন। ঐ পথে গেলে আপনাদের কষ্ট অনেক লাঘব হবে। অযথা ঘুরতে হবে না।

অমনি গাইডের খোঁজে লোক পাঠালাম। দেখা পাওয়া গেল। বললাম আমাদের উদ্দেশ্য। বলল, কোনো অসুবিধে নেই, চলুন, আমি নিয়ে যাব। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে তো?

বললাম, আছে।

—আর শীতের পোশাক?

—তা-ও আছে।

—তবে তো নিশ্চিন্ত। সে আশ্বাস দিল, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। বরফ পড়ে তো ভীষণ। এই সময়ে নেকড়েগুলো বড় চঞ্চল হয়ে পড়ে। খাদ্যের যে অভাব। তারা হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড়ে। বিশেষ একরকম নেকড়ে আছে, তারা দুপায়ে চলে। আমরা বলি দুপেয়ে বাঘ। আর ভল্লুক আছে। তারাও কম হিংস্র নয়।

আরো কথা বার্তা হলো। আরো বারো জনের একটা দল পেলাম। সঙ্গে তাদের চাকর বাকর এটা ওটা হরেক জিনিস। দলে ফরাসি স্পেনীয় দুরকম লোকই আছে। তা মন্দ কি! দল ভারি হলে তবেই না ভালো। রওনা হলাম।

সেটা পনেরোই নভেম্বর। আমার মনে আছে। প্রথমে কিছুটা পিছু হটা। মাদ্রিদ থেকে যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়ে পিছোনো। তা বিশ মাইলের কিছু বেশি। দুটো নদী পেরুতে হলো। আর গ্রাম। সমতল অঞ্চল। উষ্ণ আবহাওয়া। পর্বতশীর্ষ থেকে অনেকটা যে নিচে। তারপর ফের ওঠা শুরু। অর্থাৎ যাকে বলে আরোহণ। একটা মোড় ঘুরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পাহাড়। তাতে শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। কত যে চূড়া! আর বরফে রয়েছে সব ধপধপে সাদা হয়ে। দেখলে ভয় লাগে। গাইড বলল, ঐ পাহাড়ের মাথায় না হলেও কাঁধের কাছ দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

একদিন সমানে বরফ পড়ল। দিবা-রাত্র মুহূর্তের জন্যেও কামাই নেই। সেদিন আর এগোনো সম্ভব হলো না। উঠে এসেছি এখন অনেক উঁচুতে। সাবাশ গাইড! আনল এমন পথ দিয়ে তাতে কষ্ট হয় নি এতটুকু। বুঝতে অব্দি পারি নি আমরা এত উপরে এসেছি। এবার নামা। যাকে বলে অবরোহণ। তখনি বরফের মুখে পড়লাম।

তা সে বিপদও কাটল। পরদিন বিকালে। যথারীতি আমরা চলেছি ঘোড়ার পিঠে। নামছি। রাত হতে তখনো ঘণ্টা দুই বাকি। একটু ছাড়া ছাড়া ভাব নিজেদের মধ্যে। গাইড

চলছে সবার আগে। পিছনে আমরা ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত। হঠাৎ দেখি বন থেকে বেরিয়ে এল তিনটে নেকড়ে। ভীষণ তাদের আকৃতি। পিছনে পিছনে এক ভল্লুক। সে-ও ঘোর দর্শন। দুটো নেকড়ে চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পরল গাইডের উপর, তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। তৃতীয়টা লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার উপর। সে কী আর্ত চিৎকার গাইডের! ঘটনার আকস্মিকতার আমরা হতবাক। বিহ্বল যাকে বলে। নইলে কোমর থেকে বের করব পিস্তল, তাক করে ঘোড়া টিপব—পারি না তা-ও!

তখন দেখলাম ফ্রাইডের খেল। সাবাশ ফ্রাইডে! পিস্তল নিয়ে ছুটে গেল নেকড়ের প্রায় মুখের গোড়ায়। টিপল ঘোড়া। আগুন বেরিয়ে গেল এক ঝলক। পরমুহূর্তে দেখি একটা নেকড়ে মরে পড়ে আছে আর বাকি দুটো উধাও। ভল্লুকটারও সেই মুহূর্তে আর দেখা নেই।

সে কী উল্লাস ফ্রাইডের। লাফাতে লাফাতে গিয়ে গাইডকে তুলল। জানি না আরেকটু দেরি হলে কি হতো বেচারির। জখম হয়েছে, তবে তেমন খুব একটা নয়। হাতে আর ডান পায়ে দুটো কামড়ের দাগ। ধরেছিল সবে কামড়ে দু দিক থেকে দুই শয়তান। ঠিক সময় মতো ফ্রাইডে গুলি চালিয়েছে। এটা আমার পরম গৌরব। আমরাই অনুচর করল কিনা গাইডের প্রাণরক্ষা, প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিল। সবাই তারিফ করতে লাগল ফ্রাইডেকে।

তবে ঘোড়াটার আর ধরে প্রাণ নেই। সব শেষ। মাথাটা পুরো খাবলে নিয়ে গেছে নেকড়ে। পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মুণ্ডহীন একটা শব। গাইডকে তুলে নেওয়া হলো আরেকটা ঘোড়ায়। ঘাবরে গেছে বেচারি ভীষণ। একা যাওয়ার আর সাহস নেই।

এদিকে তো আরেক কাণ্ড। গুলির আওয়াজ শোনামাত্র দুধারের বনভূমি যেন সরব হয়ে উঠেছে। সে যে কত গর্জন, কত ডাক, কত চিৎকার, কত অন্যরকম হাজারো শব্দ—তার আর ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ল আফ্রিকার সেই উপকূল ভাগের কথা। গুলি করে মেরেছিলাম চিতাকে, সঙ্গে সঙ্গে সে কী তর্জন গর্জন বনের ভিতরে। সঙ্গে সিংহের গুরুগম্ভীর নিনাদ। তবু রক্ষে এই বনে সিংহ নেই। থাকলে কী অবস্থা হতো বলা যায় না। নেকড়ে পর্ব সাঙ্গ হতে ফ্রাইডে এবার পড়ল ভল্লুকটাকে নিয়ে।

সে বড় চমকপ্রদ ঘটনা। চমক এই জন্যে বলি, কেননা ভল্লুক নিয়ে যে অত মজা করা যায় আমরা জানতাম না। কতকগুলো অদ্ভুত গুণ আছে ভল্লুকের আমরা জানি। এমনিতে শান্ত সদাশয় রীতিমতো ভদ্র জীব। দেখতে বেশ নাদুসনুদুস, হাঁটেও চেহারার সাথে সঙ্গতি রেখে দুলকি চালে। নেকড়ের মতো লাফাতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। অমন হালকা অমন নিপুণ নয় যে দেহ। তবে দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী। প্রথমত যাকে তাকে আক্রমণ করে না। নিতান্ত ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও না। এটা তার ধর্ম। যদি তুমি কর আক্রমণ তখন সে প্রতি আক্রমণ করতে বাধ্য থাকবে। যদি তুমি জ্বালাতন কর তবে সে পাল্টা তোমাকে জ্বালাতন করবে। করো না কিছু সে যাবে হেঁটে তোমার পাশ দিয়ে, তোমাকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবে না। সেদিক থেকে অত্যন্ত ভদ্র। আর একটু এক বগ্‌গা ধরনের। যে বরাবর চলেছে, সহসা দিক পরিবর্তন তার ধর্ম নয়। সেখানে তুমি যদি মুখোমুখি পড়ে যাও, তবে নেমে দাঁড়াও তুমি। বা পথ ছাড়ো। সে তো মহারাজেরও এক কাঠি ওপরে। সরবে কেন?

আমরা চলেছি ঘোড়ার পিঠে

আর হ্যাঁ, বিপরীতে চলতে চলতে যদি তুমি থমকে যাও, তাকাও তার দিকে, সে-ও থমকে যাবে, তোমার দিকে তাকাবে। এটা ধর্ম এবং সেক্ষেত্রে সে ধরে নেবে বিপদের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ পিছনে লাগার মতলব আছে তোমার। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে কখন তুমি পিছনে লাগো। অর্থাৎ উত্যক্ত কর। যতক্ষণ না কর সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মারো তুমি ঢেলা, সে কিছু বলবে না। কিন্তু ঢেলা যেই গায়ে এসে পড়বে, সে তোমার উপর হুঙ্কার দিয়ে লাফ ছাড়বে। সেক্ষেত্রে তোমাকে যতক্ষণ না শায়েস্তা করা হচ্ছে তার স্বস্তি বা শান্তি নেই। ভীষণ প্রতিহিংসাবোধ ভালুকের।

তা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম গাইডকে নিয়ে, অন্য দিকে নজর দেবার আর ফুরসৎ হয় নি। হঠাৎ শুনি ফ্রাইডের গগন বিদারী চিৎকার।—পেয়ে গেছি এবার, পেয়ে গেছি! ভারি উল্লাস তার কণ্ঠে। আমাকে বলল, হুজুর, মালিক, এবার খেলা দেখাব আপনাদের। হাসাব। দেখুন চেয়ে ভালো করে। ছাড়ছি না একে।

তাকিয়ে দেখি সেই ভালুক। ঘোর দর্শন। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। কোন অবকাশে আবার বেরিয়ে এসেছে জঙ্গলের মধ্য থেকে। গজেন্দ্রগমনে চলেছে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

বললাম, বোকামি করিস নে ফ্রাইডে। জানোয়ার কি বুঝবে তোর মজা? তোকে কামড়ে দেবে, চাই কি গিলে ফেলবে। ফ্রাইডে বলল, মালিক, আপনি দেখুন না, কী মজা হয়। আপনারা হেসে কুটিপাটি হবেন। আমাকে গিলে খাবে কি, উল্টো আমিই ওকে গিলে খাব।

এই বলে চামড়ার জুতো ছেড়ে রবারের জুতো পরল। তাতে বরফের উপর দিয়ে ছুটতে সুবিধে। আর ছোটায় তো ওর তুলনা নেই। কী আর করি আমরা। রুদ্ধ নিশ্বাসে হতবিহ্বল চিত্তে তাকিয়ে রইলাম এই ডাকাত ছেলেটার পানে।

ভালুক চলেছে হেঁটে। কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। কাউকে সে উত্যক্ত করতে চায় না। নিজেকেও কেউ উত্যক্ত করে সেটাও তার কাম্য নয়। ফ্রাইডে ছুটতে ছুটতে তার পিছু ধরল। বলল, অ্যাই, অ্যাই ভালুক। আমি কথা বলছি তোর সাথে। তুই বলবি না কথা?

বলবে কী করে? ভালুক কি বোঝে মানুষের ভাষা! হেঁটে চলল সে একই ভাবে। ফ্রাইডে ঠিক তার পিছন পিছন। আমারো কৌতূহলী জনতা চললাম তাদের পিছু পিছু।

সে এক ঘন জঙ্গল। ফ্রাইডে ঢিল ছুড়ল। ঠক করে পড়ল গিয়ে তার মাথায়। তেমন আঘাত না। কিন্তু ঐ—উত্যক্ত করেছ কি রক্ষা নেই। আর যায় কোথায়! অমনি চকিতে ঘুরে ফ্রাইডেকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে ফ্রাইডে দৌড়! সে এক রীতিমতো প্রতিযোগিতা যেন। ভালুকের পায়েও সমান তেজ। আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সমানে। আমরা তো ভয়ে থ। কী হবে এখন কে পারে বলতে! ধমক দিলাম ফ্রাইডেকে।—ফ্রাইডে, এখনো গুলি কর। নয়ত মুশকিলে পড়বি। তুই না পারিস আমরা করছি গুলি।

ফ্রাইডে ততক্ষণে ছুটে তড়বড়িয়ে উঠে পড়েছে একটা গাছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, মালিক, গুলি করার দরকার নেই। আপনি দেখুন না কত মজা হয়। হাসতে হাসতে আপনাদের পেটে খিল ধরে যাবে।

বলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় আরো খানিকটা উঁচুতে উঠে বসে গেল একেবারে মগ ডালে। তারপর তার এক প্রান্তে বসে মনের আনন্দে পা দোলাতে লাগল।

হঠাৎ দেখি ভালুক মহারাজও গাছ বেয়ে উঠছেন। অদ্ভুত তারও ক্ষিপ্রতা। ঠিক মানুষ যেভাবে উঠে হুবহু সেইরকম। আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। ভাবখানা এমন—দাঁড়াও না বাছাধন, দেখাচ্ছি তোমার মজা। ভেবছ কী।

তা নিমেষের মধ্যে দেখি ফ্রাইডে যেখানে প্রায় তার কাছাকাছি হাজির। মাঝখানে শুধু একখানা ডালের ব্যবধান। এগোবে বলে পা বাড়িয়েছে সবে, অমনি শুরু হলো ফ্রাইডের বজ্জাতি। আমাদের বলল, দেখুন আপনারা, ভালুক মশায় কত সুন্দর নাচতে পারেন। বলে সেই ডাল ধরে সেই কী নড়াবার ঘটা! বেচারা ভালুক তো এই পড়ে কি সেই পড়ে। ঘন ঘন পিছন দিকে তাকায়। আর আঁকড়ে ধরে জোরসে ডাল। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে নাচের ভঙ্গিতে শরীর। আমরা তো হেসে কূল পাই না।

তখনো শেষ হয় নি আর কি বজ্জাতি। হঠাৎ থামল ফ্রাইডে। অমনি নাচও বন্ধ। দেখি তাকিয়ে আছে দু'জন চোখে চোখে। ফ্রাইডে বলল, কীরে, আসবি না আরেকটু কাছে? আয়! যেন ভালুক নয়, মানুষ ও। ফ্রাইডের সব কথা বোঝে। দেখি অবাক কাণ্ড, ডাক শোনার পর সেও গুটি গুটি এগোবার চেষ্টা করছে, তখন ফের দুলুনি। ফের নাচ। ফের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ভাব।

ফ্রাইডে বলল, কী রে, আর আসবি না? তবে দেখ এখন আমি কী করি! বলে ডালে পা রেখে নিচের দিকে নামতে নামতে ঝুলে পড়ে হঠাৎ এক লাফ। সোজা মাটির উপর। আমরা তো ধরে নিয়েছি ভালুকও পড়বে লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে। ওমা, দেখি লাফের ধার কাছ দিয়েও যায় না। গুটি গুটি ডাল আঁকড়ে ধরে পিছু হটতে নামল গুঁড়ি বেয়ে মাটিতে। ঠিক যেমন নামে বিড়াল। আগে পিছনের পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। দাঁড়াল শক্ত হয়ে। তারপর নামিয়ে দিল সামনের পা দুখানা।

আর ফ্রাইডে তো আগেই সেখানে হাজির। নামার সাথে সাথে কানের ফুটোয় পিস্তল ঢুকিয়ে দুম। বিশাল দেহ পপাত ধরণীতলে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের। সে যেন চরম উৎকণ্ঠা। কী হয় কী না হয় তাই নিয়ে অবিরাম সমস্যা। হেসেছি ঠিকই, কিন্তু সভয়ে। যদি একটা কিছু ঘটে যায়!

ফ্রাইডেকে বললাম, তা হ্যাঁরে ফ্রাইডে, এই যে করলি সব এতক্ষণ ধরে, যদি হঠাৎ বেফাঁস একটা কিছু হয়ে যেত! যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত তোর ঘাড়ে!

বলল, পড়বে কী করে! আমি যে জানি সব। আমাদের ওখানে এইভাবেই তো ভালুক মারে।

বললাম, মিথ্যে কথা। তোরা পিস্তল কোথায় পাবি যে এইভাবে মারবি ভালুক?

বলল, পিস্তল ছাড়া বুঝি কিছু মারা যায় না। আমাদের যে তীর আছে। তার কি তেজ কম?

খেয়াল করি নি এতক্ষণ, দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ হবার সাথে সাথে গর্জন যেন আরো দশগুণ বৃদ্ধি পেল। গলা খাকারির মতো ডাকে নেকড়ের দল। স্পষ্ট সে ডাক আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। আরো নানান ডাক। বাড়ছে ক্রমশ শব্দ। এদিকে বেলা প্রায় শেষ। গাইড বলল, চলুন আর দেরি করা ঠিক না। অনেকটা পথ যেতে হবে এখনো। তবে বিপদ কাটবে। সামনে আরো একটা ভয়ের এলাকা আছে।

ফ্রাইডে বলেছিল নিয়ে যাবে সাথে ভালুকের বিশাল চামড়াটা। আমরা রাজি হই নি। সময় লাগবে প্রচুর। ততক্ষণে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বরফের এলাকা তখনো পার হতে পারি নি। দুধারে গহীন বন। দূরে দেখা যায় সমতল ভূমি। সেখানে চাষের জমি, পুকুর, ছোট ছোট বাড়ি।

পরে শুনেছিলাম, বরফের সময়ে এই সব গ্রামে মানুষ বড় অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়। নেমে আসে বন থেকে যাবতীয় হিংস্র জন্তু জানোয়ার। ক্ষুধার তাড়নায় গরু মোষ ছাগল ভেড়া যা সামনে পায় নিয়ে যায় মুখে করে। কত মানুষও মারা যায়।

গাইড বলল, সামনে যে বন তাতে এত নেকড়ে, দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। পৃথিবীর যাবতীয় নেকড়ে হয়তো এই বনেই আছে। চলুন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি।

সূর্য তখন অস্তাচলে। ঘোর ঘোর ভাব। জঙ্গলের প্রথম অংশে তখন আমরা। রুদ্ধ নিশ্বাসে চলেছি এগিয়ে। হঠাৎ সামনে দেখি পাঁচটা নেকড়ে। দল বেঁধে চলেছে একদিক থেকে আরেকদিকে। আমাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না। হয়তো সন্ধান পেয়েছে মড়ির। কোনো জানোয়ার হয়তো মরে পড়ে আছে জঙ্গলের কোনো প্রান্তে। তারই সন্ধানে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা অবস্থায়।

গাইড বলল, সাবধান। যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। বিপদ যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো দিক থেকে আসতে পারে।

সেটা অবিশ্যি বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্ধকার নামার সাথে সাথে যে যার হাতে খুলে রেখেছি অস্ত্র। আর সতর্ক সজাগ চোখ। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় চেষ্টা করছি তার চেয়ে আরো বেশি দেখতে।

প্রায় এক ক্রোশ পথ নিরাপদেই পার হলাম।

একটু ফাঁকা মতো জায়গা এরপর। দুধারে বন। দেখি মস্ত ভিড় সেখানে। পড়ে আছে পথের মাঝে মরা একটা ঘোড়া। তাকে ঘিরে প্রায় ডজন খানেক নেকড়ে। মহানন্দে চলছে তাদের ভোজ।

পাশ কাটিয়ে একটু ঘুর পথ ধরে জায়গাটা পার হয়ে গেলাম। দরকার কী বাপু ওদের বিরক্ত করার। ফ্রাইডে দু তিনবার আমার কানের কাছে ফিসফিস করল,—দেব চালিয়ে

গুলি? মালিক, আপনি শুধু একবার হুকুম করুন। হাত আমার নিশপিশ করছে। বললাম, না। খবরদার এদের চটিয়ে দিলে এখন বিপদের আশঙ্কা। সামনে জঙ্গল আরো ভয়ঙ্কর। তবে আর জান নিয়ে বের হতে পারব না।

সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই সামনের জঙ্গল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির তো আর বিরাম নেই। এসে পড়েছি এবার জঙ্গলের প্রায় মাঝ বরাবর। হঠাৎ ডাইনে চোখ পড়তে দেখি সে প্রায় শখানেক নেকড়ে। দল বেঁধে সশস্ত্র সৈনিকের মতো আমাদের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। কী করি এখন! হঠাৎ মতলব খেলে গেল মাথায়। সবাইকে বললাম, তোমরাও সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়। দাঁড়াল তাই। কিন্তু তাতে কি আর ভবি ভোলে! দেখি একই কদমে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। তখন বললাম, অস্ত্র তুলে ধর। ধরল সবাই তাক করে পিস্তল। বললাম, একজন অন্তর একজন আমি এক, দুই, তিন বলার সাথে সাথে গুলি চালাবে। তারপর খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বাকিরা। এই অবকাশে যেন আগের তরফের পিস্তলে নতুন গুলি ভরা হয়ে যায়।

তাই হলো। ছুটে গেল তিন বলার সাথে সাথে এক ঝাঁক গুলি। তাতে মারা পড়ল কটা। আর বিস্তর জখম। থমকে দাঁড়িয়েছে তখন পুরো দল। ফের বললাম তিন,—অমনি আরো একঝাঁক গুলি। মারা পড়ল আরো কটা। আর জখমের সংখ্যা এবার আগের চেয়ে বেশি। তখন দেখি একজন দু'জন করে পিছু হটতে শুরু করেছে। শেষে পুরো দলটাই মুখ ফিরিয়ে দে দৌড়। অমনি আমরাও সমবেত চিৎকার করে দিলাম তাড়া। এটা শুনেছিলাম ছোট বেলা। জন্তুদের উদ্দেশ্য করে ধ্বনি দিলে নাকি তারা ভয় পেয়ে যায়। পালাতে শুরু করে। পরখ করার সুযোগ হলো এতদিন পরে। ভুল নয় কথাটা। বলতে গেলে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক।

এই অবকাশে ফের গুলি ভরে নেওয়া হলো পিস্তলে। সময় তো নষ্ট করা যায় না। বিপদ যে কোন দিকে আসে কে বলতে পারে। আগাগোড়া বনটাই যে নেকড়ের বন। বলেছে গাইড। কথাটা যে নির্ভুল তার প্রমাণ তো দেখতে পাচ্ছি।

রাত আরো বেড়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চতুর্দিকে। আলো বলতে আমাদের হাতের মশাল আর ধপধপে সাদা বরফ। বরফের উপর দিয়ে একটা খরগোশ নড়লেও টের পাই। চলেছি চারদিকে নজর রাখতে রাখতে। হঠাৎ দেখি সামনে পিছনে ডাইনে তিন পাল নেকড়ে। তবু বাঁচোয়া ঘাড়ে এসে পড়ে নি কেউ। আমরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

কিন্তু বরফের উপর দিয়ে আমরা চাইলেই তো আর দ্রুত ছোটা সম্ভব নয়। পা ঢুকে যায় বরফে। সেইভাবেই ভয়ে ভয়ে চলেছি। সামনে আরেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর বন। তাতে ঢুকব এবার। দেখি পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একপাল নেকড়ে।

ঠিক তখনি কানে এল বন্দুকের আওয়াজ। মাত্র একবার তারপর সব চুপ। শুধু হাঁউমাঁউ করে ডাকছে নেকড়ের দল। আর ভারি যেন উল্লসিত। একটু পরে দেখি ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া। মরণ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছে। তার পিছনে ষোলো সতেরোটা নেকড়ে। পারে কি তাদের সাথে পাল্লা দিতে। একটু পরে দেখি ঘোড়া ছিটকে পড়েছে মাটিতে, আর তাকে ছেঁকে ধরেছে নেকড়ের পাল।

কিন্তু কে ছুড়ল বন্দুক? নির্ঘাৎ আমাদেরই মতো কোনো পথচারী। কিন্তু কোথায় সে? কী তার অবস্থা?

বেশি দূর এগোবার দরকার হলো না। হাতের মশালে দেখি মাটিতে পড়ে আছে দুটি মানুষ। একজনের হাতের নাগালের মধ্যে বন্দুক। এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে বন্দুকের নল দিয়ে। তবে তারা আর জীবিত নেই। একজনের মাথাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আরেক জনের

নিম্নাঙ্গ পুরোপুরি উধাও। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। নেকড়ের পাল চারপাশে ঘিরে ধরেছে দু'জনকে।

তাড়াতাড়ি সরে এলাম সেখান থেকে। ভয় করছে। বা ভয় নয়। প্রচণ্ড আতঙ্ক। বুক কাঁপছে। যদি আমাদেরও ঐ দশা হয়। সামনে এখনো সেই নেকড়ের পাল। তিনশ হবে মাথা গুনতি। দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে। করি কী এখন!

উপায় একটা হলো। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া একে কীই বা বলা যায়। দেখি অদূরে গাছ কেটে রেখেছে অসংখ্য। গুঁড়িগুলো পড়ে আছে পথে। নিয়ে যাবার হয়তো সুযোগ পায় নি। এই তো আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ!

দলবল মিলে ঠাঁই নিলাম সেই গুঁড়ির আবেষ্টনীর মধ্যে। মশাল জ্বাললাম আরো কটা। ত্রিভুজাকারে বসেছি সকলে। ঘোড়াগুলো আমাদের মাঝখানে। অর্থাৎ, মারতে হলে মারো আগে আমাদের, তারপর ঘোড়াগুলোকে নাও। কিন্তু আমাদের মারাটাও আর সহজ নয়। চারদিকে চোখ আমাদের। হাতে দুটো করে পিস্তল আর প্রচুর গোলা বারুদ। তদুপরি সামনে গুঁড়ির বেষ্টনী। পারবে কি বাপু আমাদের সঙ্গে টক্কর দিতে?

এল তবুও রাগে গজরাতে গজরাতে। আমরা আগের নিয়মে গুলি ছুড়লাম। অর্থাৎ সকলে একসাথে নয়, একজন অন্তর একজন। তাতে মারা পড়লো কটা। আহত হলো তার প্রায় দ্বিগুণ। তবু দেখি ভয়ে পালাবার নাম নেই। আহতদের ঘাড়ের উপর দিয়ে আসছে আরো একদল। তখন ফের গুলি ছোড়া হলো।

গুনে দেখলাম এবার মরেছে মোট আঠারো কি বিশটা। জখম প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু এ যে রক্তবীজের বংশ। নির্ভয় নির্বিকার। রাগে ফুঁসছে বাকিরা। মৃতদেহ ডিঙিয়ে এগিয়ে আসছে। নজর আসলে ঘোড়াগুলোর উপর। আমরা আড়াল করে আছি তাই আমাদের উপর আক্রোশ।

কিন্তু না, আর গুলি করে এদের রুখবার চেষ্টা করা বাতুলতা। অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। একজন ভৃত্যকে বারুদের ঠোঙাটা দিয়ে বললাম, চটপট ছড়িয়ে দে তো বারুদ চারধারের গুঁড়িগুলোর উপর। দিলো তাই। নেকড়ে দলের বাকিরা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়, হয়তো ঠিক করছে তাদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি কী। সে যৎসামান্য অবকাশ। তারই মধ্যে আমাদের কাজ খতম। এগিয়ে এল ফের। অমনি মশাল দিয়ে বারুদের এক ধারে লাগিয়ে দিলাম আগুন। দাউ দাউ করে ব্যাপ্ত হয়ে গেল চোখের নিমেষে চারধারে। এসেছিল যে কটা তাদের বেশির ভাগ গরমের তাপ পেয়ে ঝলসে গেল বা ঠিকরে ছুটে পালাল। ভেদ করে ঢুকল তবু কটা দুঃসাহসী। আমরা গুলিতে চোখের পলকে তাদের নিকেশ করলাম। বাকিরা দেখে ভয়ে ভয়ে পিছোতে শুরু করেছে।

তখন ফের একঝাঁক গুলি আর সেই সাথে মুখে হাত নেড়ে রে রে আওয়াজ। অমনি লেজ গুটিয়ে সবাই দে দৌড়। বিশটার মতোন দেখি মাটিতে পা ঘসটাতে ঘসটাতে পালাবার চেষ্টা করছে। জখম হয়েছে পা। তাই ছুটতে অক্ষম। তখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম তলোয়ার হাতে। কচাকচ একেকটা খতম। আর সে যেন হুটোপাটি লেগে গেছে তখন বনের মধ্যে। দুদ্দাড় শুধু ছোটার শব্দ পাই। আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক। অর্থাৎ পালাচ্ছে দলবল। এত মৃত্যু এত জখম, সর্বোপরি আগুনের ঐ ঘেরাটোপ—ভয় না পেয়ে কি যায়! একদলকে পালাতে দেখে প্রত্যাশায় আশে পাশে যারা লুকিয়ে ছিল, তারাও লেজ গুটিয়ে দে ছুট।

মোটমাট কিছুটা নির্ভয় এখন। পালাতে যখন শুরু করেছে সহসা এদিকে যে আর আসবে না সেটা সহজে বোঝা যায়। তা হিসেব করে দেখি, মেরেছি প্রায় তিন কুড়ি

ষাটটার মতো নেকড়ে। আর জখম যে কত তার তো ইয়ত্তা নেই। দিনের আলো থাকলে মারতাম আরো ঢের। রাত বলে তবে না মাত্র এই কটা! এখনো যেতে হবে প্রায় এক ক্রোশ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। তবে আসবে গ্রাম। হাঁকডাক চলছে চারধারে মালুম পাই, তবে ধারে কাছে কেউ আর ঘেঁষে না। অর্থাৎ খবর পৌঁছে গেছে নিজেদের মধ্যে। আমরা যে ভয়ঙ্কর, কিছুতে বাগে আনা যাবে না আমাদের এটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে ঘোড়া ছোটালাম। তবে দেখি জঙ্গল শেষ। বরফও শেষ। সামনে ছোট ছোট কুটির। ঝাঁক বেঁধে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের জোয়ানের দল। হাতে সকলের অস্ত্র। আর চোখে ভয়ের ছাপ। জঙ্গলের হাঁকডাক তো তাদেরও কানে গেছে। ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কে বেরিয়ে এসেছে তাই দল বেঁধে। গ্রামে যে মাঝে মাঝেই হানা দেয় নেকড়ের পাল। নিয়ে যায়, ছাগল, গরু, মোষ, ঘোড়া, এমনকি কখনো কখনো মানুষও। তাই তো পাহারা দেবার এই প্রথা।

কাটল রাত। দেখি গাইড আমাদের রীতিমতো অসুস্থ। পা আর হাত ফুলে উঠেছে ঢোল হয়ে। এগোবার সামর্থ্য আর নেই। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। তখন রেখে গেলাম তাকে গ্রামে। নিলাম আরেকজন গাইড। সকালে রওনা হয়ে বেলা থাকতে পৌঁছে গেলাম তুলুতে। সে বড় চমৎকার জায়গা। আবহাওয়া বেশ উষ্ণ। শীতের বালাই নেই। নেই এতটুকু তুষার কি একটাও নেকড়ে। নগরবাসী দু'চার জনের সঙ্গে আলাপ হলো। বললাম আমাদের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত। বলল, অবাক কাণ্ড, কেমন গাইড ধরেছিলেন আপনারা! ভারি তো দুঃসাহস তার! আর দুঃসাহস বটে আপনাদেরও। স্রেফ বুদ্ধি আর সাহসের জোরে বেঁচে ফিরে এসেছেন। নইলে এই সময় ঐ পথে কোনো মানুষ ফিরতে পারে না। নেকড়ের পেটে যায়। আসলে নজর ওদের ঘোড়ার দিকে। ঐ যে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে পথিক, দেখলেই ওদের জিভ লোভে চকচক করে। ক্ষিধেয় যে মরিয়া তখন। ঘিরে ধরে সাথে সাথে। সওয়ারীও একই সাথে সেই লোভের শিকার হয়।

চুপিচুপি বলি আপনাদের, ভয় যে আমিও পাই নি, এটা মোটেও হক কথা নয়। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তিনশ নেকড়ের অমন বিরাট দল, অমন লোলুপ হিংস্র চেহারা আর অত গর্জন—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে শুধু নেকড়ে আর নেকড়ে—আমি জীবনে কখনো দেখি নি বা দেখব যে কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। আরেকটু হলে আমারো বুদ্ধি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। নেহাৎ মনের জোর প্রবল তাই পেরেছি ঐভাবে নিজেকে এবং সেই সাথে গোটা দলটাকে রক্ষা করতে। সেটা সেই লোকটিও বলল।—যদি না ঐভাবে বুদ্ধি করে ভাগে ভাগে গুলি চালাতেন, তবে আর এতক্ষণ এখানে বসে গল্প করতে হতো না। হাড় কখানা পড়ে থাকত জঙ্গলের মাঝে।

ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ হই বাপু নেকড়ের দল। এমন জঙ্গল আমার মাথায় থাক। আমি বরং হাজার বার যাব সমুদ্রে, ঝড়ের মুখে পড়ব, চাই কি জীবন দেব সমুদ্রের গভীরে। তবু জঙ্গলমুখো আর কখনো হব না।

জাহাজে করে গেলাম ফ্রান্সে। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে নি। সেখান থেকে এলাম কালেতে। তারপর ডোভার। সেটা জানুয়ারি মাসের চৌদ্দ তারিখ। আমাদের দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি হলো।

এবং সর্বাঙ্গীণ কুশল। শরীরের দিক থেকে তো বটেই এমনকি অর্থ ইত্যাদির দিক থেকেও। হুন্ডি করে এনেছি। সেটা ভাঙাতে এতটুকু অসুবিধে হলো না। বিস্তর টাকার মালিক আমি এখন। গেলাম কাপ্তেনের সেই বিধবার সাথে দেখা করতে।

ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া

কী যে খুশি মহিলা! টাকা পাঠিয়েছি, পেয়েছেন, তার জন্যে কত দিলেন ধন্যবাদ। কত শুভেচ্ছা। কী যে করবেন আমার জন্য, কী আনবেন, কী খাওয়াবেন, তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। দরদে বুক ভরে গেল আমার। আর শ্রদ্ধা। আর ভালোবাসা। যেন মা আমার। মাতৃত্বের ছোঁয়াচ পাই তার প্রতিটি কাজে।

পারি তো এর জিম্মায় সব কিছু রেখে লিসবনে চলে যেতে। অসুবিধে কী আমার! সেখান থেকে যাব ব্রাজিল। ব্যবসার কাজে দেখাশুনা করব। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই যে ধর্ম চিন্তা! তাই নিয়ে ভয়! যা গোলমাল লেগেছে চারধারে,—যদি তার রোষে পড়ি। যদি কিছু একটা ঘটনা ঘটে!

মোটমাট এইভাবে শহীদ হতে আমি চাই না। কিছু একটা করব, তার জন্যে মরব—সে আলাদা কথা। কিন্তু করব না কিছু, আমাকে হত্যা করবে, এ আমার অভিপ্রেত নয়। চাই না কোনোরকম ঝঞ্ঝাটে জড়াতে। এখন থিতু হতে মন চাইছে। বাসা বাঁধব এখানে। এখানেই থাকব। সংসারী হব। ব্যবসা বরং বিক্রি করে দিতে বলি।

অংশীদারকে চিঠি লিখে নতুন নির্দেশ দিলাম। দিক বেচে সব কিছু। তবে দুটি মাত্র শর্ত। আমার শুভানুধ্যায়ী লিসবনের সেই কাপ্তেনকে দিতে হবে বছরে একশ মোহর করে অনুদান, তারপর সে মারা গেলে তার ছেলেকে পঞ্চাশ মোহর করে আজীবন। এর জন্যে দাম যদি কিছু কম হয়, তাও রাজি। বেশি টাকায় আমার লোভ নেই।

ক মাস পরে পেলাম চিঠির জবাব। লিখেছে শর্তে রাজি। দু'জন বণিকের সঙ্গে সে কথা বলছে। তারা কিনে নেবে আমার অংশ। এক একজন দাম দেবে ব্রাজিলের মুদ্রায় চল্লিশ হাজার তংকা। আমি লিখে দিলাম, রাজি। তাড়াতাড়ি কর।

আট মাস লাগল মোট সময়। টাকা পাঠাল হুন্ডি করে। সব জমা রাখলাম কাপ্তেনের বিধবার কাছে। নিশ্চিন্ত এখন। প্রথম জীবনের যা কিছু অভিযান, তার এতদিনে সমাপ্তি। চাষের জমি করাটাও যে পড়ে সেই অভিযানের মধ্যে। তাই তো দিলাম সে পাট চুকিয়ে।

কিন্তু চাইলেই কি পারি আমি স্থির হয়ে একজায়গায় থাকতে। এটা যে আমার অভ্যেসের বাইরে। ইচ্ছ হয় ফের ভেসে পড়ি সমুদ্রে। যাই সেই দ্বীপে। বড় দেখতে ইচ্ছে হয় কেমন করে আছে সেই কজন। স্পেনীয় নাবিকদেরও তো এতদিনে দ্বীপে আসার কথা। এল কি তারা? সহজভাবে মেনে নিতে পেরেছে তো ওরা তাদের? জানতে বড় ইচ্ছে করে।

মহিলার কাছে ব্যক্ত করলাম আমার মনের কথা। তিনি মানা করলেন। সাতটা বছর কিছুতে দিলেন না আমাদের চোখের আড়াল হতে। যাতে মন বসে এখানে আমার, আমার দুই ভাইপোকে এনে দিলেন আমার কাছে। বালক তারা। বললেন, এদের ভার এবার থেকে তোমার। এদের মানুষ কর।

তা কাটল বেশ কটা বছর ভালোই। কিছু জমি কিনলাম। এক ভাইপো ততদিনে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত এখন। দলিল করে তার নামে দিলাম জমির কিছুটা অংশ। যতদিন বেঁচে থাকব আমি সে আমার হয়ে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করবে। মৃত্যুর পর হবে পুরোপুরি মালিক। দলিলে সেই মর্মেই নির্দেশ থাকল। ছোটটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে লাগিয়ে দিলাম এক জাহাজের কাজে। ঘুরল এধার ওধার বিস্তর। পাঁচবছর পর দেখি পুরোদস্তুর কাপ্তেন বনে গেছে। আর ভীষণ সাহসী। তখন সে জাহাজ থেকে সরিয়ে তাকে জুড়ে দিলাম আরেক জাহাজে। এটা দূর পাল্লার জাহাজ। সমুদ্রে যায়। তাতে তার খুব আনন্দ। ক বছর পর আমাকেও জাহাজে তার সাথী করে নিল।

বলতে ভুলে গেছি, ইতোমধ্যে আমিও সংসারী হয়েছি। বিয়ে হয়েছে আমার। তিনটি সন্তানের আমি জনক। দুটি ছেলে এক মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী অসুখে মারা গেল। মন তখন খারাপ। ঠিক সেই সময় ভাইপো ফিরে এসেছে জাহাজ নিয়ে। কদিনের মধ্যে রওনা হবে স্পেনের দিকে। আমাকে বলল, যাবে নাকি তুমি? বললাম, চল।

সেটা ষোলশ চুরানব্বই সাল। আমি বৃদ্ধ তখন। তবু ঐ যে বলে মোহ। দ্বীপ দেখার অদম্য আগ্রহ। আমি যে মালিক সে দ্বীপের। রেখে এসেছি প্রজাদের। কেমন ভাবে চলছে তাদের দিন? আমার সাজানো বাগানে কী কী নতুন গাছ তারা লাগল? ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গেলাম দ্বীপে।

দেখি দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে স্পেনীয় নাবিকের দল। আমাকে দেখে হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানাল। বলল সব। আমি চলে আসার কদিন পরেই তারা এসে পৌঁছয়। প্রথমে তো সেই দুটো দুশমন—জাহাজের সেই বিদ্রোহী বদমাশ—কিছুতে রেয়াত করবে না তাদের। খটামটি লাগে মুহুর্মুহু। পরে মেনে নিল। ফের আবার ঝগড়া। ফের বিদ্বেষ। শেষে অস্ত্র ধরল নাকিদের দল। শাসাল। তখন ঠাণ্ডা। মানতে বাধ্য হলো তাদের। সেই থেকে আর নিজেদের মধ্যে কোনো গোলমাল হয় নি। ক্ষেত খামার বাড়িয়েছে। খেটেছে অক্লান্ত। সোনা ফলে যে দ্বীপে! জমি খুব উর্বর। তবে না শান্তি।

তারপর যুদ্ধ। নিজেদের মধ্যে নয়, ক্যারিবীয়দের সঙ্গে। বেশ কয়েকবার। এসেছিল দল বেঁধে দ্বীপের দখল নিতে। পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। তখন তারা বুদ্ধি করে গেল একদিন বর্বরদের রাজ্যে। নৌকোয়। সেখানেও যুদ্ধ। বন্দি করে আনল মোট ষোলো জনকে। তাদের মধ্যে পাঁচ জন স্ত্রীলোক। লোক যে দরকার তখন অনেক। তাইতো এই ফন্দি। তাতে জনসংখ্যা বেড়েছে। আমি নিজের চোখে বিশটি বালক বালিকাকে দেখে এলাম।

রইলাম বিশ দিন। আসার সময় দিয়ে এলাম একপ্রস্থ পোশাক, সঙ্গে কাজের নানান যন্ত্রপাতি, গোলা বারুদ, অস্ত্র আর দু'জন মিস্ত্রী। এদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই উদ্দেশ্যেই। একজন ছুতোর আর একজন কামার। গঠনের নানান কাজ যে দরকার। উপযুক্ত লোক নাহলে তা কি করা সম্ভব!

... পাহাড় সমান উঁচু একটা ঢেউ

হ্যাঁ, আরো একটা জরুরি ব্যাপার চুকিয়ে এলাম। সেটা দ্বীপের মালিকানা নিয়ে। দলিল তৈরী হলো, লিখিত বিবরণ যাকে বলে। দলিলে আমিই সর্বেসর্বা। দ্বীপের অধিপতি। ওদের দিলাম ভাগে ভাগে এক একটা এলাকা। সেটাও পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে। অর্থাৎ আমি চাই সুষ্ঠু বিলিবন্টন ব্যবস্থা। এখানে কোনোরকম অসাম্যের আমি পক্ষপাতি নই।

ফেরার পথে ব্রাজিল হয়ে ফিরলাম। মালবাহী জাহাজ কিনলাম একখানা। সেই ব্রাজিলেই। তাতে লোক তুললাম বিস্তর। বলা কওয়া করেই। লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই। রওনা করিয়ে দিলাম দ্বীপের উদ্দেশে। সঙ্গে দিলাম নানান পসরা। আর সাতটি মেয়ে। এদের দরকার। দ্বীপের নানান কাজ—আরে বাপু ঘর গেরস্থালি বলেও তো একটা জিনিস আছে। সেটা এরা ছাড়া কে করবে?

তাছাড়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি। বলে এসেছি স্পেনীয় আর ইংরেজদের, আমি সবার জন্যে পাঠিয়ে দেব একটা করে বউ। সঙ্গে নতুন নতুন গাছগাছালি। আর কিছু জীবজন্তু। যেমন শুয়োর, গরু আর ভেড়া। গরু অর্থে গাভী। সবৎসা। সঙ্গে দিলাম একটি বলদ। এটা দরকার। মোটমাট চাই আমি—সবদিক থেকে সুফলা হয়ে উঠুক আমার নতুন সাম্রাজ্য।

এরপরেও আছে। সেটা পরে গিয়ে শুনেছি। তিনশ ক্যারিবীয় এসেছিল ফের দ্বীপে, লড়াই করে দ্বীপের দখল নিতে। সে যাকে বলে মহাপ্রলয়। ক্ষেত জ্বালিয়ে শস্য পুড়িয়ে সে যেন ছারখার কাণ্ড। হেরে গেছে আমার প্রজার দল। সেটা প্রথমবার। পারে নি প্রতিরোধ

করতে। তিন জন মারা গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর হারে নি। সেবার আগে থেকে সজাগ ছিল। দিয়েছে মেরে ধরে লুটেরা শয়তানদের তাড়িয়ে। আর এমনই দুর্দশা,—ফিরে যাে দলবল, নৌকো নিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে, অমনি উঠল ঝড়, আর পাহাড় সমান উ একেকটা ঢেউ। চোখের নিমেষে সব নৌকো উল্টে গেল রসাতলে। তখন শান্তি পুনর্গঠনের কাজ তখন শুরু হলো। শান্তি। খাটল প্রাণ দিয়ে। শান্তি। ফুলে ফলে ভরে উঠল আবার দ্বীপ। শান্তি। অপরূপ তার স্বাদ। পূর্ণ হলো আবার দ্বীপবাসীর হৃদয়।

আর আমি? ততদিনে আমি কি আর ঘরের কোণে বসে থাকার মানুষ। বেরিয়ে পড়লাম ফের। সে আর এক অভিযান। দশটা বছর কাটল সেই অভিযানে। কিন্তু সে গল্প এখানে নয়। বারান্তরে বলার চেষ্টা করব।